যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা

[ভারতের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস]

প্রথম খণ্ড

(প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত)

রণজিৎ ঘোষ এম. এ. ; বি. টি.

সোমা বুক এজেন্সী
৪২/১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সোমা বুক এজেন্সীর পক্ষে
৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ

মুদ্রাকর
শঙ্করনারায়ণ প্রেস
রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

প্রায় পনেরো বছর আগে "ভারতের শিক্ষাধারা" (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) এবং "আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা-সমস্যার ইতিহাস" এই নামে দু'খানা বই লিখেছিলাম। প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষার একটা ধারাবাহিক রূপরেখা বই দু'খানায় ছিল। কিছুদিন পর বই দু'খানা সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত রূপে "শিক্ষাদর্শ-পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস" নামে একখানা বই প্রকাশ করি। বর্তমানে বইটির ষষ্ঠ সংস্করণ চলছে। কিন্তু মনে হয়, 'শিক্ষাদর্শ-পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস' ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাতে পারলেও সাধারণ শিক্ষা-সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। মাঝে মাঝেই চিঠি পাই মূল বই দু'খানা পাওয়া যায় কিনা জানতে চেয়ে। তাই আমার বইয়ের প্রকাশক শ্রীমান অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আগ্রহে ও তাগিদে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও আরও কিছু নতুন অংশ যোগ ক'রে বই দু'খানা দুই খণ্ডে নতুনভাবে নতুন নামে প্রকাশ করা হল। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার ক্রম-বিবর্তনের ধারার সঙ্গে ও আধুনিক ভারতের শিক্ষার নানা সমস্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই বই লিখতে ভারতের বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষা-গবেষক যে সব তথ্যবহুল মূল্যবান বই লিখেছেন, তাঁদের সে সব রচনা ও আধুনিক কালের বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন ও ও শিক্ষা-সমিতির রিপোর্ট থেকে আমি আমার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই বইয়ের তথ্য সমৃদ্ধির জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী। উপস্থাপনা ও গ্রন্থনের দোষত্রুটি সম্পূর্ণ আমার।

শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষার সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যুগে যুগে শিক্ষার বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে বিভিন্ন যুগের শিক্ষা-সমস্যাগুলিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সমস্যা ও সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রচলিত অভিমতের সঙ্গে নিজস্ব মতামত উপস্থাপনের স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি।

অতি আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতি যেভাবে ঘন ঘন পরিবর্তিত হচ্ছে, তার ফলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক নীতি-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একটা নতুন কিছু ব্যবস্থা চালু হলে তার বিচারের সময় প্রয়োজন, ততদিন ধৈর্য ধরার সহিষ্ণুতা আমাদের নেই। তাই একটা নীতি গ্রহণ করার কিছুদিন বাদেই আমরা নতুন শিক্ষানীতির কথা ভাবতে বসি। এটা কোন জাতির পক্ষে সুস্থ শিক্ষানীতির পরিচায়ক নয়।

প্রয়াত বনোয়ারীলাল চক্রবর্তীর কথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁরই উৎসাহে ও সাহায্যে শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে বই লিখতে উদ্যোগী হই।

মূল বই দু'খানি লিখতে শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস এম. এ., বি. টি. আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। নতুন ক'রে লেখার মত শরীরের অবস্থা আমার নেই। তবু এ বই যে করা সম্ভব হল, তা শ্রীমান অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর চেষ্টায় ও উৎসাহে, সেজন্য তাকে ধন্যবাদ।

বই লিখতে সম্ভাব্য সব জায়গা থেকেই আমি প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়েছি। যথাস্থানে সে সব বই, লেখক ও কমিশনের নাম উল্লেখ করেছি। যদি কোন বইয়ের নাম ও গ্রন্থকারের নাম বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বই ছাপার পর দু' একটি তথ্যগত ভুল আমার নজরে এসেছে, ছাপার ভুল-ত্রুটিও রইল, চেষ্টা করব পরের সংস্করণে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত হতে। ইতি—

৪।২৯ নেতাজী নগর
কলিকাতা-৪০
১লা মার্চ, ১৯৬৪

বিনীত
রণজিৎ ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব ঃ প্রাচীন যুগ

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব ঃ আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

সূচনা

শিক্ষার ইতিহাস পাঠের সার্থকতা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে সকল দেশ ভাগ্যবান, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়"। একটা আত্মবিস্মৃত জাতি তার গৌরবময় অতীত ইতিহাসের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়। নতুন আবিষ্কারের আনন্দে সে গড়ে তুলতে পারে নিজেকে। পুরানো ঐতিহ্যের পটভূমিকায় তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে আশায় সমুজ্জ্বল।

শিক্ষার ইতিহাস পড়তে গিয়ে মনে হয় এর সার্থকতা কোথায়? ইতিহাস পাঠের কি প্রয়োজন, সেই নিকষে বিচার করলে শিক্ষার ইতিহাস পাঠের সার্থকতা সহজেই বোঝা যায়। ইতিহাস কি, এসম্পর্কে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। কোন জটিল বিতর্কে না গিয়ে সাধারণভাবে একথা বলতে পারি, পৃথিবীর বুকে আদিমতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার বিবরণীই হচ্ছে ইতিহাস। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশৃঙ্খল ঘটনার মধ্য থেকে অসত্য ও অতিরঞ্জনকে বাদ দিয়ে যে সত্য-সন্ধানী সেই তথ্যকে উপস্থাপন করেছেন, তিনিই ঐতিহাসিক।

ইতিহাস পাঠের সার্থকতা হচ্ছে অতীতের আলোকে বর্তমানকে জানা ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা। বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকে জানতে হবে। আজকের দিনে আমরা যা পেলাম, তার ভিত্তিভূমি অতীতের গর্ভে নিহিত। Lecky বলেছেন, "বাস্তব জীবনে যে সমস্ত বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, ইতিহাস তার মধ্যে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।" জানা ও শেখা অর্থাৎ অতীতকে জেনে তার বিচার বিশ্লেষণ ক'রে বর্তমান সমস্যার সম্মুখীন হওয়া আর পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা, এই হচ্ছে ইতিহাস পাঠের সার্থকতা। "চিরন্তন স্বদেশ"কে খুঁজে পাওয়া আমাদের জাতীয় জীবনের একটা বড় প্রয়োজন। একথা সাধারণ ইতিহাস অপেক্ষা শিক্ষার ইতিহাস-পাঠের ক্ষেত্রে আরও বেশী সত্য। যে ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা লুপ্ত ক'রে ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, সেই প্রাচীন শিক্ষার রূপ, এবং আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপীয় মিশনারী ও ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের প্রচেষ্টায় কি ক'রে দেশের বর্তমান শিক্ষা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই ইতিহাসকে জানতে হ'লে শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন।

শিক্ষণ-শিক্ষার নতুন পাঠক্রমে শিক্ষার ইতিহাস শুধুমাত্র একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় নয়, ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের মধ্যেও শিক্ষার ইতিহাসকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এটা শিক্ষার ইতিহাসের গুরুত্বেরই স্বীকৃতি। একটা জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ শিক্ষার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার ইতিহাসের মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায় সেই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে। যুগে যুগে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে প্রতি স্তরে ফুটে ওঠে বিভিন্ন সময়ের যুগ-বৈশিষ্ট্য। জাতিগঠনের দায়িত্ব যে শিক্ষক-সমাজের উপর ন্যস্ত, তাঁদের পক্ষে বিভিন্ন যুগের শিক্ষার রূপ ও তার সমস্যাকে জানা বিশেষ প্রয়োজন। নিজের দেশের ও প্রগতিশীল দেশসমূহের শিক্ষা-সমস্যাকে জেনে তাকে বিশ্লেষণ ক'রে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুরূপ সমস্যার সমাধান করা চলে। রুশ বিপ্লবের পর সাম্যবাদী সরকারকে ব্যাপক অভিযান চালাতে হয় নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য। কি ক'রে সেই অভিযান সাফল্য লাভ করেছিল, সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করা সম্ভব কিনা, সেকথা আমরা চিন্তা করতে পারি। বিভিন্ন দেশের উন্নত শিক্ষাধারাকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের প্রয়োজনমত তাকে কাজে লাগাতে পারি।

প্রাচীন ভারতের গৌরবময় শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান যুগে কতটা গ্রহণযোগ্য, সে যুগের শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে বা যুগোপযোগী সংস্কার ক'রে বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা কতটা সমাধান সম্ভব, তা স্থির করতে হলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে জানতে হবে। আমাদের নিম্নাভিমুখী শিক্ষার মান কি ক'রে উন্নত করা যায়, তপোবনের শিক্ষায় কি ক'রে উচ্চ শিক্ষার মান রক্ষিত হত, ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন্ ত্রুটির জন্য চিন্তায় জড়তা দেখা দেয়—অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে গতানুগতিকতার ঘূর্ণাবর্তে কি ক'রে আমাদের শিক্ষায় এক অচলায়তনের সৃষ্টি হয়, সেই সব সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে যদি শিক্ষা সমস্যার সমাধানের পথ আমরা খুঁজে পাই, খুঁজে পাই আমাদের "চিরন্তন স্বদেশ"কে তাহলেই শিক্ষার ইতিহাস পাঠ সার্থক হবে।

প্রথম অধ্যায়

বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা

ভারতের সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি আর্যগণ যে সভ্যতাকে এদেশে বহন ক'রে এনেছিল ও যে সভ্যতা নানাভাবে পুষ্ট হয়ে ভারতের জনজীবন ও সমাজকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই সভ্যতাকে। আর্যরা প্রথমে কবে ভারতে এসেছিল তার সন তারিখ আমাদের জানা নেই, এ সম্পর্কে নানা পণ্ডিতের নানা মত। তবে অনুমান করা হয় খৃষ্ট পূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময় দলে দলে আর্যগণ ভারতে এসেছিল। অর্থাৎ ভারতীয় আর্য-সভ্যতার প্রাচীনত্বকে যদি পিছনে টেনে নেওয়া যায়, তাহলে খুব বেশী হলে খ্রীঃপূঃ দু'হাজার বছর পর্যন্ত আমরা টেনে নিয়ে তার কাল নির্ণয় করতে পারি। মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার সভ্যতা সম্পর্কে যখন আমরা অজ্ঞ ছিলাম, তখন পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয়ে আর্য সভ্যতাই ছিল আমাদের সীমা নির্দেশক মাপকাঠি। পাঞ্জাবের হারাপ্পা, সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো, বেলুচিস্থানের নাল ও সিন্ধু উপত্যকার আরও বহুস্থানে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়াতে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টাতে হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা দেখে ভারতের সভ্যতা যে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হাজার বছরের পুরোনো সে সম্পর্কে আর সন্দেহ করবার অবকাশ রইল না। আর্যরা অনার্যদের যত নিন্দাই করুক না কেন, তাদের নগরনির্মাণ কৌশলের প্রশংসা তারা করেছে। আর্যদের আসবার পূর্বেই সিন্ধু উপত্যকায় যে উন্নত ধরনের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল, তার প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার উপর নেই, কিংবা ভারতীয় সভ্যতার অগ্রই আর্য সভ্যতা, এ ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার বহু নিদর্শন আমরা পেয়েছি। মিশর, ব্যাবিলন, আসুরীয় সভ্যতার সমকালীন যে সভ্যতা ভারতে উদ্ভব হয়েছিল, সেই যুগের সমৃদ্ধির নিদর্শনে আমরা বিস্মিত হই। যারা একটি উন্নত ধরনের নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার পত্তন করেছিল, তাদের একটা শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল—একথা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। পাঁচশ'য়ের বেশী শীলমোহর মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গিয়েছে। শীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি। যারা লিপির ব্যবহার জানত, বহু দেশের সঙ্গে যাদের বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল, যারা উন্নত ধরনের সভ্যতার অধিকারী ছিল—তাদের সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। সিন্ধু সভ্যতার অনেক তথ্যই আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগ আর্যদের এদেশে আসবার সময় থেকে শুরু হয় নি। তার আদি দিগন্ত আরও বহুদূরে বিস্তৃত। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা এই দুইয়ের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। ভারতে পরবর্তীকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, আর্য

সভ্যতাই তার একমাত্র উৎস নয়। সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তাকেই ভারতীয় সভ্যতা বলা যায়।

॥ আর্য আগমন ॥

ভারতে আর্যরা প্রথম কখন আসতে শুরু করে, একথা সঠিক বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বছর পূর্বে আর্যরা প্রথম ভারতে আসতে শুরু করেন ও খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বছরের মধ্যে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে তাদের আধিপত্য স্থাপিত হয় বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন। ঋগ্‌বেদে যে সব নদনদীর উল্লেখ আছে, তা থেকে সেইযুগে আর্যদের বসতি কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত সপ্তসিন্ধু অঞ্চল বলতে পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী মোট এই সাতটি নদীর অববাহিকা অঞ্চলকে বোঝাত। এছাড়া গঙ্গা, যমুনা ও সরযূ নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আর্যরা বসতি স্থাপন করেছিল। আদি যুগে সপ্তসিন্ধু বলতে ইরান ও আফগানিস্তানের কিছুটা—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চলকে বোঝাত। আর্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের সুরক্ষিত নগরে এসে বারবার হানা দিয়েছে, ঋগ্‌বেদে তার বর্ণনা আছে। বেদে এসব নগরকে পুর বা দুর্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র আর্যদের এসব দুর্গ ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিলেন বলে তাকে পুরন্দর বলা হয়। যাই হোক, আর্যরা এদেশে এসে একটা উন্নত সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল। সে সভ্যতাকে তারা ধ্বংস করলেও তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকতে পারেনি।

আর্য সভ্যতা ছিল পল্লীকেন্দ্রিক। ঋগ্‌বেদের যুগে আর্যরা ছোট ছোট পরিবারে ভাগ হয়ে গ্রামে বাস করত। আর্য-সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান। পরিবার ছিল গৃহপতির অধীন। বর্ণ বা রং এবং স্বাজাত্যভেদে পরিবারগুলি ভাগ করা হয়েছিল। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত জন বা বিশ। জনের অধিপতি ছিলেন রাজা। প্রথম অবস্থায় রাজা নির্বাচিত হতেন—সভা-সমিতি নামে প্রতিষ্ঠান রাজাকে শাসনকার্যে সহায়তা করত। প্রাচীন আর্য-সমাজ ছিল গণতান্ত্রিক—বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হলেও গণতন্ত্র কোথাও কোথাও ছিল। পরবর্তী কালে রাজশক্তি বৃদ্ধি পায় ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

আর্যরা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা ক'রে পূজা করত, তাঁদের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি পাঠ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দান করত। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি সূর্য, মরুৎ, ঊষা, সরস্বতী প্রভৃতি ছিল আর্যদের উপাস্য দেবদেবী। আর্যদের উপাসনা প্রথম যুগে সহজ হলেও ক্রমে যজ্ঞের অনুষ্ঠান জটিল হয়ে উঠল—এ কাজের জন্য পুরোহিত সমাজের অভ্যুদয় হল। তাঁরাই ধর্মের ধারক ও রক্ষক হয়ে উঠলেন। পুরোহিতরা মন্ত্রাদি রচনা করতেন। বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা বলে এঁরাই 'ঋষি' নামে পরিচিত হলেন। আর্য-ঋষি পরিবারেই প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আর্যরা বহু দেব দেবীর পূজা করলেও বৈদিক যুগে একেশ্বরবাদ আর্য ঋষিদের চিন্তায় বিকাশ পাচ্ছিল।

ঋগ্‌বেদের শ্লোকে পাওয়া যায়—একই দেবতা, তিনি বহু নামে কথিত হন—ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তিনি কথিত হন। তিনি আকাশচারী গরুড়। যিনি এক, ঋষিরা তাঁকে বহু নাম দিয়েছেন।

আর্যরা যখন এদেশে এল, তখন তাদের মধ্যে জাতিভেদ বলে কিছু ছিল না। গৌরবর্ণ আর্য, আর কৃষ্ণবর্ণ অনার্য—এই নিয়েই প্রথম শ্রেণীভেদ বা বর্ণভেদ গড়ে উঠল। ক্রমে সমাজের জটিলতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণ ও কর্মের দ্বারা সমাজে বর্ণভেদ প্রথা গড়ে ওঠে। যাগ-যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, বিদ্যাদান প্রভৃতি নিয়ে যারা রইলেন, তারা হলেন ব্রাহ্মণ। রাষ্ট্রনীতিতে দক্ষ, রণনিপুণ, বীরজাতি ক্ষত্রিয়। কৃষিকর্ম, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিজীবীরা বৈশ্য ও অনার্য জাতি শূদ্র বলে পরিচিত হল। বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল না। ঋগ্বেদের সময় দেখা যায়, জাতিভেদ প্রথা খুব কঠোর বা স্পষ্ট নয়। পরে পুরুষ সূক্তের মধ্যে দেখা যায় বর্ণ বিভাগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে—আদি পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, জানু থেকে বৈশ্য ও পদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত জাতিভেদ গুণ ও কর্ম নির্ভর ছিল, ততদিন আর্য সমাজের গতিশীলতা ব্যাহত হয় নি। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, জনক ক্ষত্রিয় হয়ে রাজর্ষি হয়েছিলেন, দাসীপুত্র সত্যকাম বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা হয়েছিলেন। বিবাহ সম্পর্কেও কঠোরতা ছিল না। বৃত্তি-সম্পর্কেও সমাজ যথেষ্ট উদার ছিল—জন্মই জাতিভেদের একমাত্র নিয়ম ছিল না। আপন আপন রুচি ও প্রবণতা অনুসারে বৃত্তি গ্রহণ বা বৃত্তি ত্যাগ করার স্বাধীনতা প্রথম অবস্থায় ছিল।

আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিনটি উচ্চ বর্ণ চতুরাশ্রমের বিধি মেনে চলত। উপনয়নের পর আর্য-শিশুকে ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে গুরুগৃহে ছাত্র-জীবন অতিবাহিত করতে হত। ভোগবিলাস বর্জন ক'রে পবিত্রভাবে নানা শাস্ত্রপাঠই ছিল এজীবনের আদর্শ। ছাত্রজীবন শেষ হলে শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত। এই জীবনে বিবাহ ও সংসারধর্ম পালনই ছিল আদর্শ। তারপর বানপ্রস্থ, সংসার থেকে অবসর নিয়ে লোকালয়ের সন্নিকটে অরণ্যে কুটীর বেঁধে ধর্মচিন্তায় জীবনযাপন ছিল এ জীবনের আদর্শ। চতুর্থ আশ্রম হচ্ছে সন্ন্যাস বা যতি—এ আশ্রমে পারমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলনে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি মোক্ষের সাধনায় কাটাতে হত। কোন কোন ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন না ক'রে কেহ কেহ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, তপস্যা ও তত্ত্বানু-সন্ধানে জীবন অতিবাহিত করতেন।

আর্য ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বেদ থেকে। আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ—আর ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। বেদ শব্দের অর্থ জানা বা জ্ঞান (বিদ্ ধাতু থেকে)। হিন্দুরা বিশ্বাস করে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। আর্য ঋষিগণ ধ্যানস্থ হয়ে বেদের বাণীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে বেদের এক নাম শ্রুতি—শ্রুত হয়েছিল বলেই শ্রুতি।

বেদ চারি ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। প্রত্যেক বেদ ব্রাহ্মণ ও সংহিতা

এই দুই অংশে বিভক্ত। বেদ বহুদিন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি, লোকের মুখে মুখে সংরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী কালে বেদের মন্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। সংহিতা পদ্যে রচিত, ব্রাহ্মণ গদ্যে লিখিত। সংহিতা গাথা ও বেদ মন্ত্রের সমষ্টি। ব্রাহ্মণে আছে যাগযজ্ঞের বিধি নির্দেশ ও তত্ত্বকথা। এছাড়া, পরবর্তী কালে আরণ্যক ও উপনিষৎ নামে দু'টি বিভাগ গড়ে ওঠে। বেদের দার্শনিক তত্ত্ব আরণ্যকে লিপিবদ্ধ আছে। বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে জীবনের গূঢ় তত্ত্বকে উপলব্ধি ক'রে অরণ্যে বাস ক'রে ঋষিরা তাঁদের চিন্তাধারা বহু গ্রন্থে রূপ দেন। অরণ্যস্থিত তপোবনে বসে ঋষিরা তাঁদের গভীর উপলব্ধি-জাত জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলে একে আরণ্যক বলা হয়। ভাষা ও ভাবের দিক থেকে আরণ্যক গ্রন্থগুলির সঙ্গে বেদের ব্রাহ্মণ্য অংশের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী ঋষিরা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদির পরিবর্তে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্পর্কে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। বেদের ব্রাহ্মণ অংশের অভাব আরণ্যক গ্রন্থ দিয়ে তারা পূরণ করতেন। অনেকে মনে করেন, আরণ্যক অংশের গূঢ় তত্ত্ব অরণ্যের নির্জনতা ভিন্ন শিক্ষা দেওয়া বা আলোচনা করা সম্ভব হত না বলেই বেদের এ অংশকে আরণ্যক বলা হত।

আরণ্যকের মধ্যে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশ, তার পূর্ণ পরিণতি উপনিষদের মধ্যে। উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। বৈদিক বিদ্যার শেষ কথা উপনিষদের মধ্যে আছে বলেই একে বেদের অন্তঃ বলা হয়। উপনিষদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৮০০-৫০০ অব্দের মধ্যে। উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'নিকটে বসা'—অর্থাৎ কারও নিকটে বসা। পুত্র বা অতি বিশ্বস্ত প্রিয় ছাত্রকে কাছে বসিয়ে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্পর্কে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দেওয়া হত বলেই হয়ত একে উপনিষদ বলা হয়েছে। এই অরণ্যস্থিত তপোবনেই এক সময়ে শত শত শিক্ষার্থী গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত। প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রম, তমসাতীরে বাল্মীকির আশ্রম, নৈমিষারণ্যে শৌনিক আশ্রম, গৌতমের আশ্রম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

ঋগ্বেদ বেদসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। সামবেদের ৭৫টি মন্ত্র বাদে অবশিষ্ট মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত। যজ্ঞকালে সামবেদের মন্ত্রসমূহ তাল, মান, লয়ের সঙ্গে সুর সংযোগে গীত হত। যজুর্বেদে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। ঋক্ সংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে। ঋগ্বেদে ১০১৭টি সূক্ত। পরবর্তী কালে আরও ১১টি সূক্ত এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সূক্তগুলি ১০টি মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশম মণ্ডল ব্যতীত এক একটি মণ্ডল এক একজন ঋষি বা ঋষি বংশের দ্বারা সংগৃহীত। এক একটি মণ্ডলের মন্ত্রসমূহ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বংশধরেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। এসব ঋষি পরিবারের মধ্যেই আমরা সন্ধান পাই ভারতের আদিতম শিক্ষককুলের। ঋষি পরিবারই ছিল প্রথম যুগের গুরুকুল। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম দেখা দেয় পুরোহিতের শিক্ষা। যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম ও পদ্ধতি জটিল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে এক পুরোহিত দিয়ে যে কাজ নির্বাহ হত, সেই কাজের

জন্য পৃথক্ পৃথক্ পুরোহিতের প্রয়োজন দেখা দেয়। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হতেন, যেমন—উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্যু, এঁদের যথাক্রমে সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদে অধিকার ছিল। এঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁকে ব্রহ্মা বলা হত, চার বেদেই তাঁর সমান অধিকার ছিল। এই ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকগণ বেদবিহিত কার্য নিষ্পন্ন করতেন। হোতৃগণ ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে হোম সম্পন্ন করতেন। উদ্গাতা সামবেদের গীত দ্বারা দেবতার প্রশস্তি বন্দনা করতেন। অধ্বর্যু নামে পরিচিত ঋত্বিকগণ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ অংশে পারদর্শিতা লাভ করতেন। ব্রহ্মা ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ। সবার কাজ তিনি পরিদর্শন করতেন, ভুল সংশোধন করতেন,—তিনিই ছিলেন পুরোহিত সমাজের শ্রেষ্ঠ।

বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় যাগযজ্ঞের বিভিন্ন পদ্ধতি ও মন্ত্রসমূহের সঠিক উচ্চারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হত। দিন দিন বৈদিক সাহিত্যের আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকায় বেদের এক একটি শাখায় এক একটি পুরোহিত বংশের অধিকার জন্মাল। এক একটি শাখার অধিকারীদের বলা হত বেদের সেই অংশের চারণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখার সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু চারণ-দলের সৃষ্টি হল। এর ফলে বৈদিক সাহিত্যে পাঠভেদ দেখা দিল ও কিছুটা অসামঞ্জস্য দেখা দিল। বেদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পাদপাঠ, ক্রমপাঠ প্রভৃতি পাঠপদ্ধতির সৃষ্টি হল। (পাদপাঠে প্রতিটি শব্দকে পৃথক্ পৃথক্ ক'রে উচ্চারণ করবার ব্যবস্থা আছে। ক্রমপাঠে প্রত্যেক শব্দ দু'বার ক'রে পড়তে হত বিশেষ নিয়মে।) পৌরোহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমে সুসংবদ্ধ রূপ পেল।

বেদ বা শ্রুত-সাহিত্য বিশালকায় হয়ে ওঠায় পরবর্তী কালে বেদের সংক্ষিপ্ত সাররূপে সূত্র সাহিত্য গড়ে ওঠে। সূত্র সাহিত্যের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০—২০০ অব্দের মধ্যে। যুগ যুগ ধরে ব্রাহ্মণদের স্মৃতিতে এ জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষিত হয়েছে বলে একে বলা হয় স্মৃতি। শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে শ্রুতিই অধিকতর প্রামাণ্য। বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন সূত্র-সাহিত্যের অন্তর্গত। ষড়দর্শন হচ্ছে কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্ব মীমাংসা, ব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে জ্ঞানগর্ভ বাণী সূত্র মধ্যে বিধৃত হওয়ায় পরবর্তী কালে সূত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে অবোধ্য হয়ে পড়ে। এজন্য সূত্রসাহিত্য বোঝবার জন্য টীকা ও ব্যাখ্যা রচিত হয়।

বেদাঙ্গ হচ্ছে বেদপাঠের জন্য অপরিহার্য ছয়টি বিদ্যা। বেদাঙ্গ আয়ত্ত না করতে পারলে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম বা বেদপাঠ, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দসমূহের উৎপত্তি), জ্যোতিষ এবং কল্প (যজ্ঞাদি) নিয়ে হচ্ছে বেদাঙ্গ। নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দ রচনায় যথাক্রমে যাস্ক, পাণিনি ও পিঙ্গলের নাম অমর হয়ে আছে। পাণিনি তাঁর পূর্বের আরও ৬৪ জন বৈয়াকরণিকের কথা উল্লেখ করেছেন। ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে কল্পসূত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কল্পসূত্র নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে নানা সূত্রের উদ্ভব হয়। যেমন, শ্রৌত

সূত্রে সামাজিক নিয়ম ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। শুল্বসূত্রে পাই যজ্ঞবেদী প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা। এই সূত্র থেকেই হিন্দু জ্যামিতি ও রেখা-গণিতের উদ্ভব হয়েছে। গৃহ্য সূত্রে গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরের করণীয় কার্য সম্পর্কে বিধি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্মসূত্রে সমাজনীতি অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রশাসন বর্ণিত হয়েছে। ধর্মসূত্রের কোন কোন অংশে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্বন্ধেও নির্দেশ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে লিপিবদ্ধ হলেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। ধর্মসূত্রকে অবলম্বন ক'রেই পরবর্তীকালে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক, স্মৃতি প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। ধর্মসূত্র থেকেই ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে আজ পর্যন্ত আমরা গৌতমের ধর্মসূত্রেরই (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ) সন্ধান পেয়েছি। গৌতমের ধর্মসূত্র ছাড়াও অগস্ত্য বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্য দিন দিন বিশালতা লাভ করায় ও বেদের মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হওয়ায় এক একটি পুরোহিত দল বেদের এক একটি শাখার অনুসারী হল। এইভাবে বিভিন্ন চারণ দলের সৃষ্টি হল। চারণদের মধ্যে আবার ভাগ হয়ে গোত্র দেখা দিল। —গোত্র হচ্ছে এক একটি কল্পিত পরিবার। বেদের কোন একটি শাখায় অধিকার না জন্মালে কেহ পৌরোহিত্য করতে পারত না। এজন্য ব্রাহ্মণদের কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। কালক্রমে পৌরোহিত্যের অধিকার সংকীর্ণ হয়ে কয়েকটি প্রাচীন মুনি বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

পুরোহিত গোষ্ঠী কয়েকটি নির্দিষ্ট শাখায় ভাগ হয়ে যাবার পর এক একটি শাখার শিক্ষার্থীকে গুরুর তত্ত্বাবধানে বেদের নির্দিষ্ট অংশ আয়ত্ত করতে হত। শিক্ষার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণরূপে মৌখিক। যতক্ষণ পর্যন্ত না সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত হত, ততক্ষণ বারবার একই অংশের আবৃত্তি করতে হত। উচ্চারণশুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। কারণ, প্রতিটি শব্দের একটি বিশেষ শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হত—সঠিক উচ্চারণ না হলে সেই মন্ত্রের ঈপ্সিত ফল লাভ করা দূরের কথা, মহা অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হত। প্রত্যেক ঋত্বিক বা পুরোহিতকে নিজ নিজ শাখার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ উপদেশ দেওয়া হত। প্রতিটি মন্ত্রের ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতির তাৎপর্য বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিখতে হত। একে বলা হত বিধি, এবং বিধির দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যাকে বলা হত অর্থবাদ।

বৈদিক শিক্ষাদানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হত, সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শিক্ষার প্রক্রিয়াসমূহ প্রথম থেকেই অনুশীলন করা হচ্ছে। প্রথমে শিক্ষার্থী গুরুর কাছ থেকে পাঠ শুনত (শ্রবণ)। শোনবার পর সমষ্টিগতভাবে আবৃত্তি করবার চেষ্টা হত। তারপর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মননের সাহায্যে তাকে মনে ধরে বা গেঁথে রাখবার চেষ্টা হত। তারপর আয়ত্তাধীন জ্ঞানকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা চলত।

বেদ বহুদিন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। এক সময়ে পণ্ডিতগণ মনে করতেন, বৈদিক

যুগে লিপির ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল—কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ বলেন, বৈদিক যুগের মানুষ লিপির ব্যবহার জানত। মনে হয়, গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভাষার ধ্বনি ও ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে তারা লিপির ব্যবহার জানা সত্ত্বেও বেদকে লিপিবদ্ধ করেননি।

বৈদিক যুগের শুরুতে দেখি পৌরোহিত্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য প্রথমে শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল। যজ্ঞের বিধিপদ্ধতি বেদমন্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে জানতে হত। ক্রমে শিক্ষাসূচী বিস্তৃত হয়। শিক্ষার্থীকে বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন ও বিভিন্ন সূত্র সাহিত্য অনুশীলন করতে হত। বৈদিক যুগের শেষে দেখি পাঠ্যসূচী আরও বিস্তৃত হয়েছে। নারদ সনৎকুমারের নিকট তাঁর অধীত বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে যে সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন, তাতে দেখি, চতুর্বেদ ছাড়াও তিনি ইতিহাস, পুরাণ, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্যাকরণ, রাশি, পিতৃলোক সম্পর্কীয় বিদ্যা, জ্যোতিষ, একায়ন (নীতিশাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, নিধিবিদ্যা, দৈববিদ্যা, দেববিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (যুদ্ধবিদ্যা), দেবজনবিদ্যা (নৃত্যগীত, শিল্প) প্রভৃতি বিদ্যার উল্লেখ করেছেন। নারদ এত শিখেও তুষ্ট হতে পারেন নি—কারণ, তিনি চেয়েছিলেন আত্মজ্ঞান—সত্যোপলব্ধি। সনৎকুমার অবশ্য এসব বিদ্যাকে 'এহো বাহ্য' বলে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। নারদকে বলেছিলেন, আপনি যা শিখেছেন, এ শুধু কথা। তিনি নারদকে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

বৈদিক শিক্ষার বিবরণে দেখি, বৈদিক সমাজে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মকে যথাযথ শাস্ত্রীয়ভাবে সম্পাদন করবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল। কালক্রমে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনের বাইরে বহু ব্যবহারিক বিদ্যারও প্রচলন হয়েছে, এবং বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সব ব্যবহারিক শাস্ত্র শিক্ষারও ব্যাপক আয়োজন হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা

ভারতীয় সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। আর্যদের ভারতে আসবার পূর্বেই অতি উন্নত ধরনের যে সভ্যতার উদ্ভব ভারতে হয়েছিল, বৈদিক আর্যরা বিজয়ীরূপে ভারতে এলেও সেই বিজিত সিন্ধু অধিবাসিকা তাঁদেরই সভ্যজাতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ভারতের সভ্যতা সমন্বয়-ধর্মী। যুগ যুগ ধরে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই ভারত করেছে—তাই সিন্ধু সভ্যতাকে নিজের ক'রে নিয়ে বৈদিক সভ্যতা আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ই দিয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের পরিচয় পেলেও ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা একান্তভাবেই বৈদিক আর্য সভ্যতার দান। বেদকে কেন্দ্র ক'রেই ঋষিদের তপোবনে প্রথম আর্য সমাজে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়।

॥ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ॥

ভারতের সভ্যতা সমন্বয়-ধর্মী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সভ্যতার সঞ্চিত পলির উপর ভারতীয় সভ্যতার মহীরুহ আপন মহিমায় বেড়ে উঠেছে। ভারতের এই পরমতসহিষ্ণুতা এবং অপরকে গ্রহণ করবার বৈশিষ্ট্যই কবির কথায় রূপ পেয়েছে—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।

*　　　*　　　*

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতের তপস্বিকুল আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই অধ্যাত্মবাদই বিশ্বজননীতার প্রেরণা যুগিয়েছে। আর্য-সমাজের জীবন-বেদ সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব অরণ্যে, সুদূর অতীত থেকেই ভারতবর্ষ অস্ত্রশক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তিকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের পাতায় এবং আরও দূর অতীতের অলিখিত ইতিহাসে দৃক্‌পাত করলেই দেখা যাবে যে, বিশ্বের মানুষ যখন ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, সভ্যতার সূর্যালোক যখন পৃথিবীর অন্য অংশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি, সেই সময়ে ভারতের জ্ঞানী ঋষিগণ তপোবনের কুটীরে বসে বিশ্ববিধাতার মহত্ত্ব ও বিশালতা উপলব্ধির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্য ভেদ করবার দুরূহতম কার্যে তাঁরা ব্রতী ছিলেন। 'ভূমা'-কে উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের একমাত্র চেষ্টা।

পরম ব্রহ্মের সংগে আত্মিক যোগ স্থাপনে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন, শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে বিশ্বাসে সুদৃঢ় কণ্ঠে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। —শ্বেতাশ্বতর ২।৫
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। —শ্বেতাশ্বতর ৩।৮

আর্যঋষি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। বিশ্বমানবকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ—অমৃতের পুত্র—ঈশ্বরের পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। বিশ্বজনীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী সেই সুপ্রাচীন যুগে ভারতের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল। সবাই অমৃতের পুত্র, ঈশ্বর আমাদের পিতা—

ওঁ পিতা নোঽসি
পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের মুক্তিকর্তা -এই বোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত কর, তোমায় প্রণাম।

সারা বিশ্বের সব শ্রেণীর মধ্যে এক সাম্যবোধ ভারতীয় ঋষি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন,

'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।' যাদের মন সাম্যে স্থিত হয়েছে, তারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গ জয় করেছেন। যতদিন-না এই সাম্য ভাব আয়ত্ত হচ্ছে, ততদিন কেউ কখনই মুক্ত হতে পারে না।

স্বামীজী এ সম্পর্কে বলেছেন—'সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে সমজ্ঞানের মহান উপদেশ পালন করুন, সর্বভূতে সেই ভগবান দেখুন। এই হল মুক্তির পথ, বৈষম্যই বন্ধনের পথ। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি একত্ব জ্ঞান ছাড়া সাংসারিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। আর সকলের মানসিক একত্ব জ্ঞান ছাড়া মানসিক স্বাধীনতাও লাভ করতে পারে না। অজ্ঞান, অসাম্য ও বাসনা—এই তিনটিই মানুষের দুঃখের কারণ, আর এদের মধ্যে একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। একজন মানুষ নিজেকে অপর কোন মানুষ থেকে, এমন কি পশু থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাববে কেন? বাস্তবিক সর্বত্রই ত এক বস্তু বিরাজ করছে।'

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, আবার তুমিই কুমারী।

এই সমত্ব ভাব লাভ করাই সমস্ত সমাজের, সমস্ত জীবের ও সমস্ত প্রকৃতির আদর্শ বৈষম্য মনুষ্য প্রকৃতিতে বিষের কাজ করে, মানুষের উপর এ এক অভিশাপ

সকল দুঃখের মূল কারণ এই বৈষম্য। এই বৈষম্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সব রকম বন্ধনের মূল।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

—ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি লাভ করেন।"

শিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সেই জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপকে। ভারতের সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা, আর্যসমাজ ছিল ধর্মভিত্তিক। আর্যরা ছিল স্বভাবতঃ আত্মকেন্দ্রিক। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের প্রাচুর্যের ফলে তাদের জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়নি। জীবনের অবসর মুহূর্তগুলিকে তারা শুধুমাত্র অলস অবসর বিনোদনে অপচয় না ক'রে জ্ঞানচর্চাও করেছেন। জীবনযাত্রা সরল ও স্বচ্ছন্দ হওয়ায় জীবন জিজ্ঞাসা তাঁদের কাছে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এ সম্পর্কে তারা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। আর্য ঋষির মনে আত্ম জিজ্ঞাসার যে প্রশ্ন জেগেছিল—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা বিস্ময় তার চিত্তে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, তাকে তারা সমাধান করবার চেষ্টা বহু ভাবে করেছেন। বৈদিক ঋষিরা ভারতীয় মনীষার যে পরিচয় রেখে গিয়েছেন, তা আমাদের বিস্মিত করে। উত্তরাধিকারী সূত্রে সেই জ্ঞানভাণ্ডারের সামান্যই আমরা লাভ করেছি—তবু সেই অমৃত ভাণ্ডারের যে কণামাত্র আমরা রক্ষা করতে পেরেছি, তাকেই বিশ্বের দরবারে আমাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদসংগ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপহার বলে দিতে পারি।

বৈদিক ও তৎপরবর্তী হিন্দুসমাজ যে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিল, তা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাচীন ঋষিদের অভিমত থেকেই জানতে পারি। আর্য ঋষিরা মনে করতেন, আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সত্যোপলব্ধির সাধনাই তাঁরা করেছেন। জ্ঞানার্জনের শেষ নেই—তাই শিক্ষারও শেষ নেই, "যাবজ্জীবং অধীতে বিপ্রঃ"। সত্যিকারের জ্ঞানের যে সন্ধানী সে আজীবন ছাত্র। বিদ্যাই দেয় মানুষকে মুক্তির সন্ধান—"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"। বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে অন্ধের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। জ্ঞান হচ্ছে মানুষের তৃতীয় নেত্র ; এ দৃষ্টির সাহায্যেই আমরা সব কিছুর গভীরে প্রবেশ করতে পারি। মহাভারতে বলা হয়েছে—"নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্য সমং তপঃ"। ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন—একজন মানুষ যে অপর একজন থেকে শ্রেষ্ঠ হয়, তা তার অতিরিক্ত হাত বা চক্ষুর জন্য নয়, শিক্ষার দ্বারা তার মন ও বুদ্ধি উন্নত হয়েছে বলেই সে শ্রেষ্ঠ। ভর্তৃহরি বিদ্যাহীনকে পশু বলে অভিহিত করেছেন। শুধু জন্মগত দাবী নিয়ে বৈদিক সমাজে কেউ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারত না। বিদ্যাই সমাজে মানুষকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যতদিন না সে বিদ্যা অর্জন ক'রে সুসংস্কৃত হয়, ততদিন সে শূদ্রই থেকে যায়।

হিন্দু সমাজে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা পিতার অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হত; বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে সন্তানের জনক হলেই পিতৃঋণ শোধ হয় না, সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই পিতৃঋণ শোধ হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই শিক্ষা গ্রহণে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। --জাগতিক ও পরমার্থিক সব দিক্ থেকেই বিদ্যার প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলেছে।

॥ শিক্ষার লক্ষ্য ॥

মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণ। এই পূর্ণতা—পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ জীবাত্মায় নিহিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য সেই পরিপূর্ণতার বিকাশ—পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দকে ফুটিয়ে তোলা। স্বামী বিবেকানন্দ একেই বলেছেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man." পূর্ণতা (Perfection) লাভই হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতে ভারতীয় শিক্ষার ধারা নির্ণীত ও নির্মিত হয়েছিল। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্পর্কেও আর্য ঋষিরা উদাসীন ছিলেন না। তাই দেখি বিদ্যার দু'টি ভাগ—পরা ও অপরা বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা ও লৌকিক বিদ্যা। সমাজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা ক'রে ব্যবহারিক বা লৌকিক বিদ্যার (Secular knowledge) ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। ঋষিরা বলেছেন "অবিদ্যয়ামৃত্যুংতীর্ত্বা, বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। অবিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা অনুশীলনের প্রয়োজন জগতে বেঁচে থাকবার জন্য। আর ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন অমৃতত্ব বা চরম শান্তি প্রাপ্তির জন্য।

"হিন্দু শিক্ষার অর্থ জীবনের একটা বিশেষ পর্যায়ে শুধু বুদ্ধি প্রক্রিয়ার সাহায্যে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বোধ ও জ্ঞান অর্জন করা ছিল না, তা ছিল এক সুনিয়ন্ত্রিত জীবনসাধনা। জীবনই শিক্ষা ও শিক্ষাই জীবন—এ দু'য়ের অনন্যতাই হচ্ছে হিন্দু শিক্ষার অনুপম বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ। পরিণত বয়সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবার উপায় মাত্র, বা ব্যবহারিক জগতে খ্যাতি, শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা বা জীবনে সুখ, সুবিধা ও প্রাচুর্য ভোগ করবার উপায়মাত্র, এ দৃষ্টিতে শিক্ষার বিচার করা হত না। দ্বিজাতির পক্ষে চতুরাশ্রমেই শাস্ত্রতত্ত্ব অধ্যয়ন ও মনন করা ছিল ধর্ম। শিক্ষা ছিল উপায় ও উপেয় দুইই। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ না করবার স্বাধীনতা দ্বিজাতির ছিল না। সংক্ষেপে, দ্বিজাতির আয়ুষ্কালের সমস্ত স্তর এবং অবস্থাতেই পরিস্থিতি ও সুবিধা অনুযায়ী শাস্ত্রালোচনা, জ্ঞানার্জন ও তত্ত্বচিন্তা আবশ্যিক ছিল।" [শিক্ষার ভাবধারা—ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ]।

পরাবিদ্যার লক্ষ্য আত্মার মুক্তি "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে", ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার এই শেষ কথা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি শিক্ষার্থীই গৃহের বন্ধন কাটিয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমকে অবহেলা ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন করবে। বৈদিক যুগে, কি ব্রাহ্মণ্য যুগে, অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থীই আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে অধ্যাপনা ও সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হত।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত, তাই শিক্ষার নিকট বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলা। লৌকিক বিদ্যায় দ্বিজাতির প্রতিটি বর্ণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার আলোচনাকালে আমরা দেখব বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি, আত্মসংযম, সামাজিক কর্তব্য পালন, জাতীয় সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী যাতে সচেতন হয়, সে ব্যবস্থাও প্রাচীন শিক্ষার অঙ্গ ছিল।

॥ বিদ্যারম্ভ ॥

ভারতে তপোবনই হচ্ছে আদি বিদ্যালয় ও ঋষিরাই হচ্ছেন আদি গুরুকুল। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তপোবনস্থ গুরু গৃহই ছিল শিক্ষার্থীর পুণ্যতীর্থ। হিন্দু জীবনের প্রতিটি স্তরের সঙ্গেই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান জড়িত। নবীন বিদ্যার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা "বিদ্যারম্ভ" সংস্কার অথবা "অক্ষর স্বীকরণ" ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হত। পাঁচ বছর বয়সে চূড়াকর্ম বা চৌল কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত। যদি পাঁচ বছর বয়সে চূড়াকর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব না হত, তাহলে উপনয়নের পূর্বে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিশু যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১২ বছর বয়স পর্যন্ত গৃহে পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। বিদ্যারম্ভ সংস্কারের উল্লেখ অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয়, উপনয়নের মত এ প্রথাটি খুব প্রাচীন নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও কালিদাসের রঘুবংশে চৌল কর্মের উল্লেখ আছে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবারের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। বৈদিক শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে বিদ্যারম্ভ সংস্কারের পর পরিবারের মধ্যে থেকে শিশু বেদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করত। প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে পিতাই পুত্রকে বেদ শিক্ষা দিচ্ছেন। অরুণি তার পুত্র শ্বেতকেতুকে দর্শনে শিক্ষা দেন, প্রজাপতি তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। গায়ত্রী মন্ত্র পিতাই সন্তানকে শিক্ষা দিতেন। পরবর্তী কালে বৈদিক শিক্ষা যখন জটিল হয়ে উঠল এবং শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গুরুকুলের আবির্ভাব হল তখনই গুরুগৃহে শিক্ষারম্ভ অপরিহার্য হয়ে উঠল।

॥ উপনয়ন ॥

হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য উপনয়ন ছিল একটি অপরিহার্য সংস্কার। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্বে এই তিন বর্ণের উপনয়ন একটি অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। মেয়েদেরও উপনয়ন সংস্কার হত। উপনয়নের অর্থ সমীপে নিয়ে যাওয়া—অর্থাৎ শিক্ষকের নিকট নিয়ে যাওয়া। উপনয়ন অতি প্রাচীন প্রথা হলেও ঋগ্বেদের আদিযুগে উপনয়ন সংস্কার অবশ্যপালনীয় ছিল বলে মনে হয় না। কোন ছাত্র যদি বৈদিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হত, তাহলে তার জন্য উপনয়নের প্রয়োজন হত না। আবার শিক্ষাকালে গুরু পরিবর্তন করলে নতুন

ক'রে উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন হত। পরবর্তী কালে উচ্চ তিন বর্ণের জন্য বৈদিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে নির্দেশ দেওয়া হল যথাসময়ে উপনয়ন সংস্কার না হলে সে জাতিচ্যুত হবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের উপনয়নের পর তাদের নতুন জন্ম লাভ হত, তাই তাদের দ্বিজ বলা হত। ধর্মসূত্রকারগণ উপনয়নের যে বয়স নির্ধারণ করেছেন, তা থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ সন্তানের আট বছর, ক্ষত্রিয়ের এগারো বছর ও বৈশ্যের বারো বছর বয়সে উপনয়ন হত। বৌধায়ন ৮-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত উপনয়নের জন্য প্রশস্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, কুলরীতি অনুসারে সুবিধামত উপনয়ন হতে পারে, অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানের উপনয়ন যথাক্রমে ৮, ১১, ১২ বছর বয়সে হওয়া উচিত। এ বয়স যথাক্রমে ১৬, ২২ ও ২৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়। ব্রাহ্মণ সন্তান শ্বেতকেতুর বারো বছর বয়সে উপনয়ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে গুরুগৃহে শিক্ষার জন্য যায়।

ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে উপনয়ন ও গুরুগৃহে গমনের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প হলেও একথা মনে করবার কারণ নেই যে, তারা বুদ্ধিতে অন্য দু'বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বলেই তাদের জন্য এ ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ সন্তান যে পরিবেশে মানুষ হত, সেখানে তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বেদবিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল। ব্রাহ্মণ পরিবারে বহুক্ষেত্রে পিতাই ব্রহ্মচারী সন্তানকে প্রাথমিক বৈদিক শিক্ষায় দীক্ষিত করতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরিবারে সে সম্ভাবনা ছিল না। তাদের পারিবারিক পরিবেশও অল্প বয়সে বেদ শিক্ষার অনুকূল ছিল না। উপনয়নের পরেই তাদের গুরুগৃহে যেতে হত, তাই তাদের উপনয়ন বিলম্বিত হত। পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের প্রধান কাজ ও বেদ অধ্যয়ন তার প্রধান শিক্ষা। এজন্য ব্রাহ্মণকে বেদের বিভিন্ন অংশ যতটা পড়তে হত, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বেদ তত ব্যাপকভাবে পড়বার প্রয়োজন হত না। তাই ব্রাহ্মণ সন্তানকে একটু কম বয়সেই উপযুক্ত গুরুর অধীনে শিক্ষার জন্য অন্তেবাসী বা আচার্যকুলবাসী হতে হত। শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকতে হত। শিক্ষা শেষ না ক'রে গুরুগৃহত্যাগ ছিল ধর্মবিরোধী।

প্রথম যুগে উপনয়নের অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত সরল। শিক্ষার্থী সমিধভার বহন ক'রে আচার্যের সমীপে যেত এবং প্রণাম ক'রে গুরুকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গ্রহণ করতে অনুরোধ করত। পরে অনুষ্ঠানে অনেক জটিলতা এসে প্রবেশ করে। উপনয়নকালে নবীন শিক্ষার্থীকে মস্তক মুণ্ডন কৌপীন ও মেখলা ধারণ করতে হত। মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যজ্ঞাগ্নিতে সমিধ অর্পণ ক'রে হোম সম্পন্ন হত। উপনয়নকালে তরুণ ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা করতে হত। ছাত্রজীবনে তাকে নিয়মিত ভিক্ষা করতে হবে, এখানেই তা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে হত। ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে দেহ আচ্ছাদিত রাখতে হবে, এজন্য উপনয়নকালে শিক্ষার্থীকে একখণ্ড বস্ত্র দেওয়া হত। প্রাচীন কালে মৃগচর্ম দেওয়া হত। উপনয়নকালে যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম পরবর্তীকালে রীতি। প্রথম যুগে নবীন ব্রহ্মচারীকে যজ্ঞোপবীত দেওয়া হত না। শিক্ষার্থীকে উত্তরীয় দেওয়া হত।

আচার্য ব্রহ্মচারীকে একটি দণ্ড দিতেন। আচার্যগৃহে থাকাকালীন আচার্যের গোধন রক্ষায় ও আত্মরক্ষার উপায়রূপে এ দণ্ডের প্রয়োজন ছিল অনেক।

কালক্রমে হিন্দুধর্মে বহু শাখার উদ্ভব হল। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হলে সাধারণের মধ্যে বেদ চর্চার উৎসাহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জাতিগত বৃত্তির সঙ্গে বেদের কোন সম্পর্ক না থাকায় তারা আপন জাতিগত বৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুর দিক্ থেকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্য হতে উপনয়ন প্রথা উঠে যেতে থাকে। আলবেরুণীর বিবরণ থেকে জানা যায়, একাদশ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে বেদশিক্ষা লোপ পেয়েছে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে উপনয়ন শুধুমাত্র অর্থহীন অনুষ্ঠানরূপে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। প্রথম অবস্থায় এই অনুষ্ঠান বেদপাঠের সূচনা বলে মনে করা হত। পরবর্তী কালে এটা একটা কৌলিক সংস্কারে পরিণত হয়।

শূদ্রের বেদপাঠে ও উপনয়নে অধিকার ছিল না। এজন্য আর্যদের অনুদার বলা হয়। শূদ্রদের বেদের ভাষার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, বৈদিক আচার তারা মানত না। তাই বেদশিক্ষা তাদের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় নি। পুরাণ ও বেদাঙ্গে তাদের অধিকার ছিল। মৌখিক বেদশিক্ষায় উচ্চারণ শুদ্ধির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হত। বৈদিক ভাষার সঙ্গে অপরিচিত ছিল বলে—অনার্যদের কাছ থেকে তা পাবার আশা ছিল না।

উপনয়নের পর শিক্ষার্থীকে গুরু বরণ করতে হত। শিক্ষার্থী সমিধভার বহন ক'রে তপোবনের গুরুগৃহে এসে উপস্থিত হত। গুরু তার নাম, বংশপরিচয় প্রভৃতি জেনে তাকে গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করতেন। বহু সময় গুরুর সন্ধানে বিদ্যার্থীকে বহু দূরে যেতে হত। তপোবনের যুগ শেষ হয়ে যাবার পর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ও তক্ষশীলা যখন বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল, তখন বহু দূর দেশ থেকে ছাত্ররা এ সব স্থানে বিদ্যার্জনের জন্য আসত। গুরু ছাত্র নির্বাচনের সময় দেখতেন ছাত্র শারীরিক রোগমুক্ত, বুদ্ধিমান, মানসিক দিক্ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ, কৃতজ্ঞ, সুশীল ও ঈর্ষাহীন কিনা।

॥ আচার্য ॥

প্রাচীন হিন্দু সমাজে গুরু ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে, পিতামাতা সন্তানের দেহ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু শিক্ষা দিয়েছে আমাদের নতুন জন্ম, আর এ শিক্ষা আমরা লাভ করেছি গুরুর কাছে থেকে। একজন দার্শনিক বলেছেন, জ্ঞানের দীপ ছিল একটি পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। গুরু সেই আচ্ছাদনকে অপসারণ ক'রে জ্ঞানের আলোক আমাদের কাছে মুক্ত করেছেন। গুরুকে শুধু শ্রদ্ধাই করা হত না, শিষ্য সম্পূর্ণভাবে গুরুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করত। গীতায় অর্জুন শ্রীভগবান্‌কে বলেছেন, "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বং প্রপন্নম্"। গুরুকে বলা হয়েছে "গুরু-রেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'। গুরুও শিষ্যকে অতি আপন ক'রে গ্রহণ করতেন,

তাই দেখি উপনিষদের আচার্য ও শিষ্য সমভাবে প্রার্থনা করেছেন, "সংনাববতু। সহনৌ ভুনক্তু। সহবীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।" পরম পুরুষ আমাদের উভয়কে রক্ষা করুন। উভয়কে অন্নদান করুন। উভয়কে বীর্যশালী ও তেজস্বী করুন। আমরা যেন বিদ্বেষপরায়ণ না হই।

সে যুগে গুরুর সাহায্য ও নির্দেশ ব্যতীত বেদবিদ্যা আয়ত্ত করা ছিল অসম্ভব। বৈদিক শিক্ষা ছিল মৌখিক। বৈদিক হিন্দু সমাজে গুরুপরম্পরা বেদ রক্ষিত হয়েছে। শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তির জন্য গুরুর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। উপনিষদের যুগে দর্শনের গূঢ় তত্ত্বকে জানবার জন্য গুরুর সাহায্য আরও বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। স্মৃতিশাস্ত্র বৈদিক সাহিত্যের ব্যাখ্যার সহায়ক ছিল, কিন্তু সূত্রসাহিত্য এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে, গুরুর সাহায্য ও টীকাটিপ্পনী ছাড়া তা বোধগম্য হত না। সব দিক থেকেই আচার্য ছিলেন ছাত্রের জীবনে অপরিহার্য। তাই গুরুর কাছে শিষ্য নিজেকে নিঃসংশয়ে সঁপে দিত।

আচার্য যেমন পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন, তেমনি তাকে বহু গুণের অধিকারী হতে হত। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ও পক্ষপাতশূন্য হয়ে সমদৃষ্টিসম্পন্ন গুরু সমভাবে সব শিষ্যকে বিদ্যাদান করতেন। তিনি শুধু জ্ঞানীই হতেন তাই নয়, তাকে হতে হত, "প্রবৃত্ত বাক্‌চিত্র কথঃ উহ বান প্রতিভান বান। আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥" গুরু হবেন সুবক্তা, প্রত্যুৎপন্নমতি, বহু সরস কাহিনীর ভাণ্ডার ও অতি কঠিন সূত্রও অতি সহজে সুন্দর ব্যাখ্যায় পারদর্শী। অর্থাৎ বিদ্বান্ হলেই হবে না, বিদ্যাদানেও তাঁকে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। অকুণ্ঠচিত্তে গুরু তাঁর সমস্ত বিদ্যা শিষ্যকে দান করতেন। শিষ্যকে তার অদেয় কিছুই ছিল না। শিষ্যের প্রতিভা গুরুকে ম্লান করে দেবে, এই ভয়ে যদি কোন গুরু নিজের জ্ঞাত কোন বিদ্যা থেকে শিষ্যকে বঞ্চিত করতেন, তাহলে তিনি আচার্য নামের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। যদি আচার্য কোন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতেন, তাহলে ছাত্রকে বিদায় দিয়ে নিজে সে বিষয়ে পড়ে জেনে নিতেন—গুরু নিজেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষার্থী থাকতেন।

প্রাচীন ভারতের আচার্যগণ বিদ্যাদানকে জীবনের মহত্তম বৃত্তি বলে মনে করতেন। অর্থ, রাজসম্মান, যশঃ—সবকিছু স্বেচ্ছায় উপেক্ষা ক'রে দারিদ্র্যকে জীবনের চিরসাথীরূপে স্বীকার ক'রে শিক্ষাদানরূপ মহান্ আদর্শকে তাঁরা জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই শিক্ষকের স্থান ছিল সমাজের সর্বোচ্চে। তপোবনবাসী আচার্য রাজসভায় এলে রাজাও আপন সিংহাসন ছেড়ে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেন। ব্যক্তিত্ব, সমুন্নত চরিত্র, ত্যাগ, গভীর জ্ঞান, ধর্মে ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য গুরুই ছিলেন সমাজে সর্বাধিক পূজ্য।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত পবিত্র ও মধুর। শিষ্য গুরুর পরিবারস্থ পরিজন বলেই গৃহীত হত। শুধু শিক্ষাদান ছাড়াও শিষ্যের নৈতিক ও পারমার্থিক জীবনের উন্নতির জন্য শিষ্যের প্রতি গুরুর আরও বহু কর্তব্য ছিল। শিষ্যের আহার,

বাসস্থানের ব্যবস্থা, কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্পর্কে শুধু উপদেশ দিয়েই তার কাজ শেষ হত না। আহার-বিহার, নিদ্রা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে করণীয় ও অকরণীয় বিষয়েও গুরু উপদেশ দিতেন। এছাড়া, গুরু শিষ্যের রোগশয্যার পাশে থেকে মায়ের মতন সেবা করতেন। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, 'গুরু শিষ্যের প্রতি শান্ত ও মধুর বাক্য ব্যবহার করবেন। শিষ্যের পীড়াদায়ক বা যন্ত্রণাদায়ক বা অনিষ্টকর বা ভীতিজনক বাক্যের প্রয়োগ করবেন না। তাহলে তার স্বর্গের পথ রুদ্ধ হবে। গুরু কোনরূপ আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে শিক্ষকতা করতেন না। বিনা পারিশ্রমিকে গুরু শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাশেষে গুরু-দক্ষিণা ছাড়া শিষ্যের কাছ থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। গুরুর আশীর্বাদেই শিষ্য সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠত। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "কায়মনোবাক্যে এবং কর্মের দ্বারা ব্রহ্মচারীর গুরু হিতসাধন করবে। শিক্ষালাভের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে গুরুর বাক্যের"। আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে, "প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া"।

॥ ব্রহ্মচারী ॥

উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য। দ্বিজাতির মধ্যে বৈদিক শিক্ষায় তরুণ শিক্ষার্থীকে উপনয়নের পর গুরুর নিকট শিক্ষার জন্য যেতে হত। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীর শিক্ষা শুরু হত। আপন সন্তান-স্নেহে গুরু ব্রহ্মচারীকে নিজ পরিবার মধ্যে গ্রহণ করতেন। সমগ্র শিক্ষাকাল ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে থাকতে হত। শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুরুকে ত্যাগ করা ধর্মবিরুদ্ধ ছিল। গুরুগৃহবাসী শিষ্যকে অন্তেবাসী বা আচার্যকুলবাসী বলা হত। সর্বক্ষেত্রে গুরুগৃহে যাবার পরই গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে গুরু শিষ্যকে নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। উপযুক্ত বিবেচিত হলে তারপর তাকে শিক্ষা দিতেন। এই পরীক্ষাকাল এক বছরের বেশী হওয়া বিধেয় ছিল না। গুরুর তুষ্টির জন্য শিষ্যকে কত কষ্ট সইতে হত, আরুণি, উপমন্যু প্রভৃতি উপাখ্যানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গুরুগৃহবাসকালে চিন্তায়, বাক্যে, কার্যে ব্রহ্মচারীকে কতকগুলি অবশ্যপালনীয় নিয়ম মেনে চলতে হত। অতি প্রত্যূষে গুরুর শয্যাত্যাগের পূর্বে শিষ্যকে শয্যা ত্যাগ করতে হত। রাত্রে গুরু শুতে যাবার পর শিষ্য শয্যা গ্রহণ করত। প্রত্যূষে স্নান সমাপন ক'রে সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি সেরে গুরুর পরিচর্যায় রত হতে হত। শিষ্য গুরুগৃহের দৈনন্দিন কাজে অংশ গ্রহণ করত। গুরুগৃহের যজ্ঞাগ্নি রক্ষার জন্য সমিধ আহরণ ও গুরুর গোধনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা শিষ্যের কর্তব্য বলে বিবেচিত হত।

চরিত্রগঠনের জন্য সংযত ও ইন্দ্রিয়সুখ থেকে বিরত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য ছাত্রদের সর্ববিধ আরাম কি বিলাস থেকে দূরে থাকতে হত। দিবানিদ্রা, অসংযত আহার, মিষ্টান্ন ও মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ, গন্ধদ্রব্য, মাল্য-চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার, একবারের বেশী স্নান, তেলমাখা, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি থেকে ছাত্রদের দূরে থাকতে হত। স্ত্রীলোকের-সঙ্গ—এমন কি তাদের দিকে তাকানো ও মাদকদ্রব

গ্রহণ, জুয়াখেলা ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচারীকে কামোদ্দীপক কোন খাদ্যগ্রহণ বা কার্য পরিহার ক'রে চলতে হত। ছাত্ররা ছাতা কি পাদুকা ব্যবহার করতে পারত না। তবে অরণ্যে সমিধ সংগ্রহ করবার সময় পাদুকা ব্যবহার চলত।

গুরুনিন্দা মহাপাপ. যেখানে গুরুনিন্দা হত শিষ্যকে সে স্থান পরিত্যাগ করতে হত। গুরুর দুর্বলতাকে বাদ দিয়ে গুরুর গুণরাজি সবভাবে অনুকরণ করতে হত। জাতিচ্যুত হবার সম্ভাবনা ভিন্ন গুরুর অন্য সব আদেশই শিষ্যকে মেনে চলতে হত। গুরুর সম্মুখে থুথু ফেলা, হাস্যপরিহাস, হাইতোলা, আঙুল মটকানো, গুরুর সম্মুখে হেলান দিয়ে বসা, পায়ের উপর পা তুলে বসা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। গুরুর সম্মুখে সর্বদা শিষ্যকে নীচাসনে বসতে হত। গুরুর দিক্ থেকে বাতাস বইতে থাকলে ছাত্রকে দিক পরিবর্তন করতে হত। গুরু ডাকলে শিষ্য দূরে থাকলেও দাঁড়িয়ে সাড়া দিতে হত।

কোন ছাত্রের নিকট ব্যক্তিগত খরচের জন্য কোন অর্থ রাখা চলত না। এমন কি রাজকুল বা অভিজাত-বংশীয় ছাত্ররাও ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ অর্থাদি রাখতে পারত না। সাধারণ পরিবারের সন্তানদের মত তাদেরও সমান কৃচ্ছ্রসাধন করতে হত।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভিক্ষা ব্রহ্মচারীর অবশ্যপালনীয় ধর্ম ছিল। শিক্ষার্থীর পক্ষে ভিক্ষার নির্দেশ বেদের যুগ থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী কালে বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল। ছাত্রের নিকট ভিক্ষান্নের চেয়ে পবিত্রতর আর কোন অন্ন ছিল না। ভিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারী বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা পেত। ছাত্রজীবনে ধনীদরিদ্রের প্রভেদ ছিল না, সবাইকেই ভিক্ষা করতে হয়। ফলে সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত না। যে সমাজের সাহায্যে ও দানে তরুণ শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেল, সেই সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কেও শিক্ষার্থী সচেতন থাকত। এছাড়া, দেশের শিক্ষা সম্পর্কেও দেশবাসীর একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, সমাজের মধ্যে সে বোধ জাগ্রত হত। শিক্ষার জন্য ব্যয়ভার সবাইকে সমভাবে বহন করতে হবে, এ বোধ থাকার জন্য গৃহস্থের দ্বার হতে শিক্ষার্থীকে কখনও বিমুখ হয়ে ফিরতে হত না। শিক্ষার্থী-ভিক্ষাপ্রার্থীকে অন্নদান করা ছিল শাস্ত্রের নির্দেশ। এ নির্দেশ অমান্য করলে সে গৃহস্থ-ধর্মে পতিত হত। কোন শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনের বেশী খাদ্য ভিক্ষাদ্বারা গ্রহণ করতে পারত না, করলে তার চৌর্য অপরাধের সমান অপরাধ হত। খাদ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য যদি ভিক্ষায় পাওয়া যেত, তাহলে তা এনে গুরুকে দিতে হত। শিক্ষা শেষ হলে কোন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করতে পারত না। তবে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের জন্য শিক্ষা শেষে ভিক্ষার বিধান ছিল। শিক্ষার্থীর পক্ষে ভিক্ষা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হলেও বৈদিক যুগের শেষভাগে মনে হয় এর ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছিল। দরিদ্র ছাত্ররা ভিক্ষার দ্বারাই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করত। কিন্তু ধনীর সন্তানরা সবক্ষেত্রে ভিক্ষা করত না। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে যে শিক্ষার্থী সপ্তাহে একদিনও ভিক্ষায় বের হত না, তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান রয়েছে। গৃহ্যসূত্রে ও মনুতে আচার্যের গৃহে অন্নগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে তক্ষশীলায়

সঙ্গতিপন্ন ছাত্ররা গুরুগৃহে আহার করত—এজন্য তারা এককালীন শিক্ষাপণ দিত। বৌদ্ধযুগের শ্রমণদের শিক্ষাকালে বৌদ্ধমঠ থেকে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত।

শিষ্যকে কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়ে চলতে হলেও এর মধ্যে বিরক্তিকর বা পীড়াদায়ক কিছু ছিল না। শিষ্যের সামনে এক উচ্চ আদর্শ তুলে ধরাই ছিল গুরুর কাজ। তাই শিষ্যের কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে ছাত্রজীবনে যেসব বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা সেযুগে ছিল, তা শিষ্যের জীবনে কল্যাণকর রূপেই দেখা দিয়েছে।

॥ বাৎসরিক অধ্যয়ন-কাল ॥

প্রতি বৎসর সাড়ে চার মাস থেকে সাড়ে পাঁচ বা ছমাস শিক্ষাকার্য চলত। শ্রাবণ মাসের জ্যোৎস্না পক্ষে কখনও শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন পাঠ শুরু হত। পৌষ-মাঘ মাস কাল পর্যন্ত অধ্যয়ন চলত। তারপর দীর্ঘ বিরতি। পাঠ শুরু হত "উপাকরণ" অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, সাধারণতঃ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে উৎসর্গ অনুষ্ঠান হয়ে বাৎসরিক শিক্ষাকার্য শেষ হত। উপক্রমণ ও উৎসর্জন কালে তু'দিন ছুটি থাকত। ধর্মসূত্র অনুযায়ী জানা যায় শুক্লপক্ষে বেদ ও কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ পড়া হত।

সে যুগেও অনধ্যায় দিবস বা ছুটির দিনের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের দিন, কোন কোন মাসের অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতিথির দিন, রাজার মৃত্যুতে, রাজপুত্রের জন্ম ও মৃত্যুতে, রাজার পরাজয়ে, অশৌচকালে, শিষ্যের মৃত্যুতে পড়া হত না। এ ছাড়া, ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতারা নানা উপলক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। দিনে বজ্রপাত হলে, ধূলি-ঝড় উঠলে, রাত্রে শোঁ। শোঁ। ক'রে বাতাস বইলে, বাদ্যের শব্দ শোনা গেলে, রথের চাকার শব্দ এলে, রোগীর কাৎরানি শোনা গেলে, কুকুর বা শেয়ালের ডাক, বানরের কিচিরমিচির শোনা গেলে, রামধনু উঠলে বা আকাশ অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠলে বেদপাঠ বন্ধ থাকত। যে সব তিথিতে নিয়মিত পাঠ বন্ধ থাকত তাকে নিত্য অনধ্যায়, আর যখন বিশেষ কারণে পাঠ বন্ধ হত, তাকে বলা হত নৈমিত্তিক অনধ্যায়। এই অনধ্যায়-দিবস নির্ধারণের পিছনে অধিকাংশই ছিল সংস্কার। বেদপাঠের মত পবিত্র কাজ পরিবেশ-ভিন্ন হওয়া সম্ভব নয় বলে হয়ত এসব সংস্কার মেনে চলা হত। এ ছাড়া, বাইরের শব্দ বেদপাঠের পক্ষে অন্তরায় ছিল। বেদ আয়ত্ত করতে হলে গুরুর মুখ থেকে সঠিক উচ্চারণকে জেনে নিতে হত। তাই বাইরের অসুবিধায় সময় সময় পূর্ণ পাঠবিরতি না হয়ে সাময়িকভাবে পাঠবিরতি হত। পরবর্তী কালে ছুটির দিন কমিয়ে দেওয়া হত ও পাঠের সময় দীর্ঘতর হয়ে পূর্ববর্তী অনধ্যায়-দিবসগুলিতে বেদ ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের পাঠ হত। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য যত ছুটি ছিল অগ্রবর্তী ছাত্রদের জন্য ছুটির সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না।

॥ অধ্যয়ন-কাল ॥

বেদশিক্ষার জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা শিক্ষার কাল সম্পর্কে বলেছেন—ব্রহ্মচারী আমৃত্যু গুরুগৃহে বাস ক'রে

বেদ পাঠ করতে পারে। এক-একটি বেদ শেষ করতে হলে নিষ্ঠর সঙ্গে চার বছর পড়তে হত।

মহাভারতে বলা হয়েছে, জীবনের এক-চতুর্থাংশ অধ্যয়নের জন্য অতিবাহিত করা উচিত। তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে আছে ভরদ্বাজ মুনি তিন জন্ম বেদপাঠে অতিবাহিত করবার পর ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভরদ্বাজ, তোমাকে চতুর্থ জন্ম দিলে তুমি কি করবে? ভরদ্বাজ বলেছিলেন, বেদপাঠে অতিবাহিত করব। উপনিষদে বেদপাঠের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে জানা যায়, ইন্দ্র ১০৫ বছর প্রজাপতির ছাত্র ছিলেন। গুরুগৃহে থাকা কালেই নাকি উতঙ্কের চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল! যদি প্রতিটি বেদপাঠের জন্য ১২ বছর লাগত বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও মোট বেদপাঠের জন্য ৪৮ বছর দরকার হত। যদি ধরা যায় তিনটি বেদ, তাহলেও ৩৬ বছর লাগবার কথা। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, ভারতের ছাত্ররা সাঁইত্রিশ বছর কাল গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন করত। এত দীর্ঘদিন গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন করা খুব কম ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। মনে হয়, পরবর্তী কালে বেদপাঠের জন্য ১২ বছর সময় নির্ধারিত ছিল। চল্লিশ বছর পার ক'রে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ ক'রে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক ছিল না। তাই বিদ্যাশিক্ষার কাল বোধ হয় কমিয়ে দেওয়া হয়। যারা সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করতে চাইতেন বা কোন এক বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতেন, তারাই দীর্ঘদিন পড়াশুনা করতেন। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১২ থেকে ১৬ বছর বিদ্যাভ্যাস ক'রে প্রায় ২৬ বছর বয়সে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করত। যারা এর চেয়ে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করতেন, তারা ছিলেন নিয়মের ব্যতিক্রম।

।। বেতন ।।

শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের ধর্ম বলে বিবেচিত হত। এজন্য তারা ছাত্রদের কাছ থেকে কোনরূপ পারিশ্রমিক দাবী করতে পারতেন না।। দরিদ্রতম শিক্ষার্থীকেও গুরু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচিত হত। শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। যে শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান করতেন, সেই বিদ্যা-ব্যবসায়ী শিক্ষককে কোনরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচনা করা হত। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত পবিত্র। এখানে দেনাপাওনার সম্পর্ক সৃষ্টি করা অনুচিত বলেই বেতন নেওয়া নিন্দনীয় ছিল। ছাত্ররা ভিক্ষা ক'রে নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করত। অতি দরিদ্রের দ্বারেও ভিক্ষার্থী ছাত্র উপস্থিত হলে তাকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হত না, এ সম্পর্কে শাস্ত্রের নির্দেশ ছিল অতি কঠোর। বিদ্যাশেষে স্নাতক গুরুদক্ষিণা দিতেন। একমাত্র ধনীর পুত্র ছাড়া খুব বেশী কিছু কেউ দিত না। মনু বলেছেন, সমাবর্তনের পূর্বে কোন ছাত্র গুরুকে কোন উপহার দেবে না। গুরুর অনুমতি নিয়ে গৃহে ফিরবার

পূর্বে স্নাতক তার সাধ্যানুসারে দক্ষিণা (গুরুপ্রণামী) দেবে। ভূমি, গাভী, অশ্ব, ছত্র, পাদুকা, আসন, শস্য যে-কোন দ্রব্য দিয়ে গুরুর সন্তোষ বিধান করা যেত। বহু ক্ষেত্রে গুরুদক্ষিণার জন্য ব্রহ্মচারী বিত্তবানের নিকট বা রাজদ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা করতেন। দক্ষিণা দিয়ে গুরুর কাছে প্রাপ্ত জ্ঞানের মূল্য দেওয়া হল বলে মনে করা হত না। কারণ মূল্য দিয়ে সে ঋণ শোধ করা যায়, একথা কেউ মনেই করত না। দক্ষিণা হচ্ছে গুরুর প্রতি শিষ্যের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। "শিষ্যের কাজে ও ব্যবহারে গুরুর সন্তুষ্টি-সাধনই তাঁর প্রকৃত দক্ষিণা" (মহাভারত)।

আচার্যগণ বিদ্যার্থীদের কাছ থেকে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ না করলেও তাঁরা যাতে সুষ্ঠুভাবে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, সমাজ সে ব্যবস্থা করেছিল। বেদ ও উপনিষদ থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণেরা রাজানুকূল্য লাভ করতেন। অভিষেক, যজ্ঞ প্রভৃতি সময় রাজারা ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করতেন। পারলৌকিক কার্যে ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিত্তবানদের কাছ থেকে স্বেচ্ছামূলক দান পেতেন। বহু সময় ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছ থেকে দান পাওয়া যেত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বিদায়ী দেওয়া অতি প্রাচীন প্রথা। আচার্যদের মহান শিক্ষাদানব্রত যাতে নির্বিঘ্নে পালন করা সম্ভব হয়, সেজন্য রাজারা গুরুকুলের ভরণপোষণের জন্য গ্রাম দান করতেন। এসব গ্রামকে অগ্রাহার গ্রাম বলা হত। ব্রাহ্মণকে কোন রাজকর দিতে হত না। তাঁরা যে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করতেন, রাজা তাঁর অংশ লাভ করতেন। পরবর্তী কালে ছাত্ররা আচার্যের কাছ থেকে বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান লাভ করতেন। তবে এ নিয়মের যে কোনদিন পরিবর্তন হয়নি, একথা বলা যায় না। তক্ষশীলায় খ্যাতনামা আচার্যের কাছে কখন কখনও ৫০০ পর্যন্ত ছাত্র অধ্যয়ন করত। জাতক থেকে জানা যায়, এই ছাত্রদের মধ্যে কোন কোন রাজপুত্র সহস্র মুদ্রা পর্যন্ত বেতনস্বরূপ শিক্ষককে দিয়েছেন। দক্ষিণভারতের গুরুগণ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বেতন গ্রহণ করতেন। বেতন অবশ্য গুরুর যোগ্যতা ভেদে বিভিন্ন হত। যারা বিদ্যাপণ দিতে অসমর্থ ছিলেন, তাঁরা শ্রমমূল্যে বিদ্যা অর্জন করতেন। প্রথম যুগে গো-পালন, সমিধ আহরণ, গুরুগৃহের পবিত্র অগ্নির রক্ষণাবেক্ষণ সব ছাত্রেরই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ছিল। পরে যারা শ্রমমূল্যে বিদ্যার্জন করত, তারাই গুরুগৃহের যাবতীয় কাজ করত। রাতে ধর্মীয় আলোচনার বিধান থাকলেও এ সময়কে সাধারণভাবে অনধ্যায়ের সময় বলেই বিবেচনা করা হত। কিন্তু তক্ষশীলায় দরিদ্র ছাত্রদের সুবিধার জন্য যারা শ্রমমূল্যে পড়ত, তাদের জন্য রাতে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য আচার্যগণ রাজার থেকে আর্থিক সাহায্য পেলেও শিক্ষানিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনায় রাজা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। অর্থের বিনিময়ে আচার্যেরা তাঁদের স্বাধীনতা ত্যাগ করেন নি। রাজা শিক্ষায় আর্থিক সাহায্যদান কর্তব্য বলেই অর্থ বা গ্রামদান করতেন। আচার্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বা শিক্ষাকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য সাহায্য করতেন না।

॥ শাস্তি ॥

ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে বাসকালে অত্যন্ত কঠোর অনুশাসন মেনে চলতে হত। তবুও সবকালে সবদেশেই দু'একটি অমনোযোগী বা অশিষ্ট ছাত্র দেখা যেত— ব্রাহ্মণ্য যুগও এর ব্যতিক্রম নয়। এদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে ধর্মসূত্রকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অপরাধী ছাত্রের সংশোধনের জন্য ভীতি প্রদর্শন, শীতল জলে স্নান, উপবাস বা গুরুর গৃহ থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র দৈহিক শাস্তির বিরোধী। মনু ও গৌতম ছাত্রকে বুঝিয়ে শোধরাবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রয়োজন হলে সরু বেত দিয়ে প্রহার করবার বিধান দিয়েছেন। কিন্তু উত্তমাঙ্গে প্রহারের বিধান নেই। বেত মারবার পক্ষে পিঠকেই তাঁরা প্রশস্ত স্থান বলে রায় দিয়েছেন। গৌতম বলেছেন, শাস্তির পরিমাণ অধিক হয়ে গেলে রাজদ্বারে গুরুর নামে অভিযোগ করা চলত। মনু বলেছেন, গুরু উত্তমাঙ্গে প্রহার করলে তিনি চৌর্য অপরাধের সমান অপরাধী হবেন। তক্ষশীলায় ছাত্রদের নৈতিক দোষ সংশোধনের জন্য দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এসব ক্ষেত্রে রাজবংশ-জাত শিক্ষার্থীরাও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেত না। শিক্ষকের পক্ষে বেতের ব্যবহারটা একেবারে ত্যাগ করা সম্ভব না বলেই তক্ষশীলার শিক্ষকেরা মনে করতেন।

॥ পাঠক্রম ॥

প্রাচীন বৈদিক যুগে পাঠক্রম খুব বিস্তৃত ছিল না। তখনকার থাকাকালীন গুরুর নিকট বেদের বিভিন্ন অংশ আয়ত্ত করাই ছাত্রদের প্রধান কাজ ছিল। ধীরে ধীরে বেদ বিপুলায়তন হয়ে ওঠে। বেদবিদ্যা অর্জনের জন্য অধ্যয়নীয় অংশ বিপুল হয়ে দাঁড়ায় এবং আনুষঙ্গিক আরও অনেক শাখা এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কালক্রমে আর্য-সমাজে বর্ণভেদ প্রথা কঠোর ভিত্তির উপর স্থাপিত হবার ফলে বর্ণভেদে শিক্ষার তারতম্যের সৃষ্টি হয়। জাতিগত বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই বিভিন্ন বর্ণের জন্য স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠক্রম নির্দিষ্ট হয়।

দ্বিজ মাত্রের বেদে অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জাতিগত বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির ফলে এই দুই বর্ণের পাঠক্রমে বেদ গৌণ স্থান অধিকার করে। কালক্রমে শূদ্রের ন্যায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও বেদপাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার কাজের জন্য ব্রাহ্মণদের বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে হত। তারপর শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প পড়তে হত। বেদাঙ্গ সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে বেদপাঠ ও বৈদিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে করা সম্ভব হত না। শতপথ ব্রাহ্মণে পাঠক্রমের একটি বিস্তৃত তালিকা আছে। সেখানে বেদ ও বেদাঙ্গ ছাড়াও বিদ্যা (বিজ্ঞান), বাকোবাক্যম্ (তর্কশাস্ত্র), ইতিহাস. পুরাণ-গাথা, নারাশংসী, সর্পবিদ্যা, অসুরবিদ্যা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। দিন যত এগিয়ে চলল, পাঠক্রম ততই স্ফীতকায় হয়ে উঠতে

লাগল। ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে জানা যায়, গুরু সনৎকুমারের কাছে নারদ তাঁর অধীত বিদ্যার একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছিলেন। সেই তালিকায় তিনি যে সব বিদ্যার উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে—চতুর্বেদ, ইতিহাস—পুরাণ, ব্যাকরণ (বেদানাং বেদম্), পিত্য (পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান), রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্যম্, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রাহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা (পদার্থ ও জীববিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যা (রাষ্ট্রনীতি), নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (নাচ, গান, বাজনা, প্রলেপ-তৈরি)। একজন ছাত্রের পক্ষে এতগুলি শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করা সম্ভব কিনা সেটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে, কিন্তু এই তালিকা থেকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম যে কি পরিমাণ বিস্তৃত হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

এই বিস্তৃত তালিকা দেখে একথা মনে করা ভুল হবে যে, প্রতিটি ব্রাহ্মণ ছাত্রকেই এত বিদ্যা অর্জন করতে হত। আমরা পূর্বেই দেখেছি এক-একটি বেদ বিশালকায় হয়ে ওঠায় বেদশিক্ষা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। বেদের এক-একটি শাখা বিভিন্ন পুরোহিত বংশ ও তাঁদের শিষ্যাদির দ্বারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে গুরু তাঁর অধীত বিদ্যা শিষ্যকে দান করেছেন, গুরুর মুখ থেকে শুনে শিষ্য তা মুখস্থ করেছে—এমনিভাবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ধারা সুপ্রাচীনকাল থেকে বয়ে চলেছে। বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন বিদ্যার (বিজ্ঞান) উদ্ভব হয়েছে। যজ্ঞের বেদী নির্মাণ থেকে জ্যামিতি ও বীজগণিতের সৃষ্টি হয়েছে। শুভকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য তিথি, মাস, ঋতু প্রভৃতি গণনার মধ্য দিয়ে নক্ষত্র-বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। যজ্ঞে উৎসর্গিত পশুদেহের ব্যবচ্ছেদ থেকে দেহ-বিজ্ঞানের (anatomy) সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র গ্রন্থসমূহের পাঠকালে উচ্চারণজনিত ভ্রান্তি-নিরসনের জন্য ও সুষ্ঠু পদপাঠন রীতিকে জানবার জন্য ব্যাকরণ, ছন্দ ও ধ্বনিতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। জীবন ও বিশ্বের অনন্ত রহস্য সম্পর্কে মানুষের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, সে-সব প্রশ্নের সমাধানে দ্রষ্টা ঋষিরা আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপনিষদ সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে বিদ্যার একটির পর একটি শাখার সৃষ্টি হয়ে ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষা বিপুল আয়তন লাভ করেছে। একমাত্র দু'একটি নৈষ্ঠিক ছাত্রের পক্ষেই সারাজীবনব্যাপী সাধনার ফলে ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার বিভিন্ন দিক আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল। যে সব ছাত্র গুরুগৃহে একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে শিক্ষা শেষ ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করত, তারা সাধারণভাবে বেদপাঠ ও কৌলিক আচার প্রতিপালনের জন্য যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকত। কারণ, বেদের যে-কোন একটি শাখায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে যে সময়ের প্রয়োজন, তা সবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। শুধু বেদ নয়, বেদাঙ্গের ক্ষেত্রেও জটিলতা দিন দিন বেড়েই চলল। সঠিকভাবে বেদপাঠ ও বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বেদাঙ্গ সাহিত্য অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক বিবেচিত হত, কিন্তু বেদাঙ্গ দিন দিন কঠিন ও ব্যাপক হয়ে ওঠায় অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই বেদাঙ্গের ছয়টি শাখায় অধিকার লাভ করা অসম্ভব হয়ে

উঠল। ব্যাকরণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত ও মান্য আদি রচয়িতা গান্ধারনিবাসী পাণিনি। তিনি খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে তাঁর গ্রন্থে আরও ৬৫ জন বৈয়াকরণিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের গ্রন্থ আমরা পাইনি। পাণিনির চার হাজার সূত্র সমন্বিত গ্রন্থ আটটি অধ্যায়ে (অষ্টাধ্যায়ী) বিভক্ত। পাণিনির ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা ক'রে খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে কাত্যায়ন তাঁর বর্তিকা রচনা করেন। তার প্রায় একশ' বছর বাদে পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করেছেন। এমনিভাবে দেখা যায়, সময় যত এগিয়ে চলেছে বেদাঙ্গের প্রতিটি বিষয়ের কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিক্ষার্থীরা এক-একটি বেদের এক-একটি দিক্ নিয়ে আলোচনা ক'রে পারদর্শিতা লাভ করতেন। ব্রাহ্মণসমাজে দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী উপাধিগুলি এদিক্ থেকে বিশেষ অর্থবহ।

বেদ বেদাঙ্গ ছাড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীকে পারদর্শিতা লাভ করতে হত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণদের কাছে শিক্ষালাভ করত। তাদের শিক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণদের নানারূপ বিদ্যার্জন করতে হত। অস্ত্রবিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা, রামায়ণ ও মহাভারতে দেখা যায়, ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের অস্ত্রগুরুরা ব্রাহ্মণ। পরশুরাম, দ্রোণাচার্য এরা সকলেই অস্ত্রগুরু। তক্ষশীলায় ব্রাহ্মণ আচার্যগণ বহু বিষয় শিক্ষা দিতেন, অস্ত্রবিদ্যা ছাড়াও আয়ুর্বেদ, শল্যশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হত।

।। ক্ষত্রিয় ।।

প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়-শিশু উপনয়নের পর দ্বিজত্ব লাভ ক'রে গুরুগৃহে বেদপাঠের জন্য যেত। অন্যান্য ব্রাহ্মণ বালকের মত সে আচার্যের কাছ থেকে বেদশিক্ষা লাভ করত। বেদ ও উপনিষদে পারদর্শিতা লাভ ক'রে ক্ষত্রিয়েরাও ব্রহ্মবিদ্ হয়েছেন। ব্রহ্মবিদ্ ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য এসেছেন এমন ক্ষত্রিয়ের কথা প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ছিলেন বেদের বিখ্যাত সাবিত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা। রাজর্ষি জনকের কাছে বহু ব্রাহ্মণ আসতেন জ্ঞানলাভের জন্য। ব্রাহ্মণ আরুণি ও তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু রাজা প্রবাহণ জৈবলির কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য গিয়েছিলেন। এ ছাড়া, অশ্বপতি কৈকেয় ও অজাতশত্রুকেও বহু ব্রাহ্মণ আচার্যরূপে বরণ করেছেন। ধর্মসূত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অব্রাহ্মণ-গুরুর কাছে শিক্ষা নেবার সময় ব্রাহ্মণকেও সর্বভাবে গুরুর সেবা করতে হবে।

রামায়ণ ও মহাভারতে দেখা যায় ক্ষত্রিয় রাজকুমারেরা গুরুগৃহেই বেদ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গুরুর কাছে কৌলিক বিদ্যাও শিক্ষা নিচ্ছে। এজন্য ব্রাহ্মণদেরও ব্যবহারিক বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়েছে। বিশেষ ক'রে তক্ষশীলার ব্রাহ্মণদের অব্রাহ্মণীয় বিদ্যায় পরিদর্শিতার খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ক্ষত্রিয় সমাজ ধীরে ধীরে বেদশিক্ষা পরিহার করতে থাকে। সামান্য কয়েকটি বৈদিক শ্লোকের মধ্যেই তাদের বৈদিক বিদ্যা সীমায়িত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় বেদশিক্ষার অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়।

ক্ষত্রিয়কে প্রধানতঃ তার জাতিগত বৃত্তি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় কালক্ষেপ করতে হত। রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিক (চতুরঙ্গ) এই চারভাগে সৈন্যদল বিভক্ত ছিল। তরবারি, তীর-ধনু, গদা, ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষার বিধান ছিল। অস্ত্রবিদ্যা ছাড়াও সমর পরিচালনার কৌশলও শিখতে হত। সেনাপতিদের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহরচনা কৌশল শিখতে হত।

রাজ্যশাসন-কার্যে যোগ্যতা অর্জনের জন্য রাজপুত্রদের সমরকৌশল ও অস্ত্রবিদ্যা ছাড়াও রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্পর্কীয় বহু কিছু বিষয় জানতে হত। কল্প-শাস্ত্র (বেদাঙ্গ) থেকে জানা যায় নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বার্তা (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য), দণ্ডনীতি (রাজ্যশাসন ও শত্রুদমন), সংগীত, কাব্য-লেখন, প্রভৃতি রাজকীয় বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, রাজাকে বেদ, অন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ও বার্তা এই চারটি বিদ্যার দক্ষতা লাভ করতে হবে। মনু গীত, বাদ্য, নৃত্য রাজপুত্রদের শিক্ষণীয় বলে মনে করেন। কৌটিল্যের মতে তিন বেদ, অন্বীক্ষিকী (দর্শন ও ন্যায়), বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চারটি বিদ্যা রাজপুত্রদের শেখা উচিত। ব্রাহ্মণ আচার্যের কাছ থেকে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীর কাছ থেকে বার্তা ও দণ্ডনীতি সম্পর্কীয় শিক্ষার কথা কৌটিল্য বলেছেন। রাজ্যপরিচালনায় বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা ক'রেই কৌটিল্য বার্তা ও দণ্ডনীতি সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

গল্পচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা অতি প্রাচীন প্রথা। শিক্ষাবিদ্ রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এ ছাড়া, হিতোপদেশ ও বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে দেখা যায় শুধুমাত্র রাজপুত্র নয়, নীতিহীন রাজাদের শিক্ষার জন্যও গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। পদ্ধতির দিক থেকে বিচার করলে এর অভিনবত্ব প্রশংসনীয়।

॥ বৈশ্য ॥

ক্ষত্রিয়দের মত বৈশ্যদেরও বেদে অধিকার ছিল। উপনয়নের পর বৈশ্যসন্তান গুরুগৃহে বেদ শিক্ষার জন্য যেত। পরে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৈশ্যদেরও বেদশিক্ষা নিষিদ্ধ হয়। কৃষি ও বাণিজ্য ছিল বৈশ্যদের প্রধান কৌলিক বৃত্তি। বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে বৈশ্য সমাজে বহু শাখার সৃষ্টি হয়। বৈশ্যকে শস্য বপন, জমির গুণাগুণ নির্ণয়, পশুপালন, বিভিন্ন প্রকার ওজন, ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম, দ্রব্য সংরক্ষণের উপায়, বিভিন্ন প্রকার রত্নের মূল্য নির্ধারণ, কার্পাস বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির গুণ ও মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি তাদের শিখতে হত। যেহেতু বৈশ্যসমাজকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের লোকের সংস্পর্শে আসতে হত, এজন্য বিভিন্ন দেশের ভাষা, মুদ্রামূল্য ও ভৌগোলিক অবস্থান জানতে হত। মনু বলেছেন, বাণিজ্যের প্রয়োজনে বৈশ্যকে বিভিন্ন দেশের ভাষা, বিভিন্ন রত্ন, ধাতু, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির উত্তম, অধম ও মধ্যম ভেদে মূল্য নির্ণয়, কোন্ জমিতে কিভাবে বীজ বপন করলে ভাল শস্য হতে পারে, কোন্ কোন্

বস্তুর বিদেশে চাহিদা আছে, কোন্ জিনিস কতদিন সংরক্ষণ ক'রে রাখা যায়, কোন্ দ্রব্যে কি মেশানো যেতে পারে, কোন্ ভৃত্যের কত বেতন হতে পারে প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

বৈশ্যদের মধ্যে পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পিতার নিকট পুত্র প্রথম কৌলিক বৃত্তিতে দীক্ষিত হত। এছাড়া, এদের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও ছিল। উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা তক্ষশীলায় যেত। জাতিগতভাবে শিক্ষালাভের ফলে পুরুষানুক্রমে পিতার নৈপুণ্য পুত্রের মধ্যে বর্তিত হত এবং শিল্পেরও উৎকর্ষ সাধন হত।

প্রাচীন ভারতে বৃত্তি-জীবিগণ একত্রিত হয়ে সঙ্ঘের (Guild) প্রতিষ্ঠা করতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয় সমাজে এই সঙ্ঘের ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। সাধারণ ক্ষত্রিয় সন্তানের শিক্ষার জন্য "আয়ুধজীবী" সঙ্ঘ ছিল। বৈশ্য সমাজেও বৈশ্য সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব এই সঙ্ঘগুলি গ্রহণ করত। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপর সঙ্ঘগুলির বিশেষ প্রভাব ছিল। সমাজের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন, প্রয়োজন হলে সঙ্ঘ-সদস্যের শাসন, জরিমানা প্রভৃতি এই সঙ্ঘগুলি করত। বৈশ্য সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত ছিল—সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতি সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। কুমোর, কামার, স্বর্ণকার, ছুতার, ধোপা, নাপিত, ঋভু (রথ-নির্মাতা) প্রত্যেকেই সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। ঋগ্বেদের সময় থেকেই এই সব শিল্পী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে কলা-বিদ্যা শেখানো হত। এক বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যা অন্য সম্প্রদায় শিখত না। তবে অনন্যসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পারলে অন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীকে নিজ সম্প্রদায়ে গ্রহণে কোন আপত্তি করত না।

বৈশ্যদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে প্রাচীনকালেই চিকিৎসা-বিদ্যা উন্নতি লাভ করেছিল। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র উপবেদ বলে গণ্য হত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কণিষ্কের চিকিৎসক বা রাজবৈদ্য চরকসংহিতা রচনা করেন। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম প্রণেতা সুশ্রুতের আবির্ভাব হয়। বৈশ্যগণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ও চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র আরব ও ইউরোপ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মনুষ্যচিকিৎসা ছাড়া পশুচিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। অশ্ব, হস্তী, গবাদি পশুর উন্নত চিকিৎসা-ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। মহাভারতে গজসূত্র ও অশ্বসূত্রের উল্লেখ আছে। নকুল পশুচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বলে জানা যায়। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্বেদ খ্রীষ্টপূর্বকালের রচনা। তক্ষশীলায় বেদ-বেদাঙ্গ ছাড়াও ১৮টি 'সিপ্প' (শিল্প) শেখানো হত। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তক্ষশীলায়। যেমন, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামরিক বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, কৃষি-বাণিজ্য, হিসাব সংরক্ষণ, রথচালনা, প্রতিমা নির্মাণ, সর্পবিদ্যা, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা তক্ষশীলায় ছিল।

শূদ্রের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য যুগে দেখি না। শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার

ছিল না। সমাজে তিন উচ্চবর্ণের জন্য শিক্ষার আয়োজন ছিল। শূদ্র ছিল শিক্ষার দরবারে অপাংক্তেয়। দৈহিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ শূদ্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কাজেও তাদের নিয়োগ করা হত। এছাড়া, দেবযান বিদ্যা শূদ্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলে জানা যায়। বেদে শূদ্রকের অধিকার না থাকলেও পুরাণে অধিকার ছিল। মহাত্মা বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভজাত। বেদজ্ঞ সত্যকামও দাসী-গর্ভজাত ছিল।

॥ শিক্ষাপদ্ধতি ॥

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু কখনও ব্যক্তিগতভাবে কখনও সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা ছিল মৌখিক, গুরুর মুখে থেকে শুনে শিক্ষার্থীকে রোজকার পাঠ মুখস্থ করতে হত। পড়ুয়াদের পাঠ সম্পর্কে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, বর্ষাকালে ভেকেরা যেমন একে অপরকে অনুসরণ ক'রে সমস্বরে চিৎকার করে, তেমনি ছাত্রবাও গুরুর সঙ্গে এক স্বরে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করত। এভাবে মুখস্থ কবা হলেও, না-বুঝে মুখস্থ করা ছিল নিন্দনীয়। নিরুক্তে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি না বুঝে বেদমন্ত্র মুখস্থ করে, সে গাছ ও যষ্টির মত ভারবাহী মাত্র। যে তা বোঝে, সে সমস্ত সুখেব অধিকারী হয়। বেদ-অধ্যয়নের নিয়ম সম্পর্কে ম্যাক্সমূলাব বলেছেন, গুরু সাধারণতঃ পূর্ব দিকে বা উত্তর বা উত্তর-পূর্ব কোণে বসতেন। শিষ্যেরা আচার্যেব পদবন্দনা ক'বে পড়তে বসত। গুরু দু'টি কি একটি শব্দ উচ্চারণ করতেন, ছাত্রেরা শিক্ষকের আবৃত্তিব পব সমস্বরে আবৃত্তি করত। আবৃত্তিব সঙ্গে ব্যাখ্যার ব্যবস্থাও ছিল। এইভাবে একটি প্রশ্ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত পড়া চলত। এক-একটি প্রশ্ন তিনটি কি বড় শ্লোক হলে দু'টি শ্লোকে শেষ হত। একটি প্রশ্নের আলোচনা শেষ হলে সবাইকে আবাব তা আবৃত্তি করতে হত। প্রতিটি শব্দেব উচ্চাবণ-শুদ্ধিব উপর বিশেষ জোব দেওয়া হত। মুখস্থ করা ছাড়াও গুরু যখনই প্রয়োজন হত প্রতিটি শ্লোকেব বিশদ ব্যাখ্যা করতেন। বিশেষ ক'বে সূত্র-সাহিত্য এত সংক্ষিপ্তভাবে রচিত ছিল, ব্যাখ্যা ভিন্ন তা সহজভাবে বোধগম্য হত না। এসব ক্ষেত্রে গুরুর সাহায্য ছিল অপরিহার্য।

সে যুগের পাঠপদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি স্তরভেদ পাওয়া যায়—উপক্রম (প্রস্তুতি), শ্রবণ, আবৃত্তি, অর্থবাদ, ফল, উপপত্তি। ছাত্রদের গুরুর কাছ থেকে জানবার আগ্রহ থেকে উপক্রম বা পাঠপ্রস্তুতিপর্বেব সূচনা হত। শ্রবণ: গুরু যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। আবৃত্তি: গুরুব কাছ থেকে শুনে তা বারবার আবৃত্তি বা অভ্যাস ক'রে আয়ত্ত করা। অর্থবাদ: যা শেখানো হল তার অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হওয়া। এরপর আলোচনা ক'রে যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় ক'রে তার প্রয়োগ করা হত। মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করত। গভীরভাবে চিন্তা করাকে বলা হত 'মনন'। নিদিধ্যাসনের অর্থ হচ্ছে একাগ্রচিত্তে ধ্যান ক'রে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে মেধা ও স্মৃতি শক্তির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রশ্নিণ—

অর্থাৎ যে প্রশ্ন করত, অভিপ্রশ্নিন—প্রশ্নের পরিপূরক, প্রশ্ন-বিচারক ও উত্তরদাতা, এই তিনজনের মাধ্যমে পাঠ চলত।

গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতিও ছিল। পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ ছাড়াও বহু উপনিষদে দেখা যায় ধর্মের গূঢ় তত্ত্বকে প্রাঞ্জল করবার জন্য গল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। জটিল ও নীরস বিষয়কে সহজ ও সরস ক'রে তোলবার জন্য এ পদ্ধতির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য।

ছাত্রকে বিদ্যা অর্জন করতে হলে চারটি পদ পূরণ করতে হত। একটি পদ গুরুর নিকট থেকে পূরণ করা হত। একটি সতীর্থ বা সহপাঠীদের সমবেত চেষ্টায় পূরণ হত। তৃতীয় পদটি শিক্ষার্থীর একক চেষ্টায় পূর্ণ হত। এই তিন পদপূরণের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতায় ছাত্রের জীবনে জ্ঞানের যে আলো উদ্ভাসিত হত, তার ফলে চতুর্থ পদ পূরণে আর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হত না।

মনু থেকে জানা যায়, আচার্য-পুত্র অধ্যাপনায় পিতাকে সাহায্য করতেন। পরবর্তী কালে অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীরা নবাগতদের শিক্ষায় সাহায্য করত। এই 'সমাদিষ্ট' বা পড়ুয়াশিক্ষক আচার্যের আদেশেই পাঠ দিতেন। তাই তাকে গুরুর মতই সম্মান দিতে হত। এই প্রথাই পরবর্তী যুগে সর্দার পোড়ো প্রথা (Monitorial system) রূপে দেখা দেয়।

॥ পরীক্ষা ॥

পরীক্ষাব ব্যবস্থা প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছিল না। কিন্তু সংবাদাভিজয় অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায় বিতর্ক, আলোচনা-সভা বা বিদ্বৎ-সম্মেলন এসবের ব্যবস্থা ছিল। এই বিতর্ক-সভাব মধ্য দিয়েই পণ্ডিতদের বিদ্যাব পরীক্ষা হত। বিতর্ক খুব প্রতিযোগিতামূলক হত। এসব শোনবার জন্য যথেষ্ট লোকসমাগম হত। জনক সভায় বিতর্কের কথা সর্বজনবিদিত। বৈদিক গ্রন্থে এই বিতর্ককে বলা হয় ব্রহ্মোদয়। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যাবিবাদ বা বিদ্যাবিচার বলা হয়েছে। বিচারকের সামনে প্রশ্নোত্তবের মাধ্যমে বিচার হত। যে প্রশ্ন করত তাকে প্রশ্নিন, যে প্রতিরোধ করত তাকে অভিপ্রশ্নিন বলা হত। অনেকে মনে করেন, বাকোবাক্যম্ বলতে এরূপ বিতর্ককেই বোঝানো হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভব এই বিতর্কের মধ্যেই হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। তপোবন, রাজসভা, যজ্ঞক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে এসব বিতর্ক বা আলোচনা-সভাব অনুষ্ঠান হত। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, জনক তাঁর সভায় প্রায়ই বিদ্যা-বিচারের আয়োজন করতেন। প্রতিপক্ষের প্রতি স্বর্ণমুদ্রা নিক্ষেপ ক'রে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করার প্রথা শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায়।

॥ সমাবর্তন ॥

সমাবর্তন উৎসবের মধ্য দিয়ে গুরুগৃহে বাসের সমাপ্তিপর্ব সূচিত হ'ত। পাঠ শেষ ক'রে বিদ্যার্থী তার সাধ্যমত গুরুদক্ষিণা দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান ক'রে, গুরুর অনুমতি নিয়ে 'স্নাতক' গৃহে ফিরে আসতেন। বিদ্যার্থী শিক্ষাশেষে আনুষ্ঠানিক স্নান শেষ ক'রে

স্নাতক উপাধিধারী হ'তেন। উপনয়নের মধ্য দিয়ে যে জীবনের শুরু হ'ত, সমাবর্তনের বিশেষ স্নান ক'রে এবং দণ্ড, মেখলা ও অজিন (মৃগচর্ম) ত্যাগ ক'রে সে জীবনের শেষ হ'ত। স্নাতক তিন রকমের হ'ত। বিদ্যা-স্নাতক—যে বেদ অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু সমস্ত ব্রত পালন করে নি। ব্রত-স্নাতক—যে সমস্ত ব্রত পালন করেছে, কিন্তু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে নি। বিদ্যাব্রত-স্নাতক—যে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন ও ব্রত পালন করেছে। আনুষ্ঠানিক স্নান শেষ হবার পর থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত বিদ্যার্থীকে স্নাতক বলা হ'ত। সমাবর্তন উৎসব বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হ'ত। স্নান ক'রে, নতুন কাপড় পরে, গলায় মালা ঝুলিয়ে, রথে বা হাতীতে চড়ে বিদ্যার্থী বিদ্বৎ-সমাবেশে উপস্থিত হ'ত। পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে গুরু তাকে 'স্নাতক' বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এখানে স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়েই তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিসমাপ্তি হ'ত।

শিক্ষাশেষে সমাবর্তন উৎসবে ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথেয়রূপে যে উপদেশ গুরু শিষ্যকে দিতেন, তা সর্বকালে সর্বদেশে শ্রেষ্ঠ আচরণীয় ধর্ম বলে বিবেচিত হবে। এখানে তার অংশবিশেষ দেওয়া হ'ল। তা থেকেই বোঝা যাবে গার্হস্থ্য জীবনে কি মহান আদর্শকে সামনে রেখে হিন্দুজীবন শুরু হ'ত :—

"সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ"।

সত্য কথা বলবে। ন্যায় আচরণ করবে। বিদ্যাচর্চার পথ বর্জন ক'র না।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।

সত্য হতে বিচ্যুত হয়ো না। ন্যায় আচরণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। সৎ ভিন্ন অন্য পথে যেও না।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব।

মাতা, পিতা ও গুরুকে দেবতা জ্ঞান করবে।

যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি॥

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি॥

সৎ কর্ম করবে, যা ঘৃণ্য সে কাজ করবে না। আমাদের যা ভাল অনুকরণ করবে, মন্দগুলি নয়।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

শ্রদ্ধার সংগে দান করবে। অশ্রদ্ধার সংগে দান করবে না। শক্তি অনুসারে দান করবে। লজ্জার সংগে দান করবে। ভয়ের সংগে দান করবে। মিত্রাদি কার্যের জন্য দান করবে।

অশ্মা ভব। পরশুর্ভব। হিরণ্যমস্তৃতং ভব।

পর্বতের মত অচঞ্চল হও। কুঠারের মত তীক্ষ্ণধার হও। স্বর্ণের মত মূল্যবান হও।

শিবো ভূঃ সখা চ শূর সবিতা চ নৃণাম্।

সবগুণান্বিত হও। মানুষের বন্ধু ও রক্ষক হও।

শতং শরদ আয়ুষো জীব সৌম্য। হে সৌম্য, তোমরা শতজীবী হও।

"তোমার কর্তব্য বা তোমার আচরণ সম্পর্কে যদি তোমার মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তাহলে সুবিবেচক ও সদাচারী ব্রাহ্মণেরা যেরূপ করেছেন সেরূপ আচরণ করবে। যাদের সম্পর্কে প্রতিকূল বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারেও সুবিচারক জ্ঞানী ব্রাহ্মণের ন্যায় (আচরণ) করবে।'

॥ নারী শিক্ষা ॥

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় আদি যুগে নারীর স্থান খুব সম্মানের ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় সমাজেই শুধু তার ব্যতিক্রম দেখি। বৈদিক যুগে সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। সে যুগে শিক্ষায় নারী-পুরুষে ভেদ ছিল না। নারীদের বেদে অধিকার ছিল ও তারা যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করত। পত্নীকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ সম্ভব ছিল না। যজ্ঞের (বিশেষ ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞে) কতকগুলি মন্ত্র স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যজ্ঞশালায় স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট আসন ছিল। মেয়েদের উপনয়ন হত, তারাও যজ্ঞোপবীত ধারণ করত। গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচর্য পালন করত। অথর্ববেদে মেয়েদের ব্রহ্মচর্যের বিধানপালন সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে। এমন কি, মনুতে মেয়েদের পালনীয় সংস্কার সমূহের মধ্যে উপনয়নের বিধান রয়েছে। বাণভট্টের কাদম্বরীতে আছে মহাশ্বেতার দেহ যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে পবিত্র হয়েছিল। বৈদিক সমাজে বাল্যবিবাহ ছিল না। মেয়েরা গুরুগৃহে থেকে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদ ইত্যাদি পড়ত। ভবভূতি উত্তররামচরিতে লিখেছেন, আত্রেয়ী বাল্মিকীর আশ্রমে লবকুশের সঙ্গে বেদান্ত পড়েছেন। অথর্ববেদে বলা হয়েছে, ছাত্রজীবন (ব্রহ্মচর্যম্) শেষ না হলে কুমারীদের বিবাহে অধিকার ছিল না।

নারীরা শুধু শিক্ষা গ্রহণ করতেন না, তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টাও ছিলেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টাদের মধ্যে কুড়িজন বিদুষী মহিলার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—বিশ্ববরা, ঘোষা, রোমশ, লোপমুদ্রা, অপলা, উর্বশী, বাক্‌যমী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি বিদুষীরা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন বলে এদের মন্ত্রদৃক্ বা ঋত্বিকা বলা হয়েছে। যাঁরা মন্ত্রের পারদর্শিনী তাঁদের মন্ত্রবিদ্ বলা হত। রামায়ণে কৌশল্যা ও তারাকে মন্ত্রবিদ্ বলা হয়েছে। মহাভারতে দেখি কুন্তি অথর্ববেদে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। দ্রৌপদীকে মহাভারতে পণ্ডিতা বলা হয়েছে।

মেয়েরা শুধু বেদ অধ্যয়নই করতেন না, অনেক সময় ব্রহ্ম-সম্পর্কীয় গূঢ় আলোচনা ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন। জনকসভায় গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে ব্রহ্মসম্পর্কীয় বিতর্কের বিষয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যজ্ঞসভায় সমবেত ঋষিদের মুখপাত্ররূপে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যে বিতর্ক করেছিলেন, ঐ উপনিষদের দুটি অধ্যায়ে তার মনোজ্ঞ বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐ উপনিষদেই যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনা থেকে জানা যায় মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সুলভা রাজা জনককে যোগ, সমাধি ও মোক্ষ বিষয়ে শিক্ষা দেন। এরা সবাই ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। এ ছাড়া, কার্শকৃৎস্নী, প্রথিতেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন।

পাণিনি আচার্যা ও উপাধ্যায়া শব্দের দ্বারা উপাধ্যায়িনী, আচার্যানী অর্থাৎ আচার্যের স্ত্রী এহ্‌'টি শব্দের থেকে পৃথক্‌ ক'রে নারী অধ্যাপিকাকে বুঝিয়েছেন। পাতঞ্জলি যৌদমেধী শব্দ অধ্যাপিকা ও যৌদমেধা শব্দ ছাত্রী অর্থে ব্যবহার করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন যুগে মেয়েদের শুধু উপনয়ন ও সাবিত্রী মন্ত্রেই অধিকার ছিল না, তারা বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করতেন।

নৃত্য, গীত ও বাদ্যে বৈদিক যুগে নারীদের পারদর্শিতার কথা জানা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বার বার বলা হয়েছে সঙ্গীত ও নৃত্য নারীদের বিদ্যা, পুরুষের নহে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে উদ্গাতারা (অর্থাৎ সামবেদীয় পুরোহিতেরা) যখন সামমন্ত্র গান করেন, তখন তাঁরা তাঁদের স্ত্রীর কাজই করেন। অন্যান্য সংহিতা থেকে জানা যায়, প্রথম অবস্থায় পুরোহিতের স্ত্রীরা সামগীত গাইতেন, পরে স্বামীরা সে স্থান অধিকার করেন। (পত্নী কর্মৈব এতে অত্র কুর্বন্তি উদ্গাতারঃ)।

বয়ন, সূচীশিল্প ও অন্যান্য চারুশিল্পে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করত। সূচীশিল্পে মেয়েদের বিশেষ আসক্তির কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূচীশিল্পকে (Embroidery) বলা হত পেশ—স্ত্রী-সূচী-শিল্পীকে বলা হত পেশাস্বরী। মেয়েরা সুন্দর সুন্দর সূচের কাজ করা কাপড় পড়তে ভালবাসত। সাড়ীর দু'প্রান্ত ও মধ্যভাগ নক্সা করে পরত। বহু বর্ণের কাপড় মেয়েদের খুব পছন্দ ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় মেয়েরা উলের (ঊর্ণসূত্র) কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে মেয়েদের ৬৪ কলা শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাটক, কবিতা রচনা, পাশা খেলা, মাল্য রচনা, দেহচর্চা, প্রহেলিকা (ধাঁধা) প্রভৃতি এই তালিকাভুক্ত ছিল। অর্থশাস্ত্রে বারবণিতা, ক্রীতদাসী ও নটীদের নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বারস্ত্রীদের গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। বারনারীদের সংগৃহীত গুপ্ত সংবাদ মৌর্য রাজ্যের কাজে লাগানো হত।

মেয়েরা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত বলে বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে বিসপালা নামে এক নারীর কথা জানা যায়, যিনি যুদ্ধে যোগ দিয়ে আহত হন এবং তার জঙ্ঘা কেটে সেখানে লোহার জঙ্ঘা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাতঞ্জলি তার মহাভাষ্যে বর্শানিক্ষেপকারিণী শাক্তিকী নামে নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থানিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে যোদ্ধার বেশে সজ্জিতা বীর নারীদের দেখেছেন। নারীরা অন্তঃপুরে দেহরক্ষিণীর কাজ করত। যুদ্ধকালে নারীরা পথ্য ও পানীয় দিয়ে আর্তের সেবা করত।

বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। মেয়েদের সাধারণতঃ ১৬।১৭ বছর বয়সে বিয়ে হত। মেয়েদের নিজেদের বর বেছে নেবার অধিকার ছিল। স্বয়ংবর-প্রথা মহাভারতের যুগ পার হয়ে ঐতিহাসিক যুগেও বর্তমান ছিল। যাদের ১৬।১৭ বছর বয়সে বিয়ে হত, তাদের সদ্যোবধূ বলা হত। সদ্যোবধূরা কাজ চালানোর মত কিছু বৈদিক মন্ত্র শিখতেন। এছাড়া নৃত্যগীত প্রভৃতিও শিখতেন। ব্রহ্মবাদিনীরা বিদ্যা শেষ

ক'রে বিয়ে করতেন। কেউ কেউ অবিবাহিতই থেকে যেতেন, যেমন—কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী।

নারীরা অধ্যাপনা করতেন, এর বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাঁরা পুস্তকও রচনা করেছেন। মীমাংসার ন্যায় কঠিন শাস্ত্রেও মেয়েদের বিস্ময়কর পারদর্শিতার কথা জানা যায়। কাশকৃৎস্ন মীমাংসা শাস্ত্রের উপর একখানা বই লেখেন। পতঞ্জলি বলেছেন, কাশকৃৎস্নের মীমাংসাশাস্ত্র যিনি পড়েন, তাঁকে বলা হয় কাশকৃৎস্না। ব্রাহ্মণী আপিশলির ব্যাকরণ পাঠ করলে তাকে বলা হয় অপিসলা। আচার্যা ঔদমেঘ্যার শিষ্যদের বলা হত ঔদমেঘা।

বৈদিক সমাজে নারীর যে সম্মানের আসন ছিল, উপনিষদ ও মহাকাব্যের যুগেও তারা সে আসন থেকে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু স্মৃতির যুগে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নারীকে বাদ দেওয়া হতে থাকে। উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার পর ও বাল্য বিবাহ প্রবর্তিত হলে নারী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মনুসংহিতার যুগ থেকেই দেখা যায়, নারী আপন গৌরবের আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে সর্ব ব্যাপারে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে সন্তানের অধীনে থাকবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয় (পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, রক্ষন্তি বার্ধক্যে পুত্রা, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি)। মনু আরও বলেছেন, মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে বেদ-অধ্যয়নের সমান, স্বামীর সেবা আর আশ্রমে পাঠ করা এক এবং গৃহকার্য করা মানেই হচ্ছে সন্ধ্যাবন্দনা করা। মনু ১২ বছরে বিয়ে সমর্থন ক'রে পরে নয় ' বছরের মধ্যে বিয়ে দেবার কথা বলেছেন। উপনয়ন-প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিবাহ-অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠানে মেয়েরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করবে না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক যুগে আমরা বহু বিদুষী নারীর সন্ধান পেলেও দেখা যায় সেই যুগেও তাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। ঋগ্বেদে এক জায়গায় আছে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বৃথা; তাদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের মত। আর এক জায়গায় ইন্দ্র বলেছেন, নারীর কর্তব্য মনে সংযম নেই, তার বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি অতি অল্প। স্মৃতিতে বলা হয়েছে, আগুন আর ঘিয়ের মত অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের সান্নিধ্য বাঁচিয়ে চলতে হবে। নারীর সম্পর্কে মনু বলেছেন বাল্যে নারী মায়ের তত্ত্বাবধানে ও বিয়ের পর শাশুড়ীর অধীনে গৃহকর্মে নিয়োজিত হবে। স্বামীর অর্থসংগ্রহ ও ব্যয়ের ভার নারীর উপর দেওয়ার নির্দেশ দেখে মনে হতে পারে এজন্য বুঝি তাদের অঙ্ক শেখানো হত—হিসেব তারা রাখত কিন্তু এজন্য অঙ্ক শেখবার প্রয়োজন হত না। লেখাপড়া বা অঙ্ক না শিখেও তারা তাদের ঘর-গৃহস্থালীর কাজ ও সংসারের প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ রাখতে পারত। বাল্য বিবাহের প্রচলন হওয়ায় মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া শিখবার সুযোগ খুব কমই ছিল, কিন্তু ভারতীয় স্ত্রীসমাজ লেখাপড়া না শিখেও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাকে সমাজের বুকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের প্রভাব যে ভারতীয় সমাজে এত বেশী পরিলক্ষিত হয়, তার একটা কারণ

নারী-সমাজ। যুগ যুগ ধরে এরাই পৌরাণিক কাহিনী মুখে শুনেই প্রাচীন যুগের সামাজিক আদর্শকে পারিবারিক জীবনে অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছে—এজন্য তাদের লেখাপড়া শেখবার কোন প্রয়োজন হয় নি।

সাধারণ ভাবে নারী-সমাজ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেও ধনী ও অভিজাত পরিবারের মেয়েদের জন্য পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বেদ শিক্ষা দেওয়া না-হলেও সাহিত্য অনুশীলনে অভিজাত পরিবারের মেয়েদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। চারুশিল্প, গৃহসজ্জা, নৃত্য, গীত, মাল্যবচনা প্রভৃতি ৬৪টি কলা মেয়েদের শেখাব কথা বাৎস্যায়ন বলেছেন। এসব শিল্পে মেয়েদের পারদর্শিতার কথা আঞ্চলিক সাহিত্যে ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে বিদুষী নারীরা বৈদিক মন্ত্র রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মধ্যযুগে সাধারণ নারী সমাজ থেকে বঞ্চিত হবার পরও বহু নারী কাব্য রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন কবেছেন। হালের গাথাসপ্তশতীতে সাতজন মহিলা কবিব কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। আঞ্চলিক সাহিত্যও বহু মহিলা কবির দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। শুধু সাহিত্য কি কাব্যে নয়, দর্শনেও তাঁদের ব্যুৎপত্তি ছিল বলে জানা যায়। শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রেব মধ্যে তর্কযুদ্ধে বিচারক ছিলেন মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক যেখানে বিচারপ্রার্থী, সেখানে বিচাবক একজন নাবী—তাঁব পাণ্ডিত্য নিশ্চয়ই খুব সাধাবণ ছিল না। হিন্দু যুগের অবসানেব পব সমাজে নারীব অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। মুসলিম যুগে বাজনৈতিক কারণে হিন্দু সমাজে যে বিপর্যয় দেখা দেয়, তার প্রতিক্রিয়ায অন্তঃপুবের অবরোধে ভারতীয় নারী-সমাজ শিক্ষা থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাকাব্যে শিক্ষা

(Education in the Epics)

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এপিক বা মহাকাব্যের যুগ বলে কোন যুগ-বিভাগ নেই। রামায়ণ ও মহাভারত এই দু'খানি মহাকাব্য থেকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে আমরা মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। এই দু'খানি মহাকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম, কিন্তু এই মহাকাব্যদ্বয়ের তথ্যের সময়-সীমা অত্যন্ত ব্যাপক। মহাকাব্য দু-খানি একদিনে লিখিত হয় নি। এর সময় নিয়ে বহু মতভেদ আছে। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে এর শুরু হলেও সমাপ্তিকাল গুপ্ত যুগ বলে অনেকে নির্দেশ করেন। আমরা তাই যুগ-বিভাগ না ক'রে রামায়ণ ও মহাভারতে শিক্ষা-সম্পর্কীয় যে তথ্য পাওয়া যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করব। মহাকাব্যে যে শিক্ষা-তথ্য ছড়ানো রয়েছে তাকে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা বললে ভুল হবে না, করণ দু'টি মহাকাব্যের রচনাকাল এ দু'যুগেই বিস্তৃত। ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যসমূহই মহাকাব্যের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিস্ফুট।

মহাভারত ও রামায়ণে রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্য যে পরিমাণে আছে, সে তুলনায় শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য অতি সামান্যই আছে। দু'খানি মহাকাব্যই ঘটনাবহুল—কর্মের ক্ষেত্রেই এর বিস্তৃতি, জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়। দেশের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল আর্য-ঋষিদের তপোবনসমূহ। রাজা রাজচক্রবর্তীদের জীবনের কাহিনী বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক-ভাবে যেখানে তপোবনের কথা বা তপোবনের শিক্ষার কথা এসেছে, সেখানেই শিক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে। মহাকাব্যে কর্মকাণ্ডই প্রধান, জ্ঞানকাণ্ড গৌণ। মহাকাব্য থেকে আশ্রম ও আশ্রমিকদের জীবন, শিক্ষার্থীদের জীবন, কিছু আদর্শ শিক্ষার্থীদের কাহিনী, প্রাচীন যুগের তপোবনস্থ কয়েকটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের কথা ও রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয়দের শিক্ষার কথা জানতে পারি।

চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্যাশ্রম, এটাকে বলা হয়েছে জীবনের প্রস্তুতিকাল। এই প্রস্তুতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে। সবার জন্য এই প্রস্তুতি একই রকম ছিল না! জীবনের লক্ষ্যভেদে ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষাও ভিন্নরূপ হ'ত। যেমন, ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি যেভাবে হবে, ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি সেরূপ হবে না। যে যেরূপ বৃত্তি গ্রহণ করবে, শিক্ষা সেরূপই হবে। মহাকাব্যে বিভিন্ন বর্ণের জন্য যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, একদিক্ থেকে বিচার করলে তাকে বৃত্তি-শিক্ষাই বলা সঙ্গত। মহাভারতে বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করবে ও সংযম পালন করবে। ব্রাহ্মণের জীবনের প্রধান কর্তব্য অধ্যয়নে রত থাকা। ব্রাহ্মণ জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, তাই সেভাবেই তাকে প্রস্তুত হতে হবে। ক্ষত্রিয় শুধু দান করবে, গ্রহণ করবে না,

যজ্ঞ করবে, কিন্তু পৌরোহিত্য করবে না। বেদ পাঠ করবে, কিন্তু শিক্ষা দেবে না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য। তার প্রস্তুতিও সেইভাবেই হবে। বৈশ্য বেদ পাঠ করবে, যজ্ঞ করবে, দান করবে ও সৎপথে থেকে ধন উপার্জন করবে। তিনটি বর্ণের (যাঁরা দ্বিজ) শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। তবে জ্ঞান বা বিদ্যাচর্চা সবার জন্য এক ছিল না। ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল রাজনীতি, বৈশ্যের জন্য ব্যবসা।

মহাভারতে বলা হয়েছে, পিতামাতার থেকে আমরা দেহটি পেয়েছি, গুরুর কাছ থেকে যা পেয়েছি তা পবিত্র, ধ্বংসহীন, অমর। প্রতিদিন গুরুকে প্রণাম ক'রে পবিত্র মনে শিক্ষার্থী পাঠে রত হবে। গুরুর গৃহে নানাবিধ কাজে কখনও বিরক্ত বা রাগান্বিত হবে না। জীবিকার জন্য শিক্ষার্থী গুরুর উপর নির্ভরশীল না হয়ে ভিক্ষা ক'রে জ্ঞান অর্জন করবে, এটা তার প্রথম কর্তব্য, দ্বিতীয় কর্তব্য, শিক্ষার্থী সর্ব প্রযত্নে গুরুর ইচ্ছা পূরণ করবে। এজন্য যদি জীবন বিপন্ন হয় তাহলেও পশ্চাৎপদ হব না। তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, গুরু যে শিক্ষা দিলেন তার গুরুত্ব উপলব্ধি, গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থী যে উপকৃত হ'ল সেই বোধ। চতুর্থ, দক্ষিণা না দিয়ে গুরুগৃহ পরিত্যাগ না করা।

শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম ছিল। যে দীক্ষা গ্রহণ করেনি, যার মন অপবিত্র, যে ধর্মীয় নিয়ম পালন ক'রে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নি, তাকে বেদ শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। যার চরিত্র সম্পর্কে জানা নেই, তাকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। একটি নির্দেশ থেকে জানা যায় চারি বর্ণের লোকের বৈদিক আলোচনা ও বেদ আবৃত্তি শোনাবার অধিকার ছিল। একটি শিক্ষানীতি থেকে জানা যায়, শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়া হবে (*"One's knowledge is always proportionate to his understanding and dilligence in study."*)।

শিক্ষার্থীর নানাবিধ করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে মহাকাব্য থেকে জানা যায়ঃ—

গুরুগৃহে বাসকালে গুরু শয্যা ত্যাগ করবার পূর্বে শিষ্য শয্যা ত্যাগ করবে ও গুরু শয়ন করবার পর শয়ন করবে। গুরুগৃহে সাধারণ কাজসমূহ করবে, সবকাজ শেষ ক'রে গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ করবে। গুরু আসন গ্রহণ করবার পূর্বে আসন গ্রহণ করবে না। গুরুর আহারের পূর্বে আহার করবে না। গুরুগৃহে কখনও কু-বাক্য বলবে না। জীবনের এক-চতুর্থাংশ কঠোর সংযমের মধ্যে গুরুগৃহে বাস ক'রে বেদপাঠ সমাপ্ত ক'রে গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করবার জন্য সংসারে ফিরে আসবে।

মহাভারতে বহু আশ্রমের উল্লেখ আছে। সেখানে প্রখ্যাত আচার্যদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আসত। তপোবনস্থ এই সব শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে শিক্ষার বিভাগ ছিল। যেমন—(১) অগ্নিস্থান—এখানে অগ্নির পূজা ও উপাসনা হ'ত; (২) ব্রহ্মাস্থান—বেদ বিভাগ; (৩) বিষ্ণুস্থান—এখানে রাজনীতি অর্থনীতি বা বার্তাশিক্ষা দেওয়া হ'ত; (৪) মহেন্দ্রস্থান—সামরিক বিভাগ (৫) সোমস্থান—উদ্ভিদ বিভাগ; (৬) গরুড়স্থান—পরিবহণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা

বিভাগ ; (৭) কার্তিকেয়স্থান—সৈন্য পরিচালনা, বৃহগঠন সংক্রান্ত বিভাগ ; (৮) জ্যোতিবিজ্ঞান বিভাগ।

প্রাচীন খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহেব মধ্যে নৈমিষারণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে কুলপতি ছিলেন শৌনক। দশ হাজার শিষ্যের গুরুকে কুলপতি আখ্যা দেওয়া হ'ত। মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রমে বহু দূব দেশ থেকে শিক্ষার্থীদেব সমাবেশ হ'ত। এখানে বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাভাবতে আছে, "কোনস্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ যজ্ঞকার্যে উদাত্তাদিস্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন, কোন স্থানে চতুর্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, স্থানান্তরে যত আ, জিতেন্দ্রিয়, অথর্ববেদবেত্তা ও সামগাতাসকল পদক্রমাদি সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন। কোথাও শব্দসংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগণ দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক সদৃশ্য আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন, কোন স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানক্রম, পুবাণ, নায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক, শব্দশাস্ত্র, ছন্দ, নিরুক্ত ও বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী, বিশেষ কার্যজ্ঞ, মোক্ষধর্মপরায়ণ, উহাপোহ (তর্করহিত) সিদ্ধান্তকুশল, দ্রব্য-কর্মের গুণজ্ঞ, কার্যকাবণবেত্তা, পক্ষী ও বানর প্রভৃতি জীবগণের বাক্যার্থবোদ্ধা, মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্রেব বিচার করিতেছেন এবং বৌদ্ধমতালম্বী লোকেরা নিজ ধর্মের আলোচনা করিতেছেন।" ব্যাসদেবেব আশ্রম আব একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। ব্যাসদেব তাঁর শিষ্যদের বেদ শিক্ষা দিতেন। সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের আশ্রমেও বহু শিষ্যের সমাবেশ হ'ত। কুরুক্ষেত্রেব নিকটে একটি আশ্রমে এক তপস্বিনী ছিলেন যাঁবা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মহাকাব্যে উল্লিখিত আশ্রমেব মধ্যে প্রয়াগের ভরদ্বাজ আশ্রমকে সর্ববৃহৎ আশ্রম বলা হয়।

মহাকাব্যে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তাই মহাকাব্য থেকে ক্ষত্রিয়দেব শিক্ষা সম্পর্কেই জানতে পাবি। তিনটি দ্বিজ বর্ণকেই জীবনেব শুরুতেই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যার্জন করতে হ'ত। পাঠক্রম কিন্তু অভিন্ন হ'ত না। বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ হ'ত, পাঠক্রম তাই ভিন্নরূপ হ'ত। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিল না, একথা বলা যায় না। ক্ষত্রিয় সন্তানকে বেদ-পাঠ করতে হ'ত, কিন্তু সবাইকে সমানভাবে বেদ অভ্যাস করতে হ'ত না। যে ক্ষত্রিয়-সন্তান রাজা হবে, তাকেই বেদ মুখস্থ করতে হ'ত। পাণ্ডবরা সমগ্র বেদ পাঠ করেছিল বলে জানা যায়। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের শিক্ষার ভার স্বয়ং ভীষ্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের সর্ববিধ শাস্ত্রে পারদর্শী করেছিলেন। কুরু ও পাণ্ডবদের শিক্ষার ভার ভীষ্ম-দ্রোণের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি সর্ববেদে পারদর্শী হলেও তাঁর শিষ্যদের প্রধানতঃ ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

রামায়ণ থেকে জানা যায় রাজকুমারদের বেদ, ধনুর্বেদ, নীতিসার, রথ-চালনা, হস্তী-চালনা প্রভৃতি শিখতে হ'ত। এ ছাড়া লেখা, চিত্রবিদ্যা, সন্তরণ, লম্ফন, গন্ধর্ববিদ্যা (নৃত্য, গীত ইত্যাদি) প্রভৃতি বিষয়ও জানতে হ'ত।

মহাভারতের একটি তালিকা থেকে জানা যায় ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের শব্দশাস্ত্র,

চৌষট্টিকলা ও যুক্তিশাস্ত্র শিখতে হ'ত। ক্ষত্রিয়দের প্রধানতঃ ধনুর্বেদে পারদর্শী হতে হ'ত। ধনুর্বেদ বলতে সমগ্র সামরিক বিষয়ই বুঝানো হ'ত—শরচালনা, রথচালনা, অসিচালনা, গদাযুদ্ধ, ব্যূহরচনা, সৈন্যপরিচালনা সব কিছু এর মধ্যে ছিল।

॥ নারী শিক্ষা ॥

রামায়ণে নারী তপস্বিনীর উল্লেখ আছে। এঁদের ভিক্ষুণী বলা হ'ত। শবরীর নাম রামায়ণে বিখ্যাত। পম্পা নদীর তীরে তাঁর আশ্রম ছিল। তিনি গুরু মাতঙ্গের শিষ্যা। শবরী নামে তাঁকে শবরজাতীয়া বলে মনে হলেও এটা তাঁর নাম, তিনি শবর ছিলেন না। মহাভারতেও ব্রহ্মচারিণীদের উল্লেখ আছে। শাণ্ডিল্য ঋষির কন্যা ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। গার্গী ব্রহ্মবাদিনী বলে খ্যাতিলাভ করিেছিলেন। জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তাঁর বিচারের কথা জানা যায়। ভিক্ষুণী সুলভার সঙ্গে রাজর্ষি জনককে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

মহাকাব্যে বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে, তা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়, বিশেষ ক'রে ক্ষত্রিয়কুমারদের শিক্ষা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে যে বৈশিষ্ট্য-গুলি লক্ষ্য করা যায়, তা ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যরূপেই প্রতিভাত হয়। চতুরাশ্রম, উপনয়ন সংস্কার, গুরুবরণ, আচার্য-শিষ্য সম্পর্ক, আশ্রমের শিক্ষা, বর্ণভেদে পাঠক্রম ভেদ, গুরুদক্ষিণা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্যদ্বয় বৈদিক যুগে শুরু হয়ে পৌরাণিক যুগে যদি সমাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মহাকাব্য থেকে আমরা যে শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য পাই, তা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপোষক হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৃত্তি শিক্ষা

হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষলাভ। হিন্দুজীবনের শিক্ষাদর্শ সত্যানুসন্ধান ও ও আত্মাব মুক্তির উপায় সন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনকে হিন্দুরা অস্বীকার করেনি। পবা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েও জীবনে অপরা বিদ্যা বা লৌকিক বিদ্যাব প্রয়োজন প্রাচীন হিন্দুসমাজ অনুভব করেছিল। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ কবলেই দেখতে পাওয়া যায় জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে মানুষের বৃত্তি দিয়েই সমাজে জাতিভেদ প্রথা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থায় যখন জীবনে খুব বেশী জটিলতাব সৃষ্টি হয়নি, সেই আদিযুগে বৃত্তি দিয়েই মানুষেব জাতি নির্ধাবিত হত। ক্রমে জন্মসূত্রে জাতিভেদ প্রথা গড়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, গুণ ও কর্মের দ্বাবা তিনিই চাবটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। এর পর সমাজে ব্যাপকভাবে শ্রমবিভাগ অনুসাবে বিভিন্ন সামাজিক বর্ণেব সৃষ্টি হয়। সমাজেব প্রয়োজন মেটাতে ও সমাজবক্ষাব প্রয়োজনে বিভিন্ন বর্ণেব জন্য কৌলিক বৃত্তি শিক্ষাব ব্যবস্থা বৈদিক সমাজে ছিল। কর্মের বিভাগে দেখি ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়েব কাজ হচ্ছে দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, প্রজাপালন ও রাজ্যবক্ষা। বৈশ্যেব কাজ হচ্ছে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম ও পশুপালন এবং শূদ্রেব কাজ হচ্ছে এই তিন বর্ণের সেবা করা। সামাজিক ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এজন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সবাই নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকবে। নিজ বর্ণেব কাজ ছেড়ে অন্য বর্ণের কাজ কবতে যাওয়া অনুচিত বলে বিবেচিত হত। যখন থেকে জন্মসূত্রে বর্ণভেদপ্রথা নিয়ন্ত্রিত হওয়া শুরু হল, সেই সময় থেকে বৃত্তি-শিক্ষাও জন্মসূত্রেই স্থির হত—এবং একবর্ণের পক্ষে অন্য বর্ণের বৃত্তিগ্রহণ প্রায় নিষিদ্ধই হল। তবে এ ব্যবস্থার যে ব্যতিক্রম ছিল না, এমন নয়। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জাতিগত বৃত্তি-শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে পৃথক্ পৃথক্ পাঠক্রমেব ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃত্তিশিক্ষার প্রাথমিক আয়োজন ছাড়াও উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্রও অতি প্রাচীনকালেই গড়ে উঠেছিল।

॥ সমর-বিদ্যা ও রাজপুত্রদের শিক্ষা ॥

আর্যরা এদেশে এসেছিল বিজয়ীরূপে, স্থানীয় লোকদের যুদ্ধে পরাজিত ক'রেই তারা তাদের অধিকার স্থাপন করেছিল। শত্রুভাবাপন্ন একটি দেশের উপর আধিপত্য বজায় রাখবার প্রয়োজনে বৈদিক যুগ থেকেই যুদ্ধবিদ্যার আদর ছিল। আর্যরা রথ ও অশ্বপরিচালনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিল। এছাড়া, তীর-ধনুক ও বর্শা চালনাতেও তাদের দক্ষতা ছিল। বর্তমানে যেরূপ রাষ্ট্র থেকে সামবিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, প্রাচীন যুগে সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু নগর ও জনপদ রক্ষার দায়িত্ব ছিল সেখানকার

অধিবাসীদের। অর্থশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি নগর ও জনপদের অধিবাসীরা নিজেদের নগর ও জনপদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এজন্য যুদ্ধবিদ্যা শেখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গ্রামে গ্রামে সমরশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ছিল না। স্থানীয় ভাবে যারা অস্ত্র চালনায় নৈপুণ্য লাভ করত, তারাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নতুনদের সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দিত।

প্রথম যুগে যুদ্ধবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আর্যরা যখন এদেশে আসে, তখন তাদের অস্ত্রনির্ভর হয়েই আসতে হয়েছিল। হ্যাভেলের কথায় বলতে হয়, তাদের এক হাতে ছিল তরবারি, আর এক হাতে লাঙল। বশিষ্ঠ ধনুর্বেদ সংহিতায় ব্রাহ্মণকে ধনুক, ক্ষত্রিয়কে তরবারি, বৈশ্যকে বর্শা ও শূদ্রকে গদা দেবার কথা বলেছেন।

পাঞ্জাবের ছোট ছোট প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক লোক সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিল বলে জানা যায়। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, আলেকজাণ্ডার কোন কোন জায়গায় রাজকীয় সৈন্যবাহিনী ছাড়াও দেশের সমস্ত লোকেব কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। স্থানীয় ব্যবস্থা ছাড়াও দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি কেন্দ্রে উচ্চতর সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তক্ষশীলায় সামবিক শিক্ষার জন্য ভারতের সুদূর অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা সমবেত হত। সমবিক বৃত্তি ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও রামায়ণ ও মহাভারত থেকে জানা যায়, ক্ষত্রিয় রাজকুমারেরা ব্রাহ্মণ গুরুর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেছেন। জাতক থেকে জানা যায়, তক্ষশীলার একটি বিদ্যালযে ভাবতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ১০৩ জন রাজপুত্র নানারূপ সামরিক শিক্ষা লাভ করছে। সুগঠিত সামরিক বাহিনী নিয়ে গ্রীকগণ এদেশ আক্রমণের পর এদেশে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। এ সময় থেকে রাষ্ট্রীয় সামরিকবাহিনী গঠিত হতে থাকে। যুদ্ধবিদ্যা শেখার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পালনীয় রীতিনীতি সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হত। ভারতীয় যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হত। *ধনুর্বেদ* থেকে জানা যায়, একজনের দ্বারা পরাজিত সৈনিকের অঙ্গে অপবে অস্ত্রাঘাত করত না। এছাড়া, যুদ্ধে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে বা পালাচ্ছে, বা ভীত বা আশ্রয়প্রার্থী, তার প্রতি ও যুদ্ধে অসংযত, অস্ত্রহীন, উন্মত্ত, নারী, শিশু বা বৃদ্ধেব অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করা ক্ষাত্র রীতিবিরুদ্ধ ছিল। মল্লক্রীড়া ক্ষত্রিয়দের অতি প্রিয় ছিল। অস্ত্রপরীক্ষায় রাজপুত্রদের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, সাধারণ ক্ষত্রিয়দেব জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থার কথা জানা যায় না।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ক্ষত্রিয়দের উপনয়ন-সংস্কার ছাড়াও ধনুর্বেদ-উপনয়নের ব্যবস্থাও ছিল। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে শিক্ষার্থীকে এ অনুষ্ঠানে অস্ত্র দেওয়া হত। তবে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ধনুর্বেদ-উপনয়ন প্রথার কোন উল্লেখ নেই। মনে হয়, কোন কোন ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সংস্কার সীমাবদ্ধ ছিল। সামরিক শিক্ষা শেষ হবার পর ছুরিকা-বন্ধন উৎসব পালিত হত। একে অস্ত্রবিদ্যার সমাবর্তন উৎসব বলা যায়। সামরিক শিক্ষা সমাপ্তির স্বীকৃতিসূচক ছুরিকা এসময় শিক্ষার্থীকে দেওয়া হ'ত।

রাজপুতদের মধ্যে "খড়্গ বান্ধাই" অনুষ্ঠান ছুরিকা-বন্ধন থেকেই প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয়।

বৈদিক যুগে রাজপুত্রেরা ব্রহ্মচর্যাশ্রামে গুরুগৃহে এসে বিদ্যার্জন করত। পরে রাজপুত্রেরা শিক্ষার জন্য দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে যেত। তক্ষশীলায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী রাজপুত্রেরা বিদ্যার্জনের জন্য আসত ও সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে একই ভাবে থেকে শিক্ষা লাভ করত। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ-পরিবারের ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হতে থাকে। রাজধানীর নিকটে রাজকীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হত। অর্থশাস্ত্র থেকে রাজপুত্রদের শিক্ষা সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারি। অর্থশাস্ত্রে রাজপুত্রদের জন্য চারটি বিষয়শিক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে—অন্বীক্ষিকী, তিনবেদ, বার্তা ও দণ্ডনীতি। সাঙ্খ্য, যোগ ও লোকায়ত দর্শনের সমন্বয়ে যে শাস্ত্র, তাই নিয়ে অন্বীক্ষিকী গড়ে ওঠে। বার্তার বিষয় ছিল কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। দণ্ডনীতি বলতে বোঝায় রাষ্ট্রনীতি ও অপরাধীর শাস্তিবিধান নীতি। কৌটিল্য বলেছেন বিভিন্ন বিষয় উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করতে হবে। চূড়াকর্মের পর রাজকীয় শিক্ষার্থী প্রথম বর্ণপরিচয় ও অঙ্ক শিখবে। উপনয়নের পর তিনবেদ এবং অন্বীক্ষিকীও উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে শিখবে। বার্তাশাস্ত্র বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিখবে। দণ্ডনীতি রাজনীতিবিদ্‌দের কাছ থেকে শিখবে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে শিক্ষা লাভ করতে হত। তারপর বিয়ে ক'রে তারা সংসারে প্রবেশ করত। বিয়ের পর বার্তা ও দণ্ডনীতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করত।

দিনের কোন্ সময় কি বিষয় পড়ানো হবে, তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল। ভোরে তারা সামরিক কলা-কৌশল শিখত। এসময় রাজকীয় শিক্ষার্থীকে গজ, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রচালনা শিখতে হত। বিকেলে ইতিহাস পড়তে হত। ইতিহাস বলতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র বোঝাত। মহাকাব্য, পৌরাণিক কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি পুরাণ ও আখ্যায়িকার অন্তর্গত ছিল। দিনের অবশিষ্ট সময় পাঠগ্রহণ, পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি এবং যা বোঝেনি, তাই বার বার শুনত। রাজপুত্রদের দৈনিক পাঠের তালিকায় বেদের উল্লেখ করা হয়নি।

অর্থশাস্ত্রে রাজা ও রাজকর্মচারীদের কর্তব্য, রাজ্যশাসন পদ্ধতি, বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষদের কর্তব্য, কৃষি ও বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আনুমানিক তৃতীয় শতকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে কামন্দকের নীতিসার রচিত হয়। অর্থশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে পরবর্তী কালে নীতিসারই রাজপুত্রদের শিক্ষায় ব্যবহৃত হত।

ব্রাহ্মণরাই রাজপুত্রদের শিক্ষা দিতেন। ক্ষত্রিয়দের পক্ষে শিক্ষকতা নিষিদ্ধ ছিল। তবে মনু বিধান দিয়েছেন ব্যবসা ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বৃত্তি সম্পর্কীয় শিক্ষায় রাজপুত্রদের জন্য ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্য বর্ণের লোক নিয়োগ করা চলবে। দণ্ডনীতি, বার্তা

ছাড়াও রাজপুত্রেরা চিত্রাঙ্কন ও সংগীত বিদ্যাতেও পারদর্শিতা লাভ করত। সাধারণতঃ ২৪ বছর বয়সে রাজপুত্রদের শিক্ষা শেষ হত। শিক্ষা শেষ হলে তারা রাজার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হত।

॥ চিকিৎসা-বিদ্যা ॥

ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্রের খ্যাতি অতি প্রাচীন কাল থেকে শোনা যায়। বৈদিক গ্রন্থ ও পুরাণে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের অত্যাশ্চর্য রোগ নিরাময় ক্ষমতার কথা আছে। খ্রীষ্ট-জন্মের বহু পূর্বেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ভারতীয় চিকিৎসকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রোপোচার দুই দিকেই তাঁদের সমান দক্ষতা ছিল। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ভারতীয় চিকিৎসকদের সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে সাধারণতঃ সব বর্ণেরই অধিকার ছিল। শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের পূর্বে চরক ও সুশ্রুত আয়ুর্বেদিক উপনয়নের বিধান দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের কাছ থেকেও আয়ুর্বেদ শিক্ষা করা যেত। সুশ্রুত বলেছেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য চিকিৎসকেরা নিজ নিজ বর্ণের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারেন। সুশ্রুত শল্যবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার স্বীকার করেছেন। যদিও এদের ক্ষেত্রে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আয়ুর্বেদিক উপনয়ন নিষিদ্ধ ছিল। এই উপনয়নকালে শিক্ষার্থীকে সংযতভাবে জীবনযাপনের নির্দেশ দেওয়া হ'ত। লোভ, ক্রোধ, কাম, আলস্য, দাম্ভিকতা, নিষ্ঠুরতা, অসত্যকথন প্রভৃতি সব কিছু পরিহার ক'রে ছাত্রকে পরিশ্রমী হতে হবে এবং সর্বদা নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে বলে নতুন শিক্ষার্থীকে উপদেশ দেওয়া হত।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রকে সংস্কৃত ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হত। না বুঝে মুখস্থ করার উপায় ছিল না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুঁথি যে না বুঝে মুখস্থ করেছে, সুশ্রুত তাকে ভারবাহী গাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সে শুধু বোঝাই বহন করে, জানেনা সে কি বহন করছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্রকে হাতেকলমে কাজ শিখতে হত। শল্যবিদ্যা শিক্ষাকালে লাউ, তরমুজ প্রভৃতির উপর ছুরি চালিয়ে ছুরি ধরার কৌশল অভ্যাস করতে হত। কৃত্রিম নরদেহে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও সেলাই শেখার ব্যবস্থা ছিল। অস্ত্রোপচার শুধুমাত্র বই পড়ে শেখা যায় না বলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শব-ব্যবচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী-কালে সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে শব-ব্যবচ্ছেদপ্রথা রহিত হয়ে যাওয়ায় শল্য চিকিৎসার অবনতি ঘটে।

শিক্ষানবীশ থাকাকালে গুরুর কাছে যেসব রোগী আসত, শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষা করবার সুযোগ পেত। গুরুর চিকিৎসাপদ্ধতি, রোগনির্ণয় ও ঔষধপ্রয়োগ থেকেও শিক্ষার্থীরা বাস্তব জ্ঞান লাভের সুযোগ পেত। পাটলিপুত্রে একটি বড় হাসপাতাল ছিল। শিক্ষার্থী ছাত্রগণ সেখানে কাজ ক'রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে

ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করত। ভারতে হাসপাতালের সংগঠন ও চিকিৎসার খ্যাতি ভারতের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ তাঁর রাজ্য থেকে ভাবতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছাত্র পাঠান। ভারত থেকেও তিনি তাঁর বাজ্যে চিকিৎসক নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় কুড়িজন ভারতীয় চিকিৎসক তাঁর বাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেব গ্রন্থাদি তাঁদের দ্বারা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে কতদিন শিক্ষা নিতে হত, সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। ভগবান বুদ্ধের সময় তক্ষশীলায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শিক্ষাকাল দীর্ঘ ছিল বলে মনে হয়। বাজগৃহের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলায় সাত বছর শিক্ষাব পব যখন গৃহে ফিরে যেতে চান, তখন অধ্যাপক অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, এই অল্পকাল শিক্ষা গ্রহণ ক'বে সে যেন মনে না ক'বে যে, সে এই বিদ্যায় পাবদর্শিতা লাভ কবেছে। আযুর্বেদ-শাস্ত্র এত বিশাল ও ব্যাপক ছিল যে, চবক বলেছেন, এই শাস্ত্রে কেউ সব দিক্ থেকে সমান দক্ষতা লাভ করতে পাবে না। সে যুগেব চিকিৎসাশাস্ত্রের এক এক বিষয়ে এক একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে চিকিৎসা কববাব ছাড়পত্র মিলত। চরক, সুশ্রুত, শুক্র সবাই বলেছেন বাজাব ছাড়পত্র ছাড়া কোন লোককে চিকিৎসা কবতে দেওয়া উচিত নয়।

সাধাবণ শিক্ষার মত চিকিৎসাবিদ্যার সমাপ্তিতে সমাবর্তন উৎসব হত। সমাবর্তন উৎসবে তরুণ চিকিৎসকদের যে উপদেশ দেওয়া হত, তা থেকে আমরা সে যুগেব চিকিৎসক-জীবনের উচ্চাদর্শ সম্পর্কে ধারণা কবতে পাবি। চিকিৎসকের ব্রতই হবে—কি ক'বে রোগীব মঙ্গল হয়, প্রতিনিয়ত সে চেষ্টা কবা। নিজেব জীবন বিপন্ন হলেও চিকিৎসক রোগীকে অবহেলা করবেন না। চিকিৎসক বিলাসব্যসন থেকে দূরে থাকবে, সহজ-সবল জীবন যাপন করবে। সত্যের প্রতি তাব অবিচল নিষ্ঠা থাকবে। সব সময়েই জ্ঞান বাড়াবাব জন্য সচেষ্ট থাকবে। রোগীর কক্ষে বোগী দেখবার সময় সমস্ত মনোযোগ রোগীর প্রতি নিবদ্ধ রাখতে হবে। রোগী ও বোগীর পরিবাব সম্পর্কে জ্ঞাত সংবাদ গোপন রাখতে হবে। জ্ঞানবৃদ্ধিব জন্য শত্রুর আবিষ্কার বা পর্যবেক্ষণ থেকে আহরিত তথ্য পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। কারো পক্ষেই চিকিৎসা-বিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তাই সর্বদাই সে নতুন জ্ঞান আহরণে যত্নবান থাকবে। এর থেকে বোঝা যায়, চিকিৎসকের জীবন ছিল মানবসমাজ-কল্যাণের জন্য জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার জীবন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের অতি উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে ছিল। ঐ সময় পর্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসকের সুনাম দেশবিদেশে বিস্তৃত ছিল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ তখন পর্যন্ত নতুন নতুন আবিষ্কার ও রোগ-নিরাময়ের নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মধ্যযুগে শবব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে সামাজিক বাধা শল্যচিকিৎসার উন্নতির পথে অন্তরায় রূপে দেয়। ক্রমে আয়ুর্বেদ

থেকে অস্ত্রোপচার একেবারেই উঠে যায়। মধ্যযুগে চিকিৎসকগণ পূর্ব সম্মানের আসন থেকে বিচ্যুত হন। সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাওয়ায় ও উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অভাবে ধীরে ধীরে ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অবনতি হয়।

॥ পশু-চিকিৎসা ॥

পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা অতি প্রাচীন কালেই ভারতে প্রবর্তিত হয়। সালিহোত্রকে পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থার আদি প্রবর্তক বলা হয়। মহাভারতে পাণ্ডবভ্রাতাদের মধ্যে নকুল ও সহদেব পশু-চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। মৌর্যযুগে সেনাবাহিনীতে অশ্ব ও গজের চিকিৎসক নিযুক্ত করা উচিত বলে কৌটিল্য বিধান দিয়েছেন। মূক প্রাণীর চিকিৎসার জন্য অশোক রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। পশু-চিকিৎসার জন্য গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। অশ্ব-চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতারূপে নকুলের নাম করা হয়। হস্তী-আয়ুর্বেদ রচয়িতা পালকাপ্য অঙ্গরাজ রোমশপাদের পশু-চিকিৎসক ছিলেন। পশু-চিকিৎসা শিক্ষা দেবার জন্য কোন স্কুল বা কলেজ সে যুগে ছিল না। মনে হয়, এ বিদ্যা বংশানুক্রমিকভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

॥ কারিগরী শিক্ষা ॥

আজকের দিনে কৃষক, পশুপালক, ছুতার, কামার, তাঁতি প্রভৃতির বিশেষ সামাজিক মর্যাদা নেই। প্রাচীন যুগে এদের সমাজে বিশেষ মর্যাদা ছিল। ঋগ্বেদে বিভিন্ন শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়। সে যুগে তক্ষণ-শিল্পীর অত্যন্ত আদর ছিল। যুদ্ধের জন্য রথ ও অস্ত্র এবং কৃষি-কাজের জন্য নানা উপকরণ এরা তৈরী করত। এছাড়া ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, সীবন ও নৃত্যশিল্পের উল্লেখ আছে। গৃহনির্মাণ, নগরনির্মাণ, যাতায়াতের যানবাহন নির্মাণের জন্য বহু লোক নিযুক্ত থাকত। ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষার আয়োজন সে যুগে ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করত। প্রাথমিক শিক্ষা পিতার কাছে শুরু হত, তারপর নিপুণ শিল্পীর কাছে শিক্ষার্থীদের পাঠানো হত দক্ষতা অর্জনের জন্য। এক একটি সম্প্রদায়ের শিল্পীগোষ্ঠী (Guild) সম্প্রদায়গত শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করত। বৃত্তি জাতিগত হবার ফলে অতি শৈশব থেকে পিতা অতি যত্নে আপন সন্তানকে নিজ বৃত্তি শিক্ষা দিতেন। শিশু একটি বিশেষ শিল্পের পরিবেশের মধ্যে বাস করবার ফলে নিজের অজ্ঞাতেই সেই শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করত। ফলে সেই শিল্পকে আয়ত্ত করা ও নৈপুণ্য লাভ করা তার পক্ষে সহজ হত।

কারিগরী শিল্পে প্রাথমিক স্তর পার হবার পর কুশলী শিল্পীর কাছে শিক্ষানবিশী করার প্রথাই সে যুগে অধিক প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীকে একটা নির্দিষ্ট সময় শিক্ষা-গ্রহণ করবার প্রথাই সে যুগে অধিক প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীকে একটা নির্দিষ্ট সময় শিক্ষাগ্রহণ করবার অঙ্গীকার করতে হত। বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষাকাল বিভিন্ন রূপ হত।

শিক্ষাকালে গুরুগৃহে থাকাকালীন বাসস্থান ও আহার্যের জন্য কোনরূপ খরচ দিতে হত না। শিক্ষার্থীর তৈরী জিনিসে গুরুর অধিকার থাকত। তার বিক্রয়মূল্য গুরুই গ্রহণ করতেন। গুরুর পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি না থাকলে শিক্ষার্থী চুক্তিকাল শেষ হবার আগে চলে যেতে পারত না। উপযুক্ত কারণ ছাড়া গুরু-ত্যাগ করলে তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করা হত। শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা দেখলে গুরু চুক্তি বাতিল ক'রে দিতে পারতেন। শিক্ষা-শেষে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করত। শিক্ষা শেষ ক'রে গুরুর অধীনে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবার সুযোগ পেলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী সেখানেই থেকে যেত।

প্রাথমিক শিল্পজ্ঞানের জন্য শিক্ষার্থীর সাধারণ লেখাপড়া জানবার বিশেষ প্রয়োজন হত না। বৃত্তিশিক্ষায় যারা নিয়োজিত থাকত, তারা প্রায়ই লেখাপড়া শিখত না। কিন্তু ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে হত। কারণ এসম্পর্কে যে সব পুঁথি ছিল, তা সংস্কৃতে লেখা। তবে অনেক সময় দেখা গিয়েছে শিল্পীরা সংস্কৃত না শিখেও পুরুষানুক্রমে সূত্রগুলি মুখস্থ করে নিয়েছে। স্থপতিকে হিসাবের অঙ্ক শিখতে হত। এছাড়া শিক্ষা-নবীশ শিল্পীকে নৈতিক উপদেশ দেওয়া হত। এভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবার ফলে শিল্পীরা নিজ নিজ শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করত। আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পীদের সুনিপুণ শিল্প-কার্যের যে সব নিদর্শন আমরা পেয়েছি, তা আজও আমাদের মুগ্ধ করে। ভারতের শিল্পের উৎকর্ষতার প্রশংসা ও খ্যাতি ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রাচীন যুগের শিল্পী-সঙ্ঘ আমাদের সমাজ-জীবনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কতদিন পূর্বে এদেশে শিল্পী-সঙ্ঘের (Trade Guild) সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথা বলা কঠিন। রামায়ণে পরোক্ষভাবে শিল্পী-সঙ্ঘের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শিল্পী-সঙ্ঘের উল্লেখ আছে। কুমার, কামার, ছুতার, দর্জি, সেকরা, ধোপা, নাপিত সবাই বৈশ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা সবাই সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পিগণ নিজেদের শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্পী-সঙ্ঘে ঐক্যবদ্ধ হত। শিল্পী-সঙ্ঘের সভ্যপদ ছিল বংশানুক্রমিক। বাইরের লোক বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলে তাকে কোন বিশেষ শিল্পী-সঙ্ঘে গ্রহণ করা হত। সঙ্ঘ সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করত। সঙ্ঘ সদস্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বিচার ক'রে শাস্তি বিধান করত, জরিমানা আদায় করত। সংগৃহীত অর্থ নানা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হ'ত। সঙ্ঘ হতে কাজের সময়, শিল্পকর্মের মান (Standard) প্রভৃতি নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হত। শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মের উন্নত মান রক্ষা করা একটা সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করত। কোন সঙ্ঘের দুর্দিন পড়লে সঙ্ঘ থেকে তাকে সাহায্য করা হত।

প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা চিরদিন রাজানুকূল্য লাভ করেছে। কোন কোন সময়ে মন্দির ও মঠের সঙ্গেও শিল্পী-পরিবার যুক্ত থাকত। অশোকের সময় দেখা যায়, রাজকীয় শিল্পী-দলের সৃষ্টি হয়েছে। রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থসাহায্যে শিল্পের উন্নতি হয়েছে। আবার অনেক সময় শিল্পীদের নানারূপ নিগ্রহও

সহ্য করতে হয়েছে। রাজা বা বিত্তবানদের খেয়াল চরিতার্থ করতে বিনাপারিশ্রমিকে বা নামমাত্র পারিশ্রমিকে শিল্পীকে উৎপীড়নের ভয়ে কাজ করতে হয়েছে। নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও ভারতের শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে তাদের জাতিগত বৃত্তির উন্নত মানকে বজায় রেখে ভারতের শিল্পকলার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মুসলিম যুগে ও ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিল্পীদের তৈরি নানা শিল্পদ্রব্যই ছিল আজকের সুসভ্য ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায়ের সবচেয়ে লোভের বস্তু।

॥ বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষা ॥

বণিক সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদিকযুগের প্রথম অবস্থায় বণিক সম্প্রদায়ের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল না। বেদে 'পণি' অর্থাৎ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, তাদের সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবই দেখানো হয়েছে। তারপর তারা যখন বিত্তশালী হয়ে উঠল, তখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়। মৌর্যযুগে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। সুদূর রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা সম্পর্কে নির্দেশ প্রসঙ্গে মনু বণিকদের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের উল্লেখ করেছেন। বণিককে প্রথমেই জানতে হত যেসব জিনিস নিয়ে কারবার হত তার প্রকারভেদ ও গুণগত বৈষম্য। তারপর শিখতে হত বাণিজ্যিক ভূগোল—কোথায় কোন্ জিনিস উৎপাদিত হয়, কি ক'রে কোন্ পথে সেখান থেকে জিনিস রপ্তানি হয়। সে যুগে শুল্ক ব্যবস্থার অত্যন্ত বাহুল্য ছিল। তাই কোন্ পথে পণ্য আমদানী-রপ্তানী করলে কম শুল্ক দিতে হয় বা ফাঁকি দেওয়া যায়, সেজন্য পথের বিস্তৃত বিবরণ জানতে হত। এছাড়া, কোথায় কোন জিনিসের চাহিদা বেশী, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হত। বছরের বিভিন্ন সময় দেশের কোথায় কি মেলা বসত, তার খবর রাখতে হত। কোন্ প্রদেশে কোন্ পণ্যের কি মূল্য জেনে পণ্যের আমদানী-রপ্তানী করা হত। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হত। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক রাখতে হলে কাজ চালানোর মত বৈদেশিক ভাষাও শিখতে হত। প্রাচীনকালে ধনী শ্রেষ্ঠীরাই ছিল দেশের ব্যাঙ্কার। তাই টাকা দাদন দেবার রীতিনীতিও কিছু শিখতে হত। শিক্ষার এই ব্যাপক পাঠক্রম থাকলেও সবার পক্ষে এতটা শেখা সম্ভব ছিল না, প্রয়োজনও হত না। সাধারণভাবে যারা দেশের মধ্যে ব্যবসা করত, তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা করত। বণিকদের শিক্ষার জন্য বণিকসমিতি বা সঙ্ঘ থেকে ব্যবস্থা করা হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ নিজ কারবারেই শিক্ষানবীশি করে শিক্ষার্থীরা কাজ শিখত। কিছুদিন পূর্বেও এদেশে মহাজনী স্কুল ছিল। বড় বড় শহরে বণিকসঙ্ঘ এসব বিদ্যালয় পরিচালনা করত। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতের ধর্মজীবনে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়েছিল। বৈদিক ধর্মের জটিলতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে একদিন ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাব হয়। এ সময় থেকে বৈদিক ধর্ম অত্যন্ত জটিল ও গতানুগতিক হয়ে ওঠে। যাগযজ্ঞ, পশুবলি এবং একে কেন্দ্র ক'রে নানাবিধ দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। আন্তরিকতাশূন্য, সাধারণের নিকট অর্থহীন এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলির ফলে বৈদিক ধর্মের সরল, অনাড়ম্বর ও ভক্তিময় পবিত্র ভাবটি দূর হয়ে বৈদিক ধর্ম সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে সরে দাঁড়ায়। পুরোহিত সমাজে নিম্নবর্ণের লোকের প্রতি উচ্চবর্ণের ঘৃণ্যর ভাব সমাজ-জীবনে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সহজ সরল মানুষের পক্ষে বোধগম্য ও সর্বসাধারণের যেখানে সমান অধিকার থাকবে, এমন একটা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সমাজে দেখা দেয়। আর্য ধর্মের জ্ঞান-কাণ্ডকে কেন্দ্র ক'রে নতুন চিন্তার ফলেই বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেবকে পুরোহিত-শাসিত ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী বলা যায়। একই সময় ভারতে দু'জন ধর্মগুরু বেদের যাগযজ্ঞ ও পশুবলির বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা দু'জনেই ক্ষত্রিয় বংশজাত—একজন মহাবীর, অপরজন গৌতম বুদ্ধ। এঁরা হিন্দু ধর্মের প্রচলিত প্রথাসমূহের বিরোধিতা করেছিলেন সত্য, কিন্তু এঁদের বেদ-বিরোধী বলা চলে না। উপনিষদের চিন্তাধারা থেকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। বুদ্ধদেব ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নীচ সবার কাছেই তাঁর ধর্মের দ্বার মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। ধর্মের কাছে তিনি জাত-বিচারকে স্বীকার করেননি। তাঁর সর্বজনীনতা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আভিজাত্যে এক প্রচণ্ড আঘাত হানে। তাঁর ধর্মের বাণী যাতে সর্বসাধারণে বুঝতে পারে, সেজন্য তিনি ধর্মপ্রচারে সংস্কৃতকে পরিহার করেন। তিনি সকলের পক্ষে বোধগম্য প্রাকৃতজনের ভাষায় ধর্মের যে মহাবাণী প্রচার করেছিলেন, তা তিনি উপনিষদ থেকেই লাভ করেছিলেন। ম্যাক্সমূলার বলেছেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাদ দিলে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধরা প্রায় সব দার্শনিক আলোচনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিকট ঋণী। সাধারণভাবে বলা হয়, বুদ্ধ ছিলেন বেদ-বিরোধী—একথা সত্য তিনি যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত, একথা তিনি মানতেন না। কিন্তু তিনি এমন কোন তত্ত্বের সন্ধান দেননি যা উপনিষদের মধ্যে পাই না। তিনি নতুন আলোকে পুরাতন সত্যের বাণীকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন—সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন অমৃতত্ত্বের বার্তা। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে তিনি সকলকে মুক্তির পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন। জীবনের প্রতি স্তরে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর দুঃখ—এই অনন্ত দুঃখের প্রবাহ থেকে কারও মুক্তি নেই। শাক্য-রাজকুমারের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, সত্যই কি দুঃখের নিবৃত্তি

নেই, দুঃখের থেকে মুক্তির কোন পথ নেই?—তিনি জানতে চেয়েছিলেন. দুঃখ কি এবং দুঃখের কারণ কি? এই রহস্যকেই তিনি চারটি আর্য-সত্য (চত্বারি অরিয় সচ্চানি) রূপে প্রকাশ করেছেন—(১) এই সংসার দুঃখময়, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) এই দুঃখের নিরোধ ঘটানো সম্ভব, (৪) এই দুঃখ-নিরোধের উপায় বা পথ আছে। এই উপায় বা পথ হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অরিয়ো অটঠঙ্গিকো মগগো) এই আটটি উপায় হল—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সংকল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম, (৫) সম্যক্ জীবিকা, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৮) সম্যক্ সমাধি। বুদ্ধদেব বলেছেন, মানুষের অজ্ঞতাই তার দুঃখের কারণ। অজ্ঞতা দূর হলেই সে নিজের স্বরূপকে জানতে পারবে এবং দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবে। ধর্মের চুলচেরা কূট আলোচনায় না জড়িয়ে তিনি আটটি পথের কথা বলছেন—বুদ্ধ-প্রদর্শিত সৎপথে চললে মানুষ নিজের অজ্ঞতার জন্য যে বারবার জন্মলাভ ক'রে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হয়, তার থেকে মুক্তি লাভ ক'রে সে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম চিরকাল একই রকম থাকেনি। কণিষ্কের সময় বৌদ্ধধর্ম দু'টি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়—মহাযান ও হীনযান। কালক্রমে মহাযান ধর্মমত ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। মহাযান সম্প্রদায়ের চেষ্টা ও অনুপ্রেরণায় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তীপুর প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারগুলিকে কেন্দ্র ক'রে নতুন নতুন মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ-ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। নব-দীক্ষিত বৌদ্ধদের ধর্মের রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্যই বৌদ্ধরা একটা নতুন ও নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করেছিল। সেই প্রয়োজন মেটাতেই বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার শুরু। শিক্ষা-নীতির দিক্ থেকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থার মিল থাকলেও ধর্মপথের বিভিন্নতার জন্য কতকগুলি পার্থক্য দেখা দেয়। ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষা বেদনির্ভর আর বৌদ্ধ-শিক্ষা বেদবিরোধী। বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদের পর প্রতিষ্ঠিত হলেও বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় একথা স্বীকার করেনি। হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনটি উচ্চ বর্ণের (দ্বিজ) শিক্ষার অধিকার ছিল—শূদ্রেরা ছিল হিন্দু শিক্ষা পরিকল্পনার বাইরে। বৌদ্ধধর্মে জাতী ভেদ ছিল না। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, উচ্চ-নীচ বৌদ্ধ-সঙ্ঘে যোগ দিলে সবাই সমান। তাই বৌদ্ধ ধর্মে সবাই শিক্ষার অধিকারী ছিল। যে-কেউ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে শূদ্র হলেও সে নির্বাণ বা মুক্তির অধিকারী ছিল। হিন্দু ধর্মে শুধু ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষা দিতে পারতেন, বৌদ্ধধর্মে যোগ্যতা থাকলে যে-কেউই আচার্য পদের অধিকারী হতে পারতেন। হিন্দু শিক্ষার্থীরা আচার্যের গৃহে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, এবং ব্রাহ্মণ আচার্যেরা স্ত্রীপুত্র-পরিবৃত হয়ে সংসারে থেকেই শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিহারে বাস করতেন, এই বিহার বা সঙ্ঘারাম বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। এই বিহারকে কেন্দ্র ক'রেই বৌদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব হয়েছিল। সংসারত্যাগী শ্রমণেরা বিহারে থেকে শিক্ষা পরিচালনা করতেন।

হিন্দু শিক্ষা গ্রহণ যেমন উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হত তেমনি বৌদ্ধদেরও ভিক্ষু জীবনের শুরু হত একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করবার প্রথম অনুষ্ঠানকে বলা হয় প্রব্রজ্যা (পবজ্যা)। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পথটি ছিল অত্যন্ত সরল। বৌদ্ধধর্মে জাতবিচার না থাকায় যে কোন বর্ণের লোকই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারত। তবে পিতামাতার অনুমতি বিনা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারা যেত না। প্রথম দীক্ষা গ্রহণকারীর বয়স আট বছরের কম হলে চলত না। এছাড়া রাজকর্মচারী, ক্রীতদাস, চোর, ডাকাত, হত্যাকারী, ঋণী, বিকলাঙ্গ, নপুংসক, কুষ্ঠ, চর্ম, ক্ষয় ও মৃগী রোগীর সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

বিনয় পিটক থেকে জানা যায়, প্রব্রজ্যাগ্রহণকারীকে একজন উপাধ্যায় বেছে নিতে হত। বিদ্যার্থী সঙ্ঘে প্রবেশ করবার পর দশ থেকে ত্রিশ দিন উপাসক থাকতেন। এসময়ে তাকে পঞ্চশীল পালনের উপদেশ দেওয়া হত। তারপর সে চুল, দাড়ি, গোঁফ প্রভৃতি কামিয়ে হলদে রঙের পোশাক পরে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করত। উপাধ্যায় তখন তাকে দশজন ভিক্ষু নিয়ে গঠিত একটি পরিষদের সামনে হাজির করতেন। তাঁরা প্রব্রজ্যা দান করতে রাজী হলে, সে গুরুকে হাত জোড় করে বলত—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। এইভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করবার পর থেকেই তার শিক্ষা শুরু হত। এই সময় তাকে কতকগুলি অনুশাসন পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হত। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথা, মদ্যপান, বৈকালিক আহার, নৃত্য-গীত, বাজনা প্রভৃতি উপভোগ করা, মালা, চন্দন, গন্ধদ্রব্য প্রলেপ প্রভৃতি ব্যবহার করা, উঁচু শয্যায় শয়ন করা, সোনা-রূপা ইত্যাদি দান গ্রহণ করা, সবই নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচর্য ছিল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের অবশ্যপালনীয় ধর্ম। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর প্রথম অবস্থায় ভিক্ষুকে বলা হত শ্রমণ। শ্রমণকে গুরুর অধীনে থাকতে হত। প্রব্রজ্যার কাল ছিল বারো বছর ব্যাপী। এর পর উপসম্পদা। কুড়ি বছর বয়স হবার পর যদি শ্রমণ উপযুক্ত বিবেচিত হত, তাহলে তাকে উপসম্পদা দেওয়া হত। এই সময় থেকে তাকে বলা হত ভিক্ষু। উপসম্পদা পেতে হলে কমপক্ষে দশজনের এক ভিক্ষু-সঙ্ঘের অনুমোদন প্রয়োজন হত—পরে অবশ্য পাঁচজন হলেও হত। ভিক্ষুদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাঁদের তুষ্ট করতে পারলেই উপসম্পদা পাওয়া যেত। উপসম্পদার দশ বছর বাদে কোন ভিক্ষু উপাধ্যায়ের পদ পেতে পারত।

মঠবাসী ভিক্ষুদের বিহারের নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। বুদ্ধদেব সাধনপথে কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। কিন্তু পরে ভিক্ষুজীবনের ধারা কতকগুলি কঠোর নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ভিক্ষু হলুদ রংয়ের অধোবাস, উপরিবাস ও বহির্বাস ও উত্তরীয়—এই তিনটি পোশাক পরত। ভিক্ষান্ন গ্রহণ করত—তবে গৃহীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় বাধা ছিল না। গৃহীর দ্বারা প্রেরিত খাদ্যও তারা গ্রহণ করতে পারত। সাধারণভাবে ভিক্ষু পাদুকা ব্যবহার করত না, তবে অসুস্থ হলে বা বন্ধুর পথ চলবার সময় নিয়মের ব্যতিক্রম হত। গুরুজনদের সম্মান করা অবশ্যকর্তব্য ছিল। কোন ভিক্ষু অপরাধ করলে দশজন প্রধান ভিক্ষু মিলে

অপরাধীর শাস্তিবিধান করত। অপরাধ গুরুতর হলে মঠ থেকে বার পর্যন্ত করে দেওয়া হত। প্রতি মাসে দু'বার ভিক্ষু-সভায় বৌদ্ধসঙ্ঘের অনুশাসন ও অনুশাসন-ভঙ্গের শাস্তির বিধান সম্পর্কে প্রতিমোক্ষ-গ্রন্থ পাঠ হত। কেহ অনুশাসন ভঙ্গ করলে সভায় সে কথা স্বীকার করত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হত। ভিক্ষুজীবনের প্রধান বা চরম শাস্তি ছিল ভিক্ষুত্ব চ্যুতি।

ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ভিক্ষুর অবশ্যপালনীয় ধর্ম ছিল—তাই ভিক্ষুমাত্রেই ভিক্ষা করত। বৌদ্ধবিহারের সাধারণ কায়িক পরিশ্রমের কাজ শ্রমণেরা করত। প্রধান উপাধ্যায়েরা ধ্যান-সাধন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকতেন। ভিক্ষুরা বছরের প্রধান অংশ ধর্মপ্রচারের জন্য দেশ মধ্যে ভ্রমণ করতেন। বর্ষায় এসে বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করতেন—এ সময়কে বর্ষাবাস বলা হত।

শ্রমণকে একজন আচার্যের অধীনে শিক্ষাগ্রহণ করতে হত। ভিক্ষুব্রতপালনকারী শিক্ষার্থীকে বলা হত 'সদ্ধিবিহারিক'। বৌদ্ধবিহারগুলি ছিল আবাসিক বিদ্যালয়। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল আবাসিক, কিন্তু সঙ্ঘ-শিক্ষার মত তা প্রতিষ্ঠানগত ছিল না। বৈদিক গুরুকুলের শিক্ষা অনেকটা পারিবারিক শিক্ষার মত ছিল। বৌদ্ধ-শিক্ষায় বৌদ্ধসঙ্ঘগুলি নবীন দীক্ষিতদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করত। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণের পূর্বে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৌদ্ধসঙ্ঘগুলি তার অবর্তমানে তাঁর স্থান গ্রহণ করবে। হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার মত এখানেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত মধুর। শিষ্য নানাভাবে গুরুসেবা করত। গুরুর কোন অসুবিধা না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা শিষ্যের অবশ্যকর্তব্য ছিল। মহাবগ্‌গে শ্রমণের করণীয় কর্তব্যের এক বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। শ্রমণ প্রতিদিন উপাধ্যায়ের মুখ ধোবার জল, দাঁতন ইত্যাদি প্রস্তুত রাখত। তারপর আসন প্রস্তুত ক'রে পাত্র পরিষ্কার করত ও আহার্য এনে দিত। খাওয়া হয়ে গেলে সেই পাত্র ও আহারের স্থান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখত। ভিক্ষা বেরুবার পূর্বে বেশভূষা পরিধানে সাহায্য ক'রে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিত। আচার্য যদি নির্দেশ দিতেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে শ্রমণকেও ভিক্ষায় যেতে হত। শিষ্য দূর থেকে গুরুকে অনুসরণ করত। ভিক্ষা থেকে ফিরে স্নানের জল যোগান, আহার্য দেওয়া, এমনি ক'রে নানাভাবে শ্রমণ উপাধ্যায়ের সেবা করত। শুধু সেবা ক'রে আর উপদেশ পালন ক'রেই শিষ্যের কাজ শেষ হত না। উপাধ্যায়ের জীবনে যদি কোন বিভ্রান্তি বা ধর্মীয় সঙ্কটের সৃষ্টি হত, তাহলে শিষ্যকে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হত। গুরুর মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রমণ সর্বভাবে চেষ্টা করত। গুরু যদি সঙ্ঘের আদর্শের বিরোধী কোন কাজ করতেন, তাহলে সঙ্ঘ যাতে তাঁর উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করে, শ্রমণকেই সে বিষয়ে তৎপর হতে হত।

নবীন শিষ্যের প্রতি গুরুরও কতকগুলি কর্তব্য ছিল। মহাবগ্‌গে বলা হয়েছে শিষ্যের ধর্মীয় নৈতিক জীবন গড়ে তোলবার দায়িত্ব উপাধ্যায়ের। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আচার্য তাকে উপদেশ দেবেন, প্রশ্ন করবেন, কর্তব্য নির্দেশ দেবেন।

শ্রমণের জীবনকে আচার্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। শিষ্য ভিক্ষুর পালনীয় অনুশাসনগুলি পালন করেছে কিনা, সে সম্পর্কে তিনি দৃষ্টি রাখতেন। শ্রমণের ভিক্ষাপাত্র, পরিধেয় কষায় বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে দেওয়া ছিল গুরুর কর্তব্য। শিষ্য পীড়িত হলে গুরুকে শুধু তার সেবা করলেই চলত না—শিষ্য যেরূপ গুরুর রোগশয্যার পাশে সারাক্ষণের জন্য থাকত, গুরুকেও তেমনিভাবে শিষ্যের পাশে থেকে সেবা করতে হত। গুরু যদি মনে করত, শিষ্য সঙ্ঘের নিয়মকানুন মেনে চলছে না ও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাসী নয় তাহলে শিষ্যকে সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন।

বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া। শ্রমণের পাঠ্যসূচী খুব ব্যাপক বা দীর্ঘ ছিল না। প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধ পাঠ্যসূচীতে লৌকিক বিদ্যার কোন স্থান ছিল না। মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের পাঠ্যসূচী বিভিন্ন ছিল। ই-ৎসি-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, শ্রমণেরা রাত্রির প্রথম ও শেষ যামে আচার্যের কাছে যেত। তিনি ত্রিপিটক থেকে সময়োপযোগী কোন অধ্যায় পাঠ দিতেন—এবং তা বুঝিয়ে দিতেন। শিক্ষার প্রথম স্তরে সূত্র পুনরাবৃত্তি ক'রে তা আয়ত্ত করতে হত। তারপর বিনয়ের অংশবিশেষ পাঠ হত ও তাই নিয়ে আলোচনা হত। তারপর ধম্মপদ নিয়ে আলোচনা হত। শিক্ষা লৌকিক ভাষায় দেওয়া হত। সংস্কৃত, জ্যোতিষ, যাদু, দৈব, লোকায়ত দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধদেব চুলচেরা বিচার পছন্দ করতেন না। এজন্য কূটতত্ত্বের আলোচনা থেকে তাঁর ধর্মকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। প্রথম যুগের পাঠ্যসূচী সেভাবেই রচিত হয়েছিল। নিজেদের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পরবর্তী আচার্যদের অবশ্য কূটতর্কের জন্য তৈরি থাকতে হত। পাঠ্যসূচীরও সেইভাবে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

নালন্দা ও বিক্রমশীলার পাঠ্যসূচী নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম প্রথম যুগ থেকে পরবর্তী যুগে আরও ব্যাপকতর হয়েছে। হিন্দু ও জৈন ধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হত। শুধু দর্শন সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যের আলোচনাও হত। লৌকিক বিদ্যাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। লৌকিক বিদ্যার মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্যাদা বৌদ্ধশিক্ষার প্রায় আদি যুগ থেকে স্বীকৃত। মহানুভব অশোক তাঁর রাজ্যে বহু চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। বিখ্যাত আয়ুর্বেদশাস্ত্র-প্রণেতা চরক কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। বুদ্ধের চিকিৎসক জীবক যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

বিহারগুলিতে শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল প্রধানতঃ মৌখিক। বৌদ্ধযুগে লিপির প্রচলন ছিল, বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থায় লিপির ব্যবহার কম ছিল। বুদ্ধদেব আলোচনা, উপদেশপূর্ণ গল্প, উপকথার সাহায্যে শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতেও সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হত। বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষায় ধর্মের বাণী প্রচার করেন নি। তাই এই সময় থেকে আঞ্চলিক ভাষার প্রসার ও প্রতিপত্তি

বাড়তে থাকে। বুদ্ধের বাণী বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষায় প্রচার ও শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে।

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিতর্ক ও আলোচনার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিতর্কের মধ্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমাপ হত। বিতর্কে বিজয়ীকে রাজসম্মানে ভূষিত করা হত এবং তাদের নাম সিংহদ্বারে লিখিত থাকত। শ্রমণেরা একত্রিত হয়ে ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা করতেন। বুদ্ধদেব কূটতর্ককে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন, তাই প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধশিক্ষা ছিল মূলতঃ নৈতিক। পরবর্তী যুগে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন ও বৌদ্ধ ধর্মের নীতিগুলিকে দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিতর্কের সম্মুখীন হতে হত। এজন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞানমার্গিক শিক্ষাতেও পারদর্শী হয়ে উঠত। নাগার্জুন, আর্যদেব, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতদের লেখা গ্রন্থাদি পড়লে বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক চিন্তা কতদূর সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘে শিক্ষার্থীদের গণিত ও আইন শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায় না।

সঙ্ঘে ভিক্ষুর জীবনযাত্রা কঠোর ছিল, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা দেখলে মনে হয় না, এ জীবন একেবারে নীরস ছিল। বহু প্রকার খেলাধুলার ব্যবস্থা বিহারে ছিল। বল ছোঁড়া, তীর চালানো, হাতি-ঘোড়ায় চড়া, রথ চালানো, কুস্তি, তরবারি চালানো, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হত। এছাড়া ভেঁপু বাজানো, পাশা খেলা, অন্যের ভঙ্গী নকল করা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও বৌদ্ধ সঙ্ঘে ছিল। মেয়েদের সঙ্গে নাচবার ও গাইবার প্রথাও অনুমোদিত ছিল বলে জানা যায়।

বুদ্ধদেব নারীদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধেই তিনি নারী শিষ্যা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সঙ্ঘে ভিক্ষুণী আশ্রয় পেলেও তাদের ভিক্ষুদের প্রাধান্য মেনে চলতে হত। নতুন ভিক্ষুণীদের বলা হত শিক্ষমানা। একজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুসঙ্ঘ-মনোনীত আর একজন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের শিক্ষা দিতেন। ভিক্ষুণীরা আজীবন সঙ্ঘে থেকে ভিক্ষুদের মতই ধর্মচর্চায় দিনপাত করতেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘের সাধারণ অনুশাসন এদের মেনে চলতে হত। এছাড়াও এদের আরও বারোটি বিশেষ নিয়ম পালন করতে হত। পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে থাকা, পুরুষ স্পর্শ করা, একা বেড়ানো, নদী পার হওয়া বিয়েতে ঘটকের কাজ করা, গুরুতর পাপ গোপন করা ভিক্ষুণীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষুণীদের জন্য ভিক্ষুণী-প্রতিমোক্ষ রচিত হয়েছিল। বহু ধনী পরিবারের কন্যা স্বেচ্ছায় ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ ক'রে সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন। বুদ্ধের অন্যতমা প্রধানা শিষ্যা থেরী ধর্মদিনা ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রে ধর্মশিক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের বিলুপ্তি ঘটে।

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় লৌকিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা না হলেও ভিক্ষুরা সুতাকাটা, কাপড়বোনা, দর্জির কাজ—এসব শিখত। অর্থাৎ মানুষের সমাজে বাস করবার পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলিকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরাও অস্বীকার করতে পারে নি।

তাই জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার মত কতকগুলি বৃত্তিশিক্ষাকে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রথম থেকেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বহু গৃহীও সঙ্ঘে শিক্ষার জন্য আসত। এরা শিক্ষা শেষ ক'রে যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত। এদের শিক্ষার জন্যও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ দেবার পরও কোন ভিক্ষুর পক্ষে গৃহীর জীবনে ফিরে যাবার পথে কোন বাধা ছিল না। অনেকেই সংসারে ফিরে যেত। ভর্তৃহরি সাত বার বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ দেন ও সাত বার ঘরে ফিরে যান। এই সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য বৌদ্ধসঙ্ঘে লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

প্রথম অবস্থায় সঙ্ঘগুলিতে শিক্ষা ভিক্ষু ও শ্রমণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধরা মনে করত দুঃখময় সংসারের রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে সংসার ত্যাগ ক'রে ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করা। শ্রমণের শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ় ক'রে গড়ে তোলবার জন্যই সঙ্ঘগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার ফলে ও ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের বাইরে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল। যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের ধর্মের নীতি শিক্ষা দেবার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুগণ পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এসব বিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্মের নীতিগুলি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য লেখাপড়াও শেখানো হত। বৌদ্ধধর্ম গণতান্ত্রিক হবার ফলে যেমন ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ সবাই লাভ করেছিল, তেমনি সঙ্ঘগুলির চেষ্টায় জনশিক্ষারও প্রসার হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই দেখা যায়, জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের জন্য বৌদ্ধভিক্ষুরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে। বৌদ্ধবিহারগুলিতেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রবেশ-অধিকার পেয়েছিল। এদের জন্যই প্রধানতঃ লৌকিক-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। শিক্ষা শেষ ক'রে এরা অনেকেই সরকারী কাজে নিয়োজিত হত। সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান দেশসমূহেও দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মসঙ্ঘ থেকে ভিক্ষুরা নবীন শিক্ষার্থীর নৈতিক জীবন গড়ে তোলবার ও সাধারণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করত। কিছুদিন পূর্বেও এ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, ভারতে বৌদ্ধসঙ্ঘগুলির অনুকরণেই সিংহল ও বার্মার বৌদ্ধমঠগুলি সাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। জনসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন ও ধর্মসঙ্ঘের জন্য নতুন সভ্য-সংগ্রহের জন্যও ভারতে প্রথম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধরা সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার মত প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আচার্য ও শিষ্যের ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিষ্যের চরিত্রগঠন ও শিক্ষা এগিয়ে চলত। কিন্তু ক্রমে বৌদ্ধবিহারগুলি বিরাট আকার ধারণ করায় ও বৌদ্ধশ্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিহারগুলিতে সমষ্টিবদ্ধভাবে যেসব শিক্ষার্থীরা থাকত, তাদের জন্য শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ক্রমে এই বিহারের বিদ্যালয়গুলিই কোন কোন জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির যুগে দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল। এসব বিহারে প্রাথমিক শিক্ষাই দেওয়া হত বলে মনে

হয়। এই বিহারগুলির শতকরা ১০ ভাগে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যেসব বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছিল, তার মধ্যে নালন্দা, বলভী ও বিক্রমশীলার খ্যাতি ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ভারতের বুক থেকে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধশিক্ষাব্যবস্থাও এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে গেলেও ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ আমাদের গৌরবের যুগ। সে যুগে নালন্দার মত সুগঠিত ও সুপরিচালিত এত বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা অনেকেরই কল্পনার বাইরে। বৌদ্ধযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি অনেক বেড়ে যায়। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতিভেদ ঘুচিয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার সবার জন্য মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। ভারতে জনশিক্ষার ব্যবস্থা বৌদ্ধদেরই অবদান। বৌদ্ধযুগে প্রথম অবস্থায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় আঞ্চলিক ভাষাসমূহের গুরুত্ব বেড়ে যায়। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৌদ্ধশিক্ষায় সংস্কৃতই গৃহীত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধদার্শনিকদের রচনায় সংস্কৃত ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়। বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ও বিতর্কের ফলে হিন্দু তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের প্রভূত উন্নতি হয়। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, সে-সব দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও সে-সব দেশ থেকে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী আসবার ফলেই সৃষ্ট হয়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র

প্রাচীন ভারতে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্র শিক্ষালাভ করত। শিক্ষা ছিল সে যুগে মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। সারাদেশব্যাপী তপোবনে বা গুরুর আশ্রমে তরুণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করত। তপোবনের ছাত্রসংখ্যা সাধারণতঃ হত পরিমিত। কখন কখন কোন খ্যাতনামা ঋষির আশ্রমে বহু শিক্ষার্থী সমবেত হত। সেখানে অবশ্য ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দু'রকম শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যেত। তপোবনকে কেন্দ্র ক'রেই বৈদিক যুগে ভারতে এক গৌরবময় শিক্ষার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। বর্তমান যুগের মত বা নালন্দা বিক্রমশীলার মত কোন সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বৈদিক যুগে ছিল না। কিন্তু নৈমিষারণ্য, ভরদ্বাজ আশ্রম, কণ্বমুনির আশ্রম, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানতপস্বীরা এসে সমবেত হওয়ায় এসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পেয়েছিল। পুরাণে কণ্বমুনির আশ্রমকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রমে রাজন্যবর্গের পুত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নৈমিষারণ্যের আশ্রমকে পুরাণযুগের বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানকার কুলপতি ছিলেন শৌনক। তাঁর দশ হাজার শিষ্য ছিল বলে জানা যায়।

পরিষদ—প্রাচীন যুগে পরিষদ বা জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। পরিষদগুলি জটিল সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসা করত। পরিষদের গঠন সম্পর্কে শাস্ত্রকারগণ বহুরূপ নির্দেশ দিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যাদের নিয়ে পরিষদ গঠিত হত, তারা অধিকাংশই ছিলেন অধ্যাপক। জনসাধারণের সমাজ-জীবনে কোন সামাজিক আচরণ বা ধর্মীয় আচরণের কোন বিষয়ে সঙ্কট দেখা দিলে বা শিক্ষা-সম্পর্কীয় কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিষদেই তার মীমাংসা হত। বেদের ও হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ ছাড়াও শিক্ষার্থীরাও পরিষদের সদস্য হতেন। পরিষদে বহু জ্ঞানীজনের সমাবেশ হত বলেই জিজ্ঞাসু ছাত্ররাও নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের জন্য পরিষদের অধিবেশনে সমবেত হত। এইভাবে পরিষদগুলি শিক্ষাকেন্দ্ররূপেও খ্যাতিলাভ করে।

যজ্ঞ সভায় ও পরিষদে ধর্ম, দর্শন, সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিদ্বৎ-সমাজের আলোচনা অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে জানা যায়, শ্বেতকেতু পাঞ্চাল দেশের এক পরিষদে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ম্যাক্সমূলার পরিষদের গঠন সম্পর্কে বলেছেন—আধুনিক শাস্ত্রকারদের মতে ২১ জন ব্রাহ্মণ নিয়ে পরিষদ গঠিত হত। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ব্রাহ্মণরাই পরিষদের সদস্য হতেন। প্রথম যুগে পরিষদের সদস্যসংখ্যা আরও কম ছিল বলে মনে হয়।

গৌতম বলেন, পরিষদ দশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন বলেছেন, সদস্যদের মধ্যে চার জন চার বেদ সম্পর্কে পারদর্শী হবেন। এক জন হবেন মীমাংসার ছাত্র, এক জন বেদাঙ্গে পারদর্শী, এক জন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ এবং তিন জন ব্রাহ্মণদের তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধি। প্রাচীন যুগে দশ জন সদস্য নিয়ে পরিষদগঠনের নির্দেশ থাকলেও জরুরী অবস্থায় সদস্যসংখ্যা আরও কম হলেও চলত। কোন কোন গ্রামে বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক তিন বা চারজন ব্রাহ্মণ থাকলেও তাদের নিয়ে পরিষদগঠনের নির্দেশ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সব পরিষদের আলোচনায় ও পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচনায় ছাত্রগণ অংশ গ্রহণ করত। মধ্য যুগে ইউরোপে এরকম বিদ্বৎ-সমাজের প্রতিষ্ঠানই ক্রমে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছিল, ভাবতেও পরিষদের মত প্রতিষ্ঠানে—যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখার অধ্যাপকরা সমবেত হতেন, তার মধ্যেই আদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল বলে মনে হয়।

॥ আদি শিক্ষাকেন্দ্র ॥

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে ও প্রধান প্রধান নগরীতে যেখানে রাজা বা বিত্তবানরা গুণীজনের সমাদর করতেন ও আর্থিক সাহায্য দান করতেন, সেখানে বিদ্বৎ-জনের সমাবেশ হত। বহু বিদ্যার্থী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশের ফলে এসব শহর শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। এইভাবে উত্তর ভারতে তক্ষশীলা, পাটলীপুত্র, কনৌজ, মিথিলা ও দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর, কল্যাণী প্রভৃতি স্থান শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। সে যুগে রাজধানী ছাড়া তীর্থক্ষেত্রেও বহু পুণ্যকামী পণ্ডিতের সমাবেশ হত। তীর্থযাত্রীদের দানে পণ্ডিতদের ভরণপোষণে বিশেষ অসুবিধা হত না। এদের কাছ থেকে জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যার্থীরা তীর্থক্ষেত্রে এসে সমবেত হত। এইভাবে বারাণসী, কাঞ্চি, নাসিক প্রভৃতি তীর্থস্থান জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে।

ভারতে বিদ্যোৎসাহী রাজাদের চেষ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। রাজার অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের মধ্যে পণ্ডিত-পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অন্যতম। রাজারা পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ স্থাপন করতেন। পণ্ডিতদের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁদের গ্রাম দান করা হত। এসব গ্রামকে বলা হত "অগ্রাহার গ্রাম"। পণ্ডিতরা নিষ্কর জমির সত্ত্ব উপভোগ করতেন। পণ্ডিতদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যার্থীরা আসত, এভাবে এইগুলিও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। বৌদ্ধসঙ্ঘ এবং হিন্দুমঠ ও মন্দিরে ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চাও হত। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে তক্ষশীলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলা জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চায় এতদূর খ্যাতি অর্জন করেছিল যে, ভারতের দূর দূর প্রান্ত থেকে ও ভারতের বাইরে থেকে জ্ঞান-তপস্বীরা এখানকার আচার্যদের নিকট শিক্ষার জন্য আসত। বৌদ্ধ যুগে সুদূর জাভা, চীন, কোরিয়া থেকেও ছাত্ররা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্ঞানলাভের জন্য আসত। বহিরাগত ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষার গৌরবময় যুগের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পাই।

।। তক্ষশীলা ।।

প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের মধ্যে তক্ষশীলা হচ্ছে প্রাচীনতম। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। ভরত এই নগরীর প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর পুত্র তক্ষকের নামানুসারে এই নগরীর নামকরণ করেছিলেন বলে রামায়ণে উল্লেখ আছে। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ নাকি এখানেই হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকেই তক্ষশীলা শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বলে তক্ষশীলা নগরীকে বহুবার ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আলেকজাণ্ডার, পারসিক, ব্যাক্টি_যান, গ্রীক, শক, হুণ প্রভৃতি বহু বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে তক্ষশীলার বারবার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে। প্রতিবারই বিধ্বস্ত নগরী নতুন ক'রে নতুন জায়গায় তৈরি হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তক্ষশীলা পারস্য-অধিকারভুক্ত ছিল। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে তক্ষশীলাকে গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্ত একে মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে আনেন। পরে ব্যাক্টি_য়ান গ্রীকগণ এখানে প্রাধান্য বিস্তার করে, এরপর এখানে কুষাণগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। হুণ আক্রমণের ফলেই তক্ষশীলার পতন হয়।

বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে যেমন নগরীর স্থান পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে এখানকার সংস্কৃতির ধারার রূপান্তর হয়ে ভারতের বুকে এক নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। পারসিকগণের অধিকারে থাকাকালীন তক্ষশীলায় জাতীয় ব্রাহ্মী লিপির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা খরোষ্টী লিপিতে লেখা শুরু হয়। গ্রীক প্রভাবে গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্য গঠিত হতে থাকে। গ্রীক শিল্পরীতির প্রভাবে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত গান্ধার-শিল্পের উদ্ভব হয়।

প্রাচীন তক্ষশীলার গৌরবময় ইতিহাস জানবার মত উপাদান আমাদের খুবই কম আছে। বৌদ্ধজাতক ও অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকেই আমরা প্রধানতঃ তক্ষশীলার ইতিহাস জানতে পারি। রামায়ণ-মহাভারতেও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশীলার উল্লেখ আছে। গ্রীক বিবরণ থেকেও তক্ষশীলার খ্যাতির কথা জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠলেও বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্ররূপেও তক্ষশীলা খ্যাতি লাভ করে।

বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডির কুড়ি মাইল পশ্চিমে সরাইকালা স্টেশনের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রায় বারো বর্গ মাইল স্থান জুড়ে প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের চেষ্টায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ খনন করা হয়। খনন করবার ফলে তিনটি নগরীর চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। বারবার বৈদেশিক আক্রমণে নগর ধ্বংস হবার ফলে নতুন ক'রে নগরী তৈরী করতে হয়েছিল বলেই তিনটি নগরীর চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নালন্দা মহাবিহারের মত কোন স্তূপ বা বহু সংখ্যক ছাত্রের স্থান ধারণের মত কোন অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয়, তক্ষশীলায় কোন কেন্দ্রীয়-মহাবিদ্যালয় ছিল না। প্রখ্যাত অধ্যাপকমণ্ডলীর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীরা এখানে আসত ও বিভিন্ন গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করত। শিক্ষকরা এখানে ব্যক্তিগত-

ভাবে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষকরা কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন না—তাঁরা নিজেরাই ছিলেন এক-একটি প্রতিষ্ঠান। কোন কোন গুরুর অধীনে পাঁচশ' পর্যন্ত ছাত্র ছিল বলে জানা যায়। একজনের পক্ষে এত ছাত্র পড়ানো সম্ভব ছিল না, তাই অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছাত্ররা নবাগতদের শিক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি গ্রহণ করত। গুরুকে এভাবে সাহায্য করবার প্রথা থেকেই পরবর্তী কালে "সর্দার পড়ো" প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়।

তক্ষশীলার ছাত্রদের মধ্যে বহু প্রতিভাধর ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণিক পাণিনি, অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য, বুদ্ধের সমসাময়িক ও বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক, কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন।

তক্ষশীলার অধ্যাপক ও অধ্যাপনার খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় ভারতের সুদূরতম প্রান্ত থেকে পথের বিপদ ও কষ্টকে তুচ্ছ ক'রে শিক্ষার্থীরা এখানে আসত। রাজগৃহ, মিথিলা, কোশল, বারাণসী প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রে ছাত্ররা এখানে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসত। সেই যুগে তক্ষশীলাই ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। এখানে শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ ষোল বছর বয়সে আসত এবং আট বছর এখানে শিক্ষা গ্রহণ করত। তক্ষশীলায় ছিল আবাসিক বিদ্যালয়। তবে গুরুর কাছে না থেকে বাইরে থেকে এসেও পড়া যেত। সবাই গুরুগৃহে থাকত না। অনেক ছাত্র নিজেরাই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে গুরুগৃহে এসে পাঠ নিত। ব্রহ্মচারী ছাড়া বিবাহিতেরাও এখানে পড়ত। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—সব সম্প্রদায়ের ছেলেরা একসঙ্গে একই গুরুর অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করত। ছাত্রদের সঙ্গে গুরুর ব্যবহারে কোন ইতরবিশেষ ছিল বলে জানা যায় না। এদিক থেকে তক্ষশীলার শিক্ষা গণতান্ত্রিক ছিল বলা যায়। সব সম্প্রদায়ের লোকরা এখানে পড়তে পেলেও চণ্ডালদের পড়ার অধিকার ছিল না। একবার দু'জন চণ্ডাল ছদ্মবেশে ছাত্র হয়ে এসে পড়া শুরু করে। পরে ধরা পড়ে গিয়ে বহিষ্কৃত হয়।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, কিন্তু তক্ষশীলায় বিত্তবান শিক্ষার্থীরা শিক্ষাব্যয়ের জন্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গুরুকে দিয়ে পড়া শুরু করত। তক্ষশীলায় এভাবে গুরুকে আগ্রম গুরুদক্ষিণার দেবার প্রথা ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটু অভিনব। এই টাকায় ছাত্রের থাকা, খাওয়া, বেশবাস প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হত। যাদের অর্থ ছিল না, তারাও ফিরে যেত না। তারা শ্রমমূল্য গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিক্ষালাভ করত। দিনের বেলা গুরুর সংসারে যাবতীয় কাজকর্ম করে, রাতে অবসর সময়ে গুরুর কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করত। শিক্ষার জন্য কোন অর্থই তাদের দিতে হত না। সেই যুগেও কোন কোন ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসত। এছাড়া, অনেক সময় গ্রামের লোকরা সমবেতভাবে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে অর্থ সাহায্য করত, অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করত।

তক্ষশীলার ছাত্রদের জীবন অতি সাধারণভাবে অতিবাহিত হত। রাজপুত্র বা ধনী পুত্র কারও জীবনে কোন বিলাসিতা বা অমিতব্যয়িতার সুযোগ ছিল না।

গুরুকে দেবার অগ্রিম সহস্র মুদ্রাকে সম্বল ক'রেই অধিকাংশ সময় ধনী বা রাজপুত্ররা এখানে আসত। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁর ষোল বছর বয়স্ক রাজকুমারকে গুরুদক্ষিণা সহস্র মুদ্রা, একটি ছাতা, একজোড়া জুতা সম্বল ক'রে তক্ষশীলায় পাঠিয়েছিলেন। এখানে ধনী-দরিদ্রের সঙ্গে গুরুর ব্যবহারের কোন পার্থক্য ছিল না। জাতক থেকে জানা যায়, অপরাধ করলে সকলকেই শাস্তি পেতে হত। অর্থের বিনিময়ে যারা শিক্ষা গ্রহণ করত, তাদের জন্য কোন সুবিধার ব্যবস্থা বা নিয়ম-শৃঙ্খলার সম্পর্কে কোন শিথিলতার সুযোগ ছিল না। বিত্তজনের পুত্রেরা অর্থ দিয়ে পড়লেও তাদের হাতে নিজেদের ব্যয়ের জন্য কোন অর্থ থাকতো বলে মনে হত না। একবার এক রাজপুত্র এক ব্রাহ্মণের ভিক্ষাপাত্র ভেঙ্গে ফেলার পর তাকে ভিক্ষা-পাত্র সংগ্রহ ক'রে দিতে পারে, এমন পয়সাও ছিল না। শিক্ষাশেষে ছাত্ররা গুরুদক্ষিণা দিত। পাণিনি গুরুকে গোদানের কথা বলেছেন। মনে হয়, শিক্ষাশেষে গুরুদক্ষিণারূপে গোদান-প্রথা প্রচলিত ছিল।

তক্ষশীলার কৃতী ছাত্রদের আমরা যেরূপ পাণিনি, চাণক্য, জীবক প্রভৃতির নাম পাই, সেখানকার বিখ্যাত অধ্যাপকদের সেরূপ নাম পাওয়া যায় না। মহর্ষি আত্রেয় জীবকের গুরু ছিলেন। অধ্যাপকদের গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হত। এছাড়া, চাণক্য শিষ্ট, দণ্ডনীতিক প্রভৃতি নাম পণ্ডিতদের জন্য ব্যবহার করেছেন। পাণিনি আচার্যা, উপাধ্যায়া প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করায়, মনে হয়, নারীরা শিক্ষকতা করতেন। সাধারণভাবে একজন অধ্যাপক ২০ জন ছাত্র গ্রহণ করতেন। কোন কোন গুরুর অধীনে ৫০০ পর্যন্ত ছাত্র থাকত বলে জানা যায়। এ সংখ্যার সত্যতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে একা গুরুর পক্ষে পড়ানো সম্ভব হত না, ছাত্ররা গুরুকে সাহায্য করতেন। এদের বলা হত, পিথি আচারিয়া, ভারতে সর্দার-পোড়ো প্রথা এভাবেই শুরু হয়। আচার্যের উপযুক্ত পুত্র পিতাকে শিক্ষকতা-কার্যের সহায়তা করতেন। এখানে পরীক্ষার কোন প্রথা ছিল বলে জানা যায় না। এখানকার ছাত্রদের কোনরূপ উপাধিও দেওয়া হত না।

অতি প্রত্যূষে কুক্কুটের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু হত। তক্ষশীলায় আবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। বারবার আবৃত্তি ক'রে অধীত বিদ্যাকে আয়ত্ত করা হত। গুরু কঠিন অংশের ব্যাখ্যা ক'রে দিতেন। লিপির ব্যবহার ছিল। মৌখিক পদ্ধতির সঙ্গে এখানে পুঁথিরও ব্যবহার ছিল। মুখস্থ করতে গিয়ে কোন অংশ বাদ পড়ে গেলে পুঁথি দেখে সে অংশ ঠিক করে নেওয়া হত।

তক্ষশীলার পাঠ্যসূচী ছিল বিরাট ও ব্যাপক। জাতক থেকে জানা যায়, এখানে তিনটি বেদ ও আঠারটি কলাবিদ্যা শেখানো হত। অথর্ববেদকে পাঠের মধ্যে ধরা হত না। বেদ ছাড়া বেদের আনুষঙ্গিক বেদাঙ্গ ও বিভিন্ন দর্শন এখানে পড়ানো হত। রাজপুত্রেরা সমরবিদ্যা ও রাজাশাসনকার্যে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য নানাবিধ বিদ্যাচর্চা করতেন। তক্ষশীলা ছিল বিশেষজ্ঞ হবার স্থান—তাই শিক্ষার্থীর নিজ নিজ রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় এখানে পড়ানো হত। তাছাড়া, হস্তীসূত্র, পশু-চিকিৎসা,

মায়া-বিদ্যা, সঞ্জীবনী-বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি নানা লৌকিক বিদ্যাশেখার সুযোগ এখানে ছিল।

সমরবিদ্যা, নিধি ও চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য এখানে বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল। সমরবিদ্যা শেখবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষত্রিয়রা এখানে আসত। একটি বিদ্যালয়ের সমরবিদ্যা শেখাবার খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, একই সময়ে ১০৩ জন রাজপুত্র শিক্ষার জন্য সমবেত হয়েছিল। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্যশিল্পও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রীক আক্রমণের পর গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে এখানে গান্ধার-রীতির শিল্পকলার উদ্ভব হয়। পাণিনির বিবরণ থেকে মনে হয়, এখানে অভিনয়শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্যই তক্ষশীলা সমধিক বিখ্যাত ছিল। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারতের সব অঞ্চল থেকে ছাত্র আসত বলে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করেছিল। একে সংগঠিত-বিশ্ববিদ্যালয় (Organised University) না বলে স্বাভাবিক বিশ্ববিদ্যালয় (University of natural growth) বলা যায়।

খৃষ্টীয় শতক শুরু হবার পর থেকেই তক্ষশীলার খ্যাতি কমতে থাকে। তক্ষশীলার গৌরবের যুগ অবসানের পরও মনে হয় কুষাণ বংশের রাজত্বের শেষ অবধি (২৫০ খ্রীঃ) শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশীলার খ্যাতি ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ফা-হিয়ান যখন তক্ষশীলায় যান, তখন শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গৌরব করবার মত কোন বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট ছিল না। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বর্বর হুন আক্রমণের ফলে তক্ষশীলার শেষ সমাধি রচিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্‌ তক্ষশীলায় গিয়ে অতীত গৌরবের স্মৃতি বিজড়িত তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপই দেখেছিলেন।

॥ বারাণসী ॥

ভারতের প্রাচীনতম তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে বারাণসী অন্যতম। অতীত ভারতের স্মৃতিকে বহন ক'রে যে কয়েকটি শহর আজও অগণিত ভারতবাসীর কাছে পরম পুণ্যতীর্থ বলে পূজিত, বারাণসী তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বৈদিক যুগে ও বৈদিক সাহিত্যে বারাণসী তীর্থক্ষেত্র বা শিক্ষাকেন্দ্র বলে উল্লিখিত হয়নি। বেদের আদি যুগে আর্যগণের আধিপত্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। উপনিষদের যুগ থেকেই বারাণসী হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। বারাণসীর রাজা অজাতশত্রু উপনিষদে দার্শনিক বলে উল্লিখিত হয়েছেন। তবে যতদিন পর্যন্ত তক্ষশীলার খ্যাতি ছিল, ততদিন বারাণসী সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এখানে যে-সব আচার্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তারা তক্ষশীলারই ছাত্র।

প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বলে বারাণসীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মগুরু ও জ্ঞানী দার্শনিকেরা আসতেন। তাঁদের দর্শন ও তাঁদের কাছ থেকে উপদেশলাভের জন্য বহু লোকের সমাগম এখানে হত। এমনিভাবে বহু জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসুর মিলনক্ষেত্র বারাণসী একটি শিক্ষাকেন্দ্রেও পরিণত হয়। এখানে তক্ষশীলার মত বেদ, উপনিষদ ও

বহুবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হত। তক্ষশীলার মত প্রসিদ্ধি লাভ না করলেও খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে বারাণসীই পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বুদ্ধদেব বারাণসীর উপকণ্ঠস্থ সারনাথ থেকেই ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেছিলেন। বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও বারাণসীর প্রসিদ্ধি ছিল। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সারনাথবিহার বিখ্যাত বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে দেড় হাজার বৌদ্ধশ্রমণ ও ভিক্ষু বাস করতেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা সাধারণ বৌদ্ধদের তীর্থক্ষেত্র ও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর ও বেনারস ছিল হিন্দুদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। সে যুগে দার্শনিক ও ধর্মগুরুরা তাঁদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বারাণসীকেই কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করতেন। এখানকার পণ্ডিত সমাজের স্বীকৃতি না পেলে কোন মতবাদ সমাজে গৃহীত হত না। আচার্য শঙ্করের ন্যায় অদ্বিতীয় দার্শনিকেরও তাঁর অদ্বৈত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কাশীর স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, ভক্ত কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি সকলেই কাশীতে নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কুতুবুদ্দীন কাশীর বহু মন্দির ধ্বংস ক'রেন। এই সময়ে কাশীর পণ্ডিত সমাজের একটা প্রধান অংশ দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দাক্ষিণাত্য মুসলিম শাসনাধীনে চলে যাবার পর হিন্দু পণ্ডিতগণ আবার কাশীতে ফিরে আসেন ও কাশীর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ভারতে বহু রাজা ও রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়েছে। এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে বারাণসী আজও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাকে বহন ক'রে নিজ খ্যাতিকে অম্লান রেখেছে।

বারাণসীর শিক্ষাপ্রচেষ্টা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিভিন্ন পণ্ডিতের গৃহে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করত। কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত না। একজন গুরুর অধীনে ৫।৬ জন থেকে ১২।১৪ জন শিষ্য থাকত।

প্রসিদ্ধ পর্যটক ও ঐতিহাসিক আলবেরুণী একাদশ শতাব্দীতে বারাণসীকে সুবিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্নিয়ার বারাণসী সম্পর্কে বলেছেন :

"The town of Benares............ is the general school and as it were, the Athens of the gentry of the Indies, where Brahmans and the Religious come together. They have no colleges nor classes ordered as with us ; methinks, it is more after the way of the ancients, the masters being dispersed over the town in their houses and especially in the gardens of the suburbs of these masters, some have four disciples, other six or seven and most famous twelve or fifteen at most, who spend ten or dozen years with them."

(As quoted by K. S. Vakil)

॥ নবদ্বীপ ॥

মধ্যযুগে নবদ্বীপ পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বলে খ্যাতি লাভ করে। নবদ্বীপের এই খ্যাতি আধুনিক কাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ভাগীরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমে নবদ্বীপ অবস্থিত। সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে গৌড়ের রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ন্যায়, মীমাংসা ও স্মৃতির উপর গ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দ-রচয়িতা, জয়দেব, পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ী ও উমাপতি প্রভৃতি কবিরা তাঁর সভা অলংকৃত করেন। এছাড়া, স্মৃতি-বিবেকের লেখক শূলপানি তাঁর রাজসভায় ছিলেন। বক্তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ আক্রমণ করলে লক্ষ্মণসেন পালিয়ে গিয়ে বিক্রমপুরে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভারতে মুসলিম শাসনকালেও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে নবদ্বীপের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

মধ্যযুগে মিথিলা ছিল নব্যন্যায়ের প্রধান কেন্দ্র। মিথিলার পণ্ডিতগণ মিথিলার বাইরে যাতে নব্যন্যায় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠতে না পারে, সেজন্য ছাত্রদের কোন পুঁথি বা টীকা লিখে নিয়ে যেতে দিতেন না। মিথিলার বাইরে নব্যন্যায় পড়বার উপযুক্ত কেন্দ্র না থাকায় সবাই নব্যন্যায় পড়তে মিথিলায় যেতে বাধ্য হত। নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকট নব্যন্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে নবদ্বীপে এসে নব্যন্যায় অধ্যাপনার জন্য টোল স্থাপন করেন। তিনি মিথিলার সুকঠিন শলাকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শোনা যায়, তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, তিনি ন্যায়শাস্ত্রের ভাগ অধিকাংশ মুখস্থ করে নিয়ে আসেন। বাসুদেবের বহু ছাত্রের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, গদাধর ভট্টাচার্য নবদ্বীপে টোল স্থাপন ক'রে ন্যায় ও স্মৃতির চর্চা অব্যাহত রাখেন। রঘুনাথ শিরমণি পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে পরাজিত ক'রে নবদ্বীপকে নব্যন্যায়ের উপাধিদানের কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি দিধীতি নামে নব্যন্যায়ের গ্রন্থ ও গৌতমসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপের, তথা সারা বাংলার, গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। অতি অল্প বয়সেই টোলের পাঠ সমাপ্ত ক'রে তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি টোলে একশ' টাকা বৃত্তি দিতেন। অধ্যাপকরা বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দান পেতেন। এছাড়া, স্থানীয় বিত্তবান লোকেরাও টোলে সাহায্য করত। নবদ্বীপে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আবাসিক। শিক্ষার্থীদের আহার ও বাসস্থানের জন্য কোন অর্থ দিতে হত না। এখানকার টোলে প্রধানতঃ ন্যায়ের অধ্যাপনা হলেও ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপনাও হত। বেদ-বেদাঙ্গ ষড়দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে ছিল। জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষার জন্যও এখানে টোল ছিল। আলোচনা ও তর্কযুদ্ধ এখানে প্রায়ই হত। কূটপ্রশ্নে ও চুলচেরা বিচারে প্রতিপক্ষকে নির্বাক ক'রে দেওয়াই ছিল শিক্ষার্থীমাত্রের একমাত্র বাসনা। নদীয়ার শিক্ষার্থীদের বয়সের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। মধ্যবয়স্ক, এমনকি, পক্বকেশ ব্যক্তিরা পর্যন্ত টোলে পড়তেন।

নবদ্বীপে উচ্চশিক্ষার জন্য বহু টোল ছিল। এডামের রির্পোট থেকে জানা যায়, ১৮২১ খ্রীঃ মিঃ উইলসন নদীয়ায় ২৫টি টোল দেখেছেন। এসব টোলে খড়ের ঘরে ছাত্ররা পড়াশুনা করত। তারই সংলগ্ন দু'তিন সারি মাটির ঘর, সেখানে ছাত্ররা থাকত। অধ্যাপক এসব ঘর তৈরি ও সংস্কারের ব্যবস্থা করতেন। নদীয়ার রাজা ও বিত্তবানদের থেকে যা বৃত্তি পাওয়া যেত, তা দিয়েই এসব হত। থাকা, খাওয়া, বেশভূষা সব কিছুর ব্যবস্থাই অধ্যাপকরা করতেন। ছাত্ররা এজন্য কোন অর্থ দিত না। প্রধান প্রধান উৎসবের সময় ছাত্ররা কিছুদিনের জন্য পাঠে বিরতি দিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়ত। এসব উৎসব উপলক্ষে যেসব তীর্থযাত্রীরা আসত, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা যা পাওয়া যেত, তা দিয়ে বেশ কিছুদিন চলত।

এক-একটি টোলে ২০।২৫ জন ছাত্র পড়ত। অধ্যাপক যদি খুব খ্যাতিসম্পন্ন হতেন, তা' হলে ৫০।৬০ জন পর্যন্ত তাঁর টোলে জড় হত। সেই সময় নদীয়ায় উচ্চ-শিক্ষার জন্য ৫০০।৬০০ জন শিক্ষার্থী ছিল। ছাত্ররা অধিকাংশই বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এলেও ভারতের দূরতম প্রান্ত থেকেও ছাত্র এখানে শিক্ষার জন্য আসত। বাইরের ছাত্রদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের ছাত্রই ছিল সর্বাধিক। এছাড়া, আসাম, নেপাল ও ত্রিহুত জেলা থেকে ছাত্ররা আসত। ইংরেজ-যুগ শুরু হবার পরও নদীয়ার অধ্যাপকরা অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রেও নদীয়ার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা এদেশে চালু হবার পর দেশের লোকের সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে।

।। মিথিলা ।।

হিন্দু-শিক্ষাক্ষেত্ররূপে নবদ্বীপ অপেক্ষা মিথিলার খ্যাতি প্রাচীনতর। অতি প্রাচীনকালে মিথিলার রাজা জনকের সভাস্থলে বহু ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির সমাবেশ হত। মিথিলা একটি প্রাচীন শিক্ষাধারাকে বহন ক'রে মধ্যযুগে পূর্বভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। এখানে নব্যন্যায়ের খ্যাতি ছিল ভারত-জোড়া। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা বিদ্যাপতি, নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গংগেশ উপাধ্যায়, তাঁর পুত্র বর্ধমান, পক্ষধর মিশ্র, বর্তমান দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশঠক্কুর প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্যার্থীরা মিথিলায় এসে সমবেত হত। মিথিলার শেষ পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এখানকার শলাকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীকে উপাধি দেওয়া হত। নবদ্বীপে নব্যন্যায় পড়ানো শুরু হলে মিথিলার গৌরব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়।

।। নালন্দা ।।

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে নালন্দাই সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন। নালন্দার খ্যাতি ভারতের সীমা পার হয়ে সুদূর তিব্বত, চীন, কোরিয়া, সুমাত্রা, জাভা

প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়েছিল। তক্ষশীলা ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কোন কেন্দ্রীয় সংগঠনের দ্বারা তার কর্মধারা বা শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত না। আধুনিক যুগে সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত, পরিচালনা ও ব্যবস্থার দিক্ থেকে তার তুলনা সে যুগের নালন্দার সঙ্গেই করা চলে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি বর্বরোচিতভাবে সেই যুগের এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করে। তার পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাযান-মত প্রভাবিত বৌদ্ধ-জগতের ছাত্ররা বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ ও যাবতীয় প্রশ্ন ও সংশয়-নিরসনের জন্য এখানে সমবেত হত। নালন্দা মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হলেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। নালন্দার পাঠ্যসূচী আলোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন সমভাবে পঠিত ও আলোচিত হত। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নালন্দা একটি গৌরবময় নাম। পরিচালনা, অধ্যাপনা, অধ্যাপক—সব দিক্ থেকেই নালন্দা ছিল সে-যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিও এখানে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি এখানকার প্রখ্যাত অধ্যাপকদের প্রতি স্বতঃ-উৎসারিত শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এঁদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছি। তা নাহলে কোনক্রমেই এ জ্ঞান আমি অর্জন করতে পারতাম না।" *(I have alwas been very glad that I had the opportunity of acquiring knowledge personally from them which I should otherwise have never possessed ")* *(I-Tsing as quoted by Keay)*

পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনা) ৪০ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের ৭ মাইল উত্তরে বর্তমান পাটনা জেলার বিহারশরীফ মহকুমার বড়গাঁও-এর কাছে এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রাচীন নালন্দা অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের বহুস্মৃতি-বিজড়িত প্রাচীন রাজগৃহ থেকে নালন্দা মাত্র ৭ মাইল দূরে হওয়ায় যাতায়াতের পথে বুদ্ধ প্রায়ই এখানে এক আম্রবনে বিশ্রাম করতেন। বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্তের জন্মভূমি নালন্দা। কথিত আছে, একসময় বুদ্ধদেব এখানে লেপ নামে এক বণিকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। স্থানীয় শ্রেষ্ঠীসঙ্ঘ একটি বিহার নির্মাণের জন্য বহু অর্থব্যয়ে এখানকার জমি কিনে বুদ্ধদেবকে দান করেছিলেন। সম্রাট অশোক সারিপুত্তের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এখানে একটি চৈত্য নির্মাণ করেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন (আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ) নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব (আনুমানিক ৩২০ খ্রীঃ) সম্ভবতঃ এখানকার ছাত্র ছিলেন। একথা সত্য হলে বলতে হয়, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। অথচ ৪১০ খ্রীঃ ফা-হিয়ান যখন নালন্দায় যান, তখন নালন্দার শিক্ষাকেন্দ্ররূপে কোন খ্যাতি ছিল না।

নালন্দার নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ফাহিয়ান নালন্দাকে 'নাল' নামে অভিহিত করেছেন। ই-ৎসিঙ্ বলেন, নালন্দা মহাবিহারের পার্শ্ববর্তী নাগানন্দ সরোবরের নাম থেকে এর নাম নালন্দা হয়েছে। হিউয়েনসাঙ বলেন, বুদ্ধদেব পূর্বতন বোধিসত্ত্ব জীবনে এক সময় অবিশ্রান্ত দান ক'রে ন-অলম্-দা (অবিশ্রান্ত দাতা) এ অর্থে 'নালন্দা' উপাধি লাভ করেন। সেই নাম থেকেই এই মহাবিহারের নাম হল নালন্দা।

বৌদ্ধ তীর্থরূপে নালন্দা বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকেই বহু তীর্থযাত্রীর আকর্ষণের স্থান হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে এটি শুধুমাত্র তীর্থক্ষেত্ররূপেই খ্যাত ছিল। ফা-হিয়ান এখানে তীর্থযাত্রীরূপেই বোধ হয় এসেছিলেন। তাঁর পরবর্তী চৈনিক-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খ্রীঃ থেকে ৬৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। তাই মনে হয়, ফাহিয়ানের ভারত ত্যাগের (৪১৪ খ্রীঃ) পর থেকে হিউয়েন সাঙের আগমনের (৬২৯ খ্রীঃ) মধ্যে নালন্দা দ্রুত শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে মহাযান-বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে।

নালন্দার দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ গুপ্তরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা। গুপ্তবংশের রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, কিন্তু নালন্দার উন্নতির জন্য তাঁরা অকুণ্ঠভাবে অজস্র অর্থব্যয় করেছেন। অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ হয়েও হিন্দুধর্মের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। হিন্দু গুপ্তরাজদের অর্থানুকূল্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা গড়ে ওঠে। ধর্ম সম্পর্কে উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় দেশসমূহে ও নিকট-প্রাচ্যে ধর্ম নিয়ে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহ হয়েছে, তার সঙ্গে তুলনা করলেই ভারতের পরধর্ম ও পরমতসহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় সম্রাটদের মহানুভবতাকে আমরা সঠিক উপলব্ধি করতে পারব।

সম্রাট শক্রাদিত্যের (মনে হয়, ইনিই প্রথম কুমার গুপ্ত) সময় থেকেই নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির সূচনা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মঠটি তিনিই স্থাপন করেন। তারপর তথাগত গুপ্ত (এঁর পরিচয় সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি), নরসিংহ গুপ্ত, বালাদিত্য ও বুধগুপ্ত একটি ক'রে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বালাদিত্যের উত্তরাধিকারী বজ্র পঞ্চম বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। অপর বিহারটি মধ্য-ভারতের কোন রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান করেন, মহারাজ হর্ষই এই শেষ বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও দানে নিত্যনতুন অংশ সংযোজিত হবার ফলে নালন্দা-মহাবিহার আয়তনে বিস্তার লাভ ক'রে এক বিরাট আকার ধারণ করে।

বর্তমান নালন্দার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অতীত গৌরবের স্মৃতিবিজড়িত যে-সব ঢিপি রয়েছে, তার বেশীর ভাগ অংশই খনন করা হয়নি। খনিত অংশ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল সমীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এক মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থ ব্যাপী এলাকায় বিস্তৃত ছিল। ভিক্ষুদের বাসস্থান ও তৎসন্নিহিত স্তূপসমূহ একই সারিতে যেভাবে রয়েছে, তা দেখে মনে হয়, যদিও নালন্দা কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে

ধীরে গড়ে উঠেছে, তবুও এই সৃষ্টির পিছনে একটা পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল। নালন্দার কেন্দ্রীয় কলেজ সংলগ্ন সাতটি বড় বড় হলঘর ছিল। এছাড়া ৩০০টি ছোট কক্ষে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন প্রায় ১০০ বক্তৃতার ব্যবস্থা এখানে থাকত। নালন্দার অট্টালিকাসমূহের আকাশছোঁয়া চূড়ার বর্ণনা পড়লে মনে হয় নালন্দার মন্দির, কলেজ ও বিহারগুলি যথেষ্ট উঁচু ছিল। নালন্দায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সর্বোচ্চ যে সৌধটি পাওয়া গিয়েছে, তার উচ্চতা থেকে মনে হয় নালন্দায় বহু সু-উচ্চ সৌধ নির্মিত হয়েছিল। নীলপদ্ম ও স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরসমূহ নালন্দার জল ও ফুলের অভাব ঘোচাত। নালন্দায় বর্তমানে পালি ভাষার গবেষণার জন্য যে মহাবিদ্যালয়টি হয়েছে তারই পাশে যে বৃহৎ জলাশয়টি রয়েছে, সেখানে আজও অজস্র শ্বেত পদ্ম দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র মহাবিদ্যালয়টিকে ঘিরে একটি প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে ছিল মহাবিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার।

শ্রমণ-শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত বিহারে থাকত। খননের ফলে ১৩টি এরূপ ছাত্রাবাস পাওয়া গিয়েছে। মাটির নীচে আরও এরূপ বহু ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রদের থাকার জন্য তৈরী দালানগুলি সাধারণতঃ দোতলা হত। কোন ঘরে একজন, কোন ঘরে দু'জন ছাত্র থাকত। পাথরের তৈরী কক্ষমধ্যে একটি কি দু'টি খাট দেখলেই বোঝা যায় কোন কক্ষে কতজন ছাত্র থাকত। কক্ষ মধ্যে বই, আলো প্রভৃতি রাখবার জন্য কুলঙ্গি রয়েছে। বিহারগুলির উঠানের পাশে যেসব পাতকূয়া রয়েছে, তাতে মনে হয় বিহারে জলসরবরাহের সুবন্দোবস্ত ছিল। জলনিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালী ছিল। কোন কোন পয়ঃপ্রণালীতে আচ্ছাদনও দেখা যায়। প্রত্যেক বিহারে বিরাট চুল্লী দেখে বোঝা যায়, খাওয়ার ব্যবস্থা এক সঙ্গেই হত। বিহারে সময়-নির্ণয়ের জন্য জলঘড়ি ছিল। এছাড়া, ঢাক, শাঁখ ও ঘণ্টা বাজিয়ে সময় জানানো হত।

মহাবিদ্যালয় থেকে বিনামূল্যে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। বিভিন্ন রাজা ও ধনী বণিকদের দানে এই মহাবিহারের বিরাট ব্যয় নির্বাহ হত। হিউয়েন-সাঙ্ বলেন, নালন্দা ১০০টি গ্রাম রাজাদের থেকে পেয়েছিল, সেই আয় থেকে সব খরচ নির্বাহ হত। গ্রামবাসীরা রোজ চাল, দুধ, মাখন ইত্যাদি দিয়ে যেত। হিউয়েন-সাঙ প্রতিদিন ৭ ছটাক মহাশালি চাল, ২০টি জায়ফল, ১২০টি বাতাবি লেবু, আধ ছটাক কর্পূর ও প্রচুর দুধ ও মাখন পেতেন। ই-ৎসিঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, নালন্দা মহাবিহারের অধীনে ২০০টি গ্রাম ছিল। মনে হয়, হিউয়েন-সাঙের চলে যাবার পরে আরও বহু গ্রাম পাওয়া গিয়েছিল, যার ফলে গ্রামের সংখ্যা দাঁড়ায় দুই শত। বৌদ্ধ-বিহারের নিয়ম অনুসারে শুধুমাত্র শ্রমণ-শিক্ষার্থীরাই বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার অধিকারী ছিল, কিন্তু হিন্দু রাজাদের দানের জন্য এখানে হিন্দু-শিক্ষার্থীরাও এ সুযোগ পেত বলে অনুমান করা হয়।

হিউয়েন-সাঙ্ পাঁচ বছর নালন্দার ছাত্র ছিলেন। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাস্থবির শীলভদ্র। হিউয়েন-সাঙের জীবনী থেকে জানা যায়, এখানে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দশ হাজার ছাত্র ছিল। ই-ৎসিঙ দশ বছর নালন্দায়

ছিলেন। তিনি এখানে ৩ হাজারের বেশী ছাত্র ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন-সাঙের জীবনী-লেখক হিউয়েনসাঙ বর্ণিত কয়েক হাজারকে দশ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় ৫০০০ ছাত্র ছিল, এ অনুমানই সত্য বলে মনে হয়। এ সময় এখানে অধ্যাপকের সংখ্যাও হাজারের উপরে ছিল। যদি ১০,০০০ ছাত্র ছিল ধরে নেওয়া যায়, তাহলে প্রতি উপাধ্যায়ের অধীনে ১০ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকত না। এত ছাত্র ও অধ্যাপক যেখানে, সেখানে প্রতিদিন ১০০ শত বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকা খুবই স্বাভাবিক। অধ্যাপকরা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের উপর নজর রাখতেন। শিক্ষক-ছাত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সতর্ক দৃষ্টির ফলে শিক্ষার উচ্চ মান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষাকেন্দ্ররূপে নালন্দার প্রশংসা করে হিউয়েন-সাঙ্ লিখেছেন—*In the establishment there were some thousand brethren, all men of great learning and ability, several hundreds being highly esteemed and famous, the brethren were very strict in observing the precepts and regulations of their order, learning and discussing they found the day too short, day and night they admonished each other, juniors and seniors mutually helping to perfection........Hence, foreign students came to the establishment to put an end to their doubts and then became celebrated, and those who stole the name of (Nalanda) were all treated with respect, wherever they went. (Watters : "Yuan Chang's Travels in India" as quoted by K. S. Vakil.)*

নালন্দা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। সাধারণ শিক্ষা শেষ ক'রে উচ্চ শিক্ষা বা শিক্ষা সমাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীরা এখানে আসত। যে কোন বর্ণ বা যে কোন ধর্মের শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষার জন্যে প্রবেশ করতে পারত। সাধারণ মেধার ছাত্রদের পক্ষে নালন্দায় প্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য ছিল। প্রবেশদ্বারে প্রার্থীকে দ্বার-পণ্ডিতের নিকট নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে তবে নালন্দায় ভর্তি হবার অধিকার মিলত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্য থেকে দ্বার-পণ্ডিত নিয়োগ করা হত। কথা ও গল্পচ্ছলে তাঁরা নানা দুরূহ প্রশ্নের উপস্থাপন করতেন—সেই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে দ্বার-পণ্ডিতদের তুষ্ট করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রবেশেচ্ছু প্রার্থীদের ১০ জনের মধ্যে ৭।৮ জনকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা এত কঠিন জেনেও ভারতের সুদূরতম প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষার জন্য আসত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কে ও পাণ্ডিত্যে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতেন, তাঁদের নাম সম্মানের চিহ্নস্বরূপ সিংহদ্বারে উৎকীর্ণ ক'রে রাখা হত।

হিউয়েন-সাঙ ও ই-ৎসিঙ নালন্দা সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ রেখে গিয়েছেন নালন্দার ইতিহাস রচনায় তা আমাদের প্রধান উপাদান, কিন্তু তাঁরাই নালন্দার

একমাত্র বিদেশী ছাত্র নন। নালন্দার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহির্ভারত থেকে আরও বহু শিক্ষার্থী এখানে এসেছিল। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা নালন্দায় শিক্ষার জন্য আসত। বৈদেশিক ছাত্রদের মধ্যে তাওসিং, তাং, তাওলিপ, তাওহি, হিউলু, আর্যবর্ম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা নালন্দায় অধ্যয়নের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহের নকল করতেন। বিদেশ থেকে বৌদ্ধছাত্রদের ভারত আসবার অন্যতম কারণ ছিল বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থসমূহ থেকে নকল সংগ্রহ করা। নালন্দার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে সুমাত্রা ও জাভার বাজ বালাপুত্রদেব এখানে একটি মঠ তৈরী করেন এবং ঐ মঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য বাংলার রাজা দেবপালকে দিয়ে পাঁচখানি গ্রাম দান করান। এই গ্রামসমূহের রাজস্বের একটা অংশ গ্রন্থাগারের পুঁথি নকলের জন্য খরচ হত।

নালন্দার খ্যাতির একটা কারণ হচ্ছে এখানকার বিরাট গ্রন্থাগার। সমগ্র গ্রন্থাগার অঞ্চলটিকে ধর্মগঞ্জ বলে অভিহিত করা হত। রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক ও রত্নোদধি নামে তিনটি গ্রন্থাগার নালন্দায় ছিল। সর্বোচ্চ রত্নোদধি ছিল নয়তলা, ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাবার মত প্রচুর পুঁথি এখানে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বৈদেশিক ছাত্ররা এখানে রক্ষিত গ্রন্থসমূহের মূল সংস্কৃত বা পালি পুঁথি নকল ক'রে দেশে নিয়ে যেত। ই-ৎসিং নালন্দায় থাকাকালীন ৫০০ সংস্কৃত বইয়ের ৫০০,০০০ শ্লোক নকল করেছিলেন। এখান থেকে বৈদেশিক ছাত্ররা পুঁথির নকল নিয়ে যাবার ফলে এই গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদের সামান্য অংশ তিব্বত ও নেপালে রক্ষা পেয়েছে।

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম যুগে পাঠক্রম ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু নালন্দার পাঠ্যসূচীর মধ্যে কর্তৃপক্ষের উদার পরধর্মসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নালন্দা ছিল মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে প্রতিপক্ষ হীনযান-পন্থীদের ধর্মমত ও ধর্মতত্ত্বও পড়ানো হত। হীনযান-পন্থীদের ধর্মগ্রন্থাদি পালি ভাষায় লিখিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পালি ভাষা শিখতে হত। বিখ্যাত মহাযান দার্শনিক নাগার্জুন, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি প্রভৃতির রচনা বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হত। এখানকার পাঠ্যসূচী শুধুমাত্র বৌদ্ধ গ্রন্থাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দুদর্শন ধর্মতত্ত্ব এখানে পড়ানো হত। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ পাঠের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হত। নালন্দায় প্রবেশ করবার পূর্বে শিক্ষার্থীকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে ব্যাকরণ পড়তে হত। নালন্দায় প্রবেশ করতে যে প্রাথমিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হত, সে সম্পর্কে ই-ৎসিঙ্ বলেছেন, "ছ বছর বয়সে প্রথম পাঠ ছিল সিদ্ধিরস্তু—৪৯ বর্ণ, ১০,০০০ অক্ষর, ৩০০ শ্লোকের এই পুস্তক ছয় মাসে শেষ করতে হত। তারপর শুরু হত পাণিনির সূত্র। আট বছরের মধ্যে ১০০০ শ্লোক শিখতে হত। তারপর দশ বছর বয়সের মধ্যে ধাতু শেষ ক'রে জয়াদিত্য-রচিত ১৮,০০০ শ্লোকে পাণিনির শ্লোকের ব্যাখ্যা কাশিকাবৃত্তি ধরা হত। এমনিভাবে প্রাথমিক বিদ্যার ভিত্তি দৃঢ় ক'রে দর্শন, হেতুবিদ্যা, অভিধর্ম কোষ প্রভৃতির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হত। হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার মত বেদ, বেদাঙ্গ, ন্যায়, সাঙ্খ্য-দর্শন, সাহিত্য নালন্দার পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। জ্যোতি

বিদ্যা, নক্ষত্র-বিদ্যার চর্চা এখানে হত। ধর্মগঞ্জের মধ্যে একটি মানমন্দির ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ কোন স্থান ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেবের সময় থেকেই চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা বৌদ্ধরা করেছে। নালন্দায় চিকিৎসা বিদ্যার চর্চার সঙ্গে রসায়নশাস্ত্রের চর্চাও কিছুটা হত। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তান্ত্রিক মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রবেশ করায় তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রও শিক্ষা দেওয়া হত। বিক্রমশীলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিশেষভাবে চর্চা হত। মনে হয়, বিক্রমশীলার প্রভাবেই তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে যাদু-বিদ্যা প্রভৃতি নালন্দার পাঠ্যসূচীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়।

নালন্দার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ই-ৎসিঙ্ একটি সুন্দর বিবরণ রেখে গিয়েছেন। শ্রমণেরা ভোরে উপধ্যায়ের সেবা শেষ ক'রে ধর্মশাস্ত্রের একটি অংশ পড়ত, এবং যা পড়েছে, সে সম্পর্কে চিন্তা করত। দিনের পর দিন এভাবে তারা নতুন জ্ঞান অর্জন করত ও একটি মুহূর্তও নষ্ট না ক'রে মাসের পর মাস ধরে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করত। নালন্দায় আবৃত্তি ও উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা থাকায় অধীত বিদ্যাকে উপলব্ধি না ক'রে কেহ বিতর্কে সাফল্য লাভ করতে পারত না। প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি এখানে অভ্যাস করানো হত। শিক্ষা ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত উভয় পদ্ধতিতেই দেওয়া হত।

নালন্দায় পরীক্ষা ও উপাধিদানের রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষা শেষ ক'রে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কৃতিত্বের পরীক্ষা দেবার জন্য রাজসভায় উপনীত হত। বিতর্কে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে জর্জরিত ক'রে প্রতিপক্ষকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী যশ ও অর্থ দুয়েরই অধিকারী হত। রাজসভা থেকে কৃতী ছাত্রকে উপাধি ও ভূমি দান করা হত। কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সু-উচ্চ সিংহদ্বারে তার নাম লেখা থাকত। শিক্ষা শেষ ক'রে শিক্ষার্থীর পক্ষে শ্রমণের জীবন বাধ্যতামূলক ছিল না। শিক্ষার্থীরা খুশিমত জীবিকা বেছে নিতে পারত। কেউ কেউ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করত।

নালন্দার মত বিরাট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা এক কঠিন ও জটিল ব্যাপার ছিল। নালন্দার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলা হত। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা কুলপতির ন্যায় নালন্দার যিনি প্রধান কর্মসচিব ছিলেন, তাঁকে বলা হত "সর্বাধ্যক্ষ"। সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচনে তাঁর জ্ঞান, সাধনা, প্রবীণতা প্রভৃতি বিচার ক'রে তাকে নির্বাচিত করা হত। নির্বাচনে যোগ্যতাই ছিল একমাত্র মাপকাঠি। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ সমগ্র বৌদ্ধসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বয়সে অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁকে সাহায্য করবার জন্য দু'জন সহকারী কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁদের একজনকে বলা হত 'কর্মদান', অপর জনকে বলা হত স্থবির। নালন্দার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সর্ববিধ দায়িত্ব এঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। এঁদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিক্ দেখতেন—ভর্তি, পাঠক্রম-নির্ধারণ, শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, ক্লাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি করতেন। শৃঙ্খলা-রক্ষা, গৃহনির্মাণ ও মেরামত, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, বাসকক্ষের বিলি-বণ্টন ইত্যাদির দায়িত্ব অপর সহকারীর উপর ন্যস্ত ছিল।

নালন্দার খ্যাতির অন্যতম প্রধান কারণ এখানকার বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকমণ্ডলী। তারানাথ মাধ্যমিক-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনকে নালন্দার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন। এক সময় ধর্মপাল এখানকার কুলপতি বা সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মহাস্থবির শীলভদ্রের গুরু ছিলেন। শীলভদ্র ছিলেন সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের সন্তান। তিনি হিউয়েন-সাঙের গুরু ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে আমরা গুণমতি, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি প্রভৃতি প্রখ্যাত উপাধ্যায়ের কথা জানতে পাই। বরেন্দ্রবাসী স্থিরমতির বিখ্যাত শিষ্য চন্দ্রগোমিন বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এখানকার অধ্যাপকরা বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যার জন্যই বিখ্যাত ছিলেন না, নানা শাস্ত্রের বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা ক'রেও তাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নালন্দার জ্ঞানী অধ্যাপকরা শুধুমাত্র অধ্যাপনাই করতেন না বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্কারেও তাঁদের অবদান স্মরণীয়। অষ্টম শতাব্দী থেকে এখানকার পণ্ডিতগণ তিব্বতে ধর্মপ্রচার-কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার উপাধ্যায় চন্দ্রগোমিন তিব্বতে ধর্মপ্রচারের একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, তার বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল বলে জানা যায়। শান্ত রক্ষিত তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ৭৪৯ খ্রীঃ তিব্বতে যান এবং সেখানে তিনিই প্রথম বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৬২ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সে মঠের অধ্যক্ষ থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে ব্রতী থাকেন। এই কাজে তিনি পদ্মসম্ভব নামে এক কাশ্মীরী ভিক্ষুর সাহায্য পেয়েছিলেন। নালন্দার অধ্যাপক কমলশীল কিছু দিন তিব্বতে গিয়ে শান্ত রক্ষিতের মতবাদ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেছিলেন। এছাড়া, জীনমিত্রও তিব্বতে গিয়েছিলেন।

পালরাজগণ বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করবার পর নালন্দার খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়ে আসে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিক্রমশীলার অধ্যাপকগণ নালন্দায় আসতেন এবং বিক্রমশীলার পরিচালকমণ্ডলীই নালন্দার পরিচালনা করতেন। পালরাজগণ নালন্দা অপেক্ষা বিক্রমশীলা সম্পর্কে অধিক উৎসাহী ছিলেন বলেই পরিচালনা-ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়। বিক্রমশীলার অভ্যুত্থানের পর বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে, শিক্ষার অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী বর্বরোচিতভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদি অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়—ভিক্ষুক সম্প্রদায়কে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ধর্মান্ধতার ফলে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তার সঙ্গে গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ ভস্মস্তূপে পরিণত হয়ে ভারতের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

॥ বিক্রমশীলা ॥

ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের মধ্যে নালন্দার পরেই বিক্রমশীলা মহাবিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় নালন্দার

অবস্থিতি নিয়ে আর মতভেদ বা জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই, নালন্দা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিবরণীর সত্যতাও নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিক্রমশীলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হওয়ায় বিক্রমশীলার অবস্থান সম্পর্কে আজও মতভেদ রয়েছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, নবম শতাব্দীর সম্রাট ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা এই দেব বিহারটি গঙ্গা তীরবর্তী কোন পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এজন্য অনেকে অনুমান করেন, ভাগলপুরের কাছাকাছি রাজমহল গিরিশ্রেণীর মধ্যে কোথাও বিক্রমশীলা অবস্থিত ছিল। নালন্দার সঙ্গে বিক্রমশীলার নিকট সম্পর্কের কথা চিন্তা ক'রে অনেকে বলেন বিক্রমশীলা নালন্দার নিকটেই অবস্থিত ছিল। ডাঃ নন্দলাল দে ভাগলপুর থেকে ২৪ মাইল পূর্বে পাথরঘাটা পাহাড়ে বিক্রমশীলা অবস্থিত ছিল বলে মনে করেন, অনেকেই তাঁর অনুমান সত্য বলে মনে করেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মনে করেন, বিক্রমশীলা ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জে অবস্থিত ছিল।

কথিত আছে, বিক্রম নামে এক যক্ষের নাম থেকে এই মহাবিহারের নাম বিক্রমশীলা হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র গৌড়ের রাজা ধর্মপাল (৭৭৫—৮০০ খ্রীঃ) বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১০৮টি মন্দির (৫৪টি বড় ও ৫৪টি ছোট), ভিক্ষু ও শ্রমণের জন্য বিহার-বক্তৃতার জন্য বড় বড় হলঘর নির্মাণ করেছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপনার জন্য ১০৮ জন অধ্যাপক ও কার্য পরিচালনার জন্য ৬ জন ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছিলেন। ক্রমে এই মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হলে এখানে ৬টি মহাবিদ্যালয়ের প্রতি মহাবিদ্যালয়ে ১০৮ জন ক'রে অধ্যাপক অধ্যাপনা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল আবাসিক। বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এখানে আসত। তিব্বত থেকে বহু ছাত্র ও পরিব্রাজক আসত বলে তিব্বতীয়দের জন্য এখানে একটি পৃথক্ বিহার ছিল। বিক্রমশীলার কেন্দ্রীয় সম্মেলন গৃহের নাম ছিল বিজ্ঞানাবাস। শোনা যায়, বিক্রমশীলাকে পাল রাজারা দুর্গের মত ক'রে গড়ে তুলেছিলেন। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। প্রধান ফটকের দু'পাশে নাগার্জুন ও দীপঙ্কর অতীশের চিত্র অঙ্কিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছয়টি দ্বার ছিল। দ্বারগুলি সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে যেত। যে সব ছাত্র বা দর্শনার্থী সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছোত, তাদের আহার ও রাত্রিবাসের জন্য সদর দরোজার পাশে ধর্মশালা ছিল।

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের সময় বিক্রমশীলার আরও উন্নতি হয়। পাল বংশের সব রাজাই বিক্রমশীলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাল রাজাদের দানে ও ধার্মিক বিত্তবানদের অর্থসাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হত। শিক্ষার্থীদের এখানে থাকা ও খাওয়ার জন্য কোন অর্থ দিতে হত না।

বিক্রমশীলার কার্য-পরিচালনার জন্য দায়িত্ব ছিল সর্বাধ্যক্ষের উপর। কার্যপরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কর্মপরিষদের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করতেন। সর্বাধ্যক্ষের অনুমোদন ছাড়া কর্মপরিষদের কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হত না। কর্মপরিষদ সর্বক্ষণই দেশের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কথিত আছে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ সময়ে বিক্রমশীলার পরিচালক-

মণ্ডলীর অধীনে ছিল। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধ্যাপক বিনিময় হত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও অভয়ঙ্কর দুই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ছিলেন।

নালন্দার মত এই বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি প্রবেশদ্বারে ছয় জন দ্বারপণ্ডিত নতুন প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করতেন। শিক্ষার উচ্চ মান রক্ষার জন্যই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মনে হয়, ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের ছয় জন অধ্যক্ষই এই দ্বার-পণ্ডিতের কাজ করতেন। সম্রাট মহীপালের সময়ের (৯৯২—১০৪০ খ্রীঃ) ছয়জন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম দ্বারপণ্ডিতরূপে পাওয়া যায়—

(১) পূর্ব দ্বার—রত্নাকর শান্তি
(২) পশ্চিম দ্বার—বারানসীর ভগীশ্বর কীর্তি
(৩) উত্তর দ্বার—নরোপা
(৪) দক্ষিণ দ্বার—প্রজ্ঞাকরমতি
(৫) প্রথম কেন্দ্রীয় দ্বার—কাশ্মীরের রত্নবজ্র
(৬) দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় দ্বার—গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিশ্র

নালন্দার মত বীক্রমশীলার পাঠক্রম ব্যাপক ও উদার ছিল না। পাঠক্রমে শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ), হেতুবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র), বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থাদি স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু কালক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রই পাঠক্রমের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। মূল বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিকবাদের কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দু তান্ত্রিকবাদের প্রভাবেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের মধ্যে রত্নাকর শান্তি, নরোপা, দীপঙ্কর অতীশ, দিবাকর চন্দ্র, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করেন। এবং মহাযান ধর্মমত সম্পর্কেও মৌলিক গ্রন্থাদি রচনা করেন। যোগশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, শিল্পবিদ্যা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হত।

বিক্রমশীলার শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত উভয়রূপ প্রথাই প্রচলিত ছিল। নালন্দার শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা দেখি শ্রেণীশিক্ষায় বক্তৃতার রীতি প্রচলিত হয়েছে—বিক্রমশীলায় সেই রীতিই অনুসৃত হত; বক্তৃতার সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক থাকায় বিদ্যার্থীরা শিক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পেত। বিক্রমশীলার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চা ব্যাপকভাবে হওয়ায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আরও নিকটতর হয়। গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা সম্ভব ছিল না। সাধনার অঙ্গস্বরূপ নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, গূঢ়তত্ত্ব গুরুর নিকট ছাড়া শেখবার উপায় ছিল না এজন্য বিক্রমশীলার শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষারীতি অপরিহার্য ছিল।

বিক্রমশীলায় পরীক্ষাব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষা ছিল মৌখিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যোগ্য শিক্ষার্থীরা রাজার কাছ থেকে উপাধি লাভ করত। পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, উপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি দেবার রীতি ছিল।

বিক্রমশীলা মহাবিহারেরর অধ্যাপকদের খ্যাতি ভারতের বাইরে পর্যন্ত বিস্তার লাভ

করেছিল। প্রায় চার শতাব্দী ধরে তিব্বত ও বিক্রমশীলার সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র বজায় ছিল। বিক্রমশীলায় তিব্বতীদের জন্য ভিন্ন বিহার থেকেই প্রমাণিত হয় ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিব্বতীয় সূত্র থেকে জানা যায়, বুদ্ধ জ্ঞানপদ, বিরোচন, জেতারি, রত্নাকর শান্তি, জ্ঞানশ্রীমিশ্র, রত্নবজ্র, অভয়ঙ্কর গুপ্ত, তথাগত রক্ষিত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করেন ও বহুগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন আচার্য হচ্ছেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। গৌড়ের রাজপরিবারের ছেলে অতীশ অতি অল্প বয়সেই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। ওদন্তীপুর ও কৃষ্ণগিরিতে শিক্ষা শেষ ক'রে তিনি সিংহল পরিভ্রমণ করেন, সেখান থেকে তিনি বিক্রমশীলায় আসেন। তিনি আচার্য জেতারির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে অতীশ বিক্রমশীলার দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত হন, পরে মহারাজ জয়পালের সময়ে তিনি সর্বাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। তিব্বতরাজ চানচুব তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিক্ষু নাগছোকে পাঠিয়েছিলেন। নাগছোর বিবরণ থেকে বিক্রমশীলা সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। তিনি বিক্রমশীলার এক সমাবর্তন-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবে শিক্ষার্থী, অধ্যাপক ও অতিথি মিলিয়ে আট হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। এই উৎসবের পৌরোহিত্য করেন স্থবিরশ্রেষ্ঠ বিদ্যা কোকিল। নাগছোর বিবরণ থেকে জানা যায়, এইসব বিদ্বৎ-সম্মেলনে অতীশ, বীরবজ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মগধের রাজা অপেক্ষা অধিক সম্মান পেতেন। মগধের রাজা যখন সম্মেলনে প্রবেশ করেন, তখন কোন ভিক্ষুই দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখান নি। তারপর যখন অতীশ, বীরবজ্র প্রভৃতি অধ্যাপকগণ প্রবেশ করেন, তখন সব ভিক্ষু দাঁড়িয়ে সম্মান দেখিয়েছিলেন। অতীশ যখন এলেন, তখন তাঁর কোমরে একজোড়া চাবি ঝুলছিল, কারণ তিনি ছাত্রাবাস ও বিভাগীয় কার্যাদি পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতীয় দূত বিনয় ধর, বিক্রমশীলার পণ্ডিত ভূমিগর্ভ ও বীর্যচন্দ্রের সঙ্গে অতীশ ১০৪১ খ্রীঃ শেষে ১০৪২ খ্রীঃ প্রথম দিকে তিব্বতে যাত্রা করেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের পর তিনি ১৩ বছর সেখানকার বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে ব্রতী থেকে ৭৩ বছর বয়সে তিনি নির্বাণ লাভ করেন। তিব্বতীয় বিবরণ থেকে জানা যায়, মূল রচনা ও অনুবাদ নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ।

অতীশের ভারত-ত্যাগের পর বিক্রমশীলার পরবর্তী দেড়শ' বছরের ইতিহাস খুব গৌরবোজ্জ্বল নয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রের বীভৎস রূপটি প্রকট হতে থাকায় ধর্মজগতে যে আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে বিক্রমশীলাকে রক্ষা করবার মত শক্তিশালী নেতা ছিল না। অতীশের পরবর্তী কালে রত্নকীর্তি, অভয়ঙ্করগুপ্ত, শাক্যশ্রীভদ্র প্রভৃতি অধ্যাপকদের নাম উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্র

বিক্রমশীলা ধ্বংসের শোচনীয় দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিক্রমশীলা ভস্মীভূত হবার পর তিনি বরেন্দ্র ভূমির জগদ্দল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এখানে কিছুদিন থেকে কিছু ভিক্ষু নিয়ে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন।

মুসলিম ঐতিহাসিক মীনহাজ বিক্রমশীলার ধ্বংসের বিবরণ তবকাৎ-ই-নসীরী গ্রন্থে রেখে গিয়েছেন। এই বিবরণ থেকে আমরা জানতে পাই, ওদন্তীপুরীর মহাবিদ্যালয় ধ্বংস ক'রে বখ্তিয়ার বিক্রমশীলা ধ্বংস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নাকি তাঁর দুর্গ বলে ভ্রম হয়েছিল। মীনহাজ লিখেছেন,—

"The greater number of the inhabitants of the place were Brahmans (*i. e.* Buddhist Bhikshus) and the whole of these Brahmns had their heads shaven, and they were all slain. There were a great number of books on the religion of the Hindus there, and when all these books came under the observation of the Mussalmans they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of these books, but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquainted (with the contents of these books) it was found that the whole fortress and city was a college." *(As quoted by Altekar from Raverty's translation of Tabakat-i-Nasiri.)*

॥ অন্যান্য বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ॥

বিক্রমশীলা ও নালন্দা ছাড়াও ভারতের কয়েকটি বৌদ্ধ মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অর্জন করেছিল। হিউয়েন-সাঙ্ যখন ভারত পরিভ্রমণে আসেন, তখন পশ্চিম ভারতে **বলভী** হীনযান-বৌদ্ধমতাবলম্বীদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। হিউয়েন-সাঙ্ ও ই-ৎসিঙ্ দুজনেই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং এর প্রশংসা করেছেন। হিউয়েন-সাঙ এখানে ৬০০০ ভিক্ষু দেখতে পান। নালন্দার মত ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু বিদ্যার্থী এখানে আসত। নালন্দার প্রখ্যাত অধ্যাপক গুণমতি ও স্থিরমতি দু'জনেই এখানকার ছাত্র ছিলেন। পরে এখানকার অধ্যাপক হন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বলভীর রাজা প্রথম শিলাদিত্য এখানে বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। তারপর থেকে বলভীর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বলভী একটি মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এখানে বিদ্যার্থীরা দু'তিন বছর উচ্চশিক্ষা লাভ করত। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রাদির সঙ্গে নানা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বলভীর ছাত্ররা যাতে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হতে পারে, সেজন্য তাদের শাসন-কার্যে যোগ্যতা অর্জন করবার মত শিক্ষাও দেওয়া হত বলে মনে হয়, কারণ এখানকার ছাত্ররা রাজকার্যে নিযুক্ত হয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার ষাট মাইল উত্তরে

ওদন্তপুরী বা উদণ্ডপুরমে একটি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করেন। এখানে হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু শিক্ষার্থী ছিল। এখানকার বিখ্যাত উপাধ্যায়দের মধ্যে বাঙ্গালী অধ্যাপক প্রভাকর সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থসমূহের জন্য একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীলার সঙ্গে বখ্‌তিয়ার এই মহা-বিহারটিও ধ্বংস করেন।

উত্তরবঙ্গের **জগদ্দল** বিশ্ববিদ্যালয়টি এক সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। রামপাল এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার একশ' বছরের মধ্যে (১২০৩ খ্রীঃ) মুসলিম আক্রমণে এই বিহারটি ধ্বংস হয়।

সপ্তম অধ্যায়

মুসলিম শিক্ষা

মুসলিম বিজয়ের পর ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা। মুসলিম বিজয়ের পর প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলমান শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সুদীর্ঘকাল মুসলিম শাসনাধীনে থেকে প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ব গৌরবের আসন থেকে বিচ্যুত হলেও হিন্দুসমাজ তার নিজস্ব শিক্ষাধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ও ব্যাপক প্রসারের পূর্ব পর্যন্ত একই সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের জন্য দু'টি পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষাধারা আপন আপন সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছে।

॥ **মুসলিম অভিযান** ॥

অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে প্রথম মুসলিম অভিযান শুরু হয়। সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের রাজত্বকালে ইরাকের রাজা তাঁর সেনাপতি বিনকাসিমকে সিন্ধু জয় করতে পাঠান। এই সময়ে সিন্ধু ও মুলতানে প্রথম মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হয়। এখান থেকেই আরবরা ভারতীয় দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে এবং এই অমূল্য জ্ঞানরাজি পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচার করে।

সত্যিকারের মুসলিম বিজয় অভিযান ভারতে শুরু হয় গজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পর থেকে। নিজ দেশে সুলতান মামুদ (৯৯৮ খ্রীঃ—১০৩০ খ্রীঃ) ধর্মপ্রাণ ও বিদ্যানুরাগী বলে পরিচিত ছিলেন। ফিরদৌসীর মত কবি তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। ঐতিহাসিক অলবিরুণীও তাঁর দরবারে ছিলেন। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। গজনীতে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বহু গুণিজনের সমাবেশ হয়। জ্ঞানী, গুণী ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করতেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে সুলতান মামুদের পরিচয় দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী ব'লে। ভারতের বিপুল সম্পদের লোভে সতের বার হিংস্রভাবে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন ক'রে তিনি নিজের রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর আক্রমণের ফলে ভারতে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোঁড়া মুসলমান হিসাবে মন্দির ধ্বংস তাঁর আক্রমণের অন্যতম অঙ্গ ছিল। ধর্মস্থানগুলিতে তৎকালীন যুগের শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বারবার ভারত আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের অধিবাসীদের নিরুদ্বেগ জীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় দেশের শিক্ষাও ব্যাহত হয়।

সুলতান মামুদের অক্রমণের ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু একশ' বছর অতীত না হতেই মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। তিনি শুধু লুণ্ঠন করতে ভারতে

আসেননি। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করতে। পৃথ্বিরাজ ও জয়চাঁদের পারিবারিক কলহের সুযোগে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১১৯২খ্রীঃ) দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের গোড়াপত্তন হয। সুলতান মহম্মদ ঘোরীরও হিন্দু মন্দির ধ্বংসে কোনরূপ অনাসক্তি ছিল না। আজমীরে হিন্দু মন্দির ধ্বংস ক'রে তিনি সেখানে মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে উপযুক্ত ছাত্র নির্বাচন ক'রে উচ্চশিক্ষা দান করেন ও রাজকার্যে পারদর্শী ক'রে তোলেন। তাঁর অন্যতম ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন ১২১০ খ্রীঃ দিল্লীতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতের মুসলিম বিজয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিজয়ী মুসলমানরা যেখানে পেরেছে বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস ক'রে সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায়, মসজিদকে কেন্দ্র ক'রেই মুসলিম শিক্ষার প্রসার হয়েছে। প্রাচীন অন্যান্য শিক্ষার মত মুসলিম শিক্ষাও ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। গোঁড়া মুসলিম শাসকরা হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিজাতীয় মনোভাব দেখালেও এদেশে মুসলিম শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টায় তাদের কোনরূপ উৎসাহের অভাব দেখা যায় না। মুসলমানরা বিদ্যার্জনকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। মুসলিম ধর্মপ্রবর্তক হজরত মহম্মদ নাকি একবার বলেছিলেন—পুত্র পিতার থেকে যা দানস্বরূপ পায়, তার মধ্যে শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান। মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষার খুব প্রসার না হলেও শিক্ষিতদের যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখা হত। মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষকদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কও খুব প্রীতির ছিল বলে জানা যায়। শিক্ষা-প্রীতির জন্যই হোক বা ধর্মের অনুশাসনের জন্যই হোক, এদেশের মুসলিম শাসকরা প্রথম থেকেই শিক্ষা-প্রসারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মুসলিম বিজয়ের পর নানা কারণে শাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম এদেশে বিস্তার লাভ করে। কিছু সংখ্যক ভারতবাসী মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করবার পর বিভিন্ন স্থানে উপাসনার জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকগণ নিজ নিজ এলাকায় মসজিদের সঙ্গে মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসাহায্য করেন। বিদ্যালয়, কলেজ, লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থাপনে ও জ্ঞানী, গুণী, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন কোন মুসলিম নরপতির বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

॥ সুলতানী যুগ ॥

দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দীন আইবাক মন্দির ধ্বংস ক'রে বহু মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেনে। মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। ভারতে মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন তাঁর সময় থেকেই হয়। কুতুবুদ্দীনের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার (মতভেদে বখ্‌তিয়ারের পুত্র ইখ্‌তিয়াউদ্দীন) বিক্রমশীলা এবং ওদন্তীপুরী বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন। কুতুবের উত্তরাধিকারী ইলতুৎমিস একটি কলেজ (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উজ্জয়িনী নগর ধ্বংস করেন, তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের একটি শিক্ষাকেন্দ্রও লোপ পায়। ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়াও বিদ্যানুরাগী ছিলেন বলে জানা যায়। রাজিয়ার সময় দিল্লীতে একটি কলেজ ছিল। নাসিরুদ্দীনের বিদ্যানুরাগ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কোরানের পুঁথি নকল

ক'রে দিল্লীর সুলতান সংসার চালাতেন, এ গল্প নাসিরুদ্দীন সম্পর্কেই শোনা যায়। তাঁর সময় জলন্ধরে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। দাসবংশীয় বলবনের পুত্র মহম্মদের সময় দিল্লী বিদ্যাচর্চার একটি কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। মহম্মদ ও তাঁর ভাই বোখরা খাঁ দিল্লীতে কয়েকটি সাহিত্য-সভা গড়ে তোলেন। বিখ্যাত কবি ও গায়ক আমীর খসরু বলবনের পুত্রদের শিক্ষক ছিলেন।

খিল্‌জী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন খিল্‌জী নিজে বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী, শোনা যায়, প্রথম জীবনে নিরক্ষর ছিলেন। বিদ্যায় বা বিদ্যাপ্রসারে তাঁর কোন অনুরাগ বা উৎসাহই ছিল না। অধিকন্তু তিনি সরকারী তহবিল থেকে যে অর্থ শিক্ষাপ্রসারের জন্য ব্যয় হত তা বন্ধ ক'রে দেন, এজন্য প্রদত্ত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন এবং বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগীদের কিছু অর্থ সাহায্য করেন। তাঁর পুত্র মুবারক পিতার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করেন। তিনি শিক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। আলাউদ্দীনের দিক্ থেকে বিদ্যাপ্রচারে উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও খিলজী বংশের রাজত্বকালে দিল্লী মুসলিম শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তুগলক বংশীয় মহম্মদ বিন-তুগলক বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে তাঁর চেয়ে শিক্ষিত আর কেউ ছিলেন না। বহু সদ্‌গুণ ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই খামখেয়ালী রাজার রাজত্বকালে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে দিল্লীর অবনতি ঘটে। তাঁর বিরাট্ পাণ্ডিত্য দেশের শিক্ষাপ্রসারে কোন কাজেই আসেনি। তাঁর খেয়ালে দিল্লী থেকে রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করা হলে দিল্লী জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হয়। তুগলক নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে এলেও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে দিল্লীর প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যায়।

ফিরোজ শাহের সময় আবার দিল্লীর সুদিন ফিরে আসে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে তাঁর মত বিদ্যোৎসাহী আর কেহ ছিলেন না। শিক্ষা-প্রসার ও বিদ্বানদের উৎসাহের জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন। পণ্ডিত ও ধার্মিকদের জন্য দান ও শিক্ষার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল বছরে ৩৬ লক্ষ টাকা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর নিকটবর্তী ফিরোজাবাদ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। এই সময়ে ফিরোজশার সাম্রাজ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ক্রীতদাস ছিল। এরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায়, সেজন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। শোনা যায়, প্রায় ১৮ হাজার ক্রীতদাসের শিক্ষার ব্যয় তিনি বহন করতেন। এদের জন্য তিনি বহু প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যাতে এরা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়। এদের কোরানের অনুলিপিকার ও দক্ষ শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি কমপক্ষে মসজিদ সমন্বিত ৩০টি কলেজ (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৪০ থেকে ৫০টি। তাঁর নতুন রাজধানী ফিরোজাবাদে তিনি ফিরোজশাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে এই আবাসিক কলেজে শিক্ষক ও

ছাত্ররা একত্র হয়ে বাস করত। ছাত্র-শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে যাতে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, এখানে সে ব্যবস্থা ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত জালালুদ্দীন রুমি এই মাদ্রাসায় ইসলামী আইন ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। এই মাদ্রাসার খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, দেশবিদেশ থেকে বহু লোক এটি দেখতে আসত। তাদের অভ্যর্থনা ও থাকবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হত। মাদ্রাসার প্রতিটি ছাত্র, অধ্যাপক ও অতিথির ভরণ-পোষণের জন্য দৈনিক ভাতা দেওয়া হত। সমস্ত ব্যয়ই রাজকোষ থেকে বহন করা হত। প্রাচীন ঐতিহাসিক চিহ্ন সংরক্ষণের জন্য তিনি দুটি অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে আনিয়েছিলেন। ফিরোজের আদেশে আজ-উদ্দীন-খালিদ-খানী তিনশ' সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সীতে অনুবাদ করেছিলেন।

সৈয়দ বংশের রাজত্বে শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়নি। এ সময় থেকেই সুলতানী রাজত্বের পতন শুরু হয়। সৈয়দ আলাউদ্দিনের সময় বাদাউন মুসলিম শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়ে ওঠে। সিকন্দার লোদীর সময় আগ্রা শহরটি স্থাপিত হয় ও মুসলিম শিক্ষার জন্য খ্যাতি অর্জন করে। সিকন্দার লোদী নির্দেশ দেন, প্রত্যেক সৈনিককে লেখাপড়া শিখতে হবে। তার সময়েই হিন্দুরা প্রথম ফার্সী শিখতে শুরু করে। অনেকে মনে করেন, এই সময় থেকেই উর্দুর উদ্ভব হয়। সিকন্দারের রাজত্বকালে বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে আরবী ও ফার্সীতে অনূদিত হয়। সুলতানী আমলের শেষ সময়ে তৈমুরের আক্রমণের ফলে দেশে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে সাময়িকভাবে মুসলিম শিক্ষাপ্রসার ব্যাহত হয়।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে দিল্লীর সুলতানদের আগ্রহে ও চেষ্টায় এদেশের মুসলিম অধিবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সব মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে প্রাদেশিক শাসকগণ মুসলিম প্রজাদের শিক্ষার জন্য যত্নবান হন। উত্তর ভারতে জৌনপুর শরকীবংশের রাজত্বকালে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইব্রাহিম শরকীর পৃষ্ঠপোষকতায় জৌনপুর মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। শেরশাহ তাঁর বাল্যে এখানেই শিক্ষালাভ করেন।

দক্ষিণ ভারতের বাহমনী রাজ্যের মুসলিম শাসকগণ শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বাহমনরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩৭৮ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এরপর এঁরা বহু মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। শুধুমাত্র নগরেই এঁদের শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না, গ্রামেও শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁরা বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাহমনীরাজ মাহমুদ শাহের মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান বিদরে একটি কলেজ ও বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, এই গ্রন্থাগারে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য তিন হাজার পুঁথি ছিল। সুলতানী আমলে গুজরাট, মালব, বাংলা প্রভৃতি স্থানে মুসলিম শিক্ষার জন্য বহু মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ সুলতানী আমলে শিক্ষার অবস্থা ॥

বাবরের ভারত আক্রমণের পূর্বে এদেশে মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

বলা চলে। তবে, মুসলিম শিক্ষা বিশেষ ক'রে উচ্চ শিক্ষা বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী ও নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন রাজ্যের মুসলিম শিক্ষার উন্নতি-অবনতি সেখানকার শাসকের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল ছিল। কোন শাসক যদি শিক্ষার জন্য রাজকোষ থেকে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কমিয়ে বা বন্ধ ক'রে দিতেন, বা শিক্ষার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতেন, তাহলে শিক্ষা-প্রসার ব্যাহত হত। এমনও দেখা গিয়েছে, নবাব মাদ্রাসা পরিদর্শনে গিয়ে অভ্যর্থনা-ব্যবস্থায় তুষ্ট হন নি, তাই শিক্ষার জন্য ব্যয় বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। আবার কোন কোন সময় বিদ্যানুরাগী শাসকের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়েছে। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত বিবরণের অতিরঞ্জনের সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, এদেশে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে মুসলিম উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শুধু মুসলমানই নয়, হিন্দুরাও সরকারী চাকরির জন্য ফার্সী ভাষা শিক্ষা করত। সারা ভারত ছড়িয়ে মসজিদের সঙ্গে মক্তব ছিল। মক্তবে কোরানের বয়াত মুখস্থ করবার সঙ্গে সামান্য কিছু লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখবার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের যেমন পাঠশালা তেমনি মুসলমানদের মক্তব সাধারণ লোকের প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাত। মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা ছাড়াও অভিজাত মুসলিম পরিবারে "আখেনজি" রেখে পড়াবার প্রথা ছিল। শিক্ষিত মুসলমানরা অনেক সময় নিজেদের বাড়ীতে ছাত্র রেখেও শিক্ষা দিতেন। সুলতানী আমলে সংগীত, বাদ্য ও চিত্র-কলা অভিজাত সমাজে আদৃত হত। ওস্তাদ রেখে এসব শেখার রীতি ছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে হিন্দুস্থানে বহু কিছু অভাবের যে তালিকাটি রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে দেখা যায়, এদেশে ভাল খানাপিনার অভাবের সঙ্গে কলেজের অভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। বাবরের এই মন্তব্য অনেকেই মেনে নিতে ইতস্ততঃ করবেন। বাবর ভারতের সামান্য অংশের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। পশ্চিম ভারতে যে সামান্য ভূখণ্ড তিনি অধিকার করেন, সেখানে তাঁর আক্রমণের অব্যবহিত পরে কোন কলেজ না থাকাই স্বাভাবিক। দিল্লীর সুলতানদের রাজত্বের শেষ সময়ে দেশে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ দেশের সামগ্রিক অবনতির মধ্যে শিক্ষার অবস্থাও শোচনীয় রূপ ধারণ করেছিল। সেই জন্যই হয়ত বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে এদেশে ভাল কলেজের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

॥ মোঘল যুগের শিক্ষা ॥

বাবর মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, কিন্তু দিল্লীর নিকটবর্তী সামান্য অংশই তার শাসনাধীন ছিল। অল্প যে কয়েকদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, সে কয়েকদিনে তিনি এদেশে শিক্ষার অভাব অনুভব করলেও শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি কিছু করতে পারেন নি। হুমায়ুনের বিদ্যানুরাগের কথা সর্বজনবিদিত। দিল্লীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী থেকে সন্ধ্যায় নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করবার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। হুমায়ুন নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে পুস্তক রচনা

করেন। শোনা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি তাঁর প্রিয় গ্রন্থসমূহ নিয়ে যেতেন। হুমায়ুন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজের মর্যাদা স্থির ক'রে তিনটি ভাগে ভাগ ক'রে দেন। তিনটি শ্রেণী হল, আহলি সাদত অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি, আহলি দৌলত অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি, আহলি মুরাদ অর্থাৎ গুণী ব্যক্তি। এঁদের নিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিন বৈঠক বসাতেন। শেরশাহ তাঁকে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেননি। সামান্য যে কয়দিন তিনি রাজত্ব করেন, তার মধ্যে তিনি দিল্লীতে একটি কলেজ (মাদ্রাসা) স্থাপন করেন।

মোঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহানুভব আকবর। শোনা যায়, তিনি নাকি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। জাহাঙ্গীর লিখেছেন, যদিও তাঁর পিতা নিরক্ষর (উম্মী) ছিলেন, তবুও বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ও সাহিত্য-রসিকদের সাথে সুমার্জিত ভাষায় যখন আলোচনা করতেন, তখন তাঁকে নিরক্ষর বলে কেহ সন্দেহ করতেন না। কথাটা কতখানি সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। নিরক্ষর হলেও তিনি যে শিক্ষিতমনা ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকের দিনে যাকে বলা হয় বিদগ্ধ, আকবব ছিলেন তাই। বহু গুণী-জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল তাঁর সভায়। তিনি ছিলেন এক বিশাল গ্রন্থাগারের মালিক। সেখান থেকে প্রতি দিন পুঁথি আসত, তাই পড়ে তাঁকে শোনানো হত। সাহিত্য, ধর্ম, সঙ্গীত, চারুশিল্প, লিখনশিল্প (calligraphy) সব কিছুতেই তাঁর সমান উৎসাহ ছিল।

আবুল ফজল "আকবর নামা" নামে আকবরের জীবনচরিত ও 'আইন-ই-আকবরী' নামে আকবরের শাসনপ্রণালী সম্পর্কে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সময় নিজামুদ্দীন ও বাদাউনী ফার্সী ভাষায় দু'খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। আবুল ফজলের ভাই ফৈজী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, লীলাবতী (গণিতের বই) ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়।

ফতেপুর সিক্রির "এবাদত খানা"য় আকবর প্রায়ই বিতর্ক ও আলোচনার আয়োজন করতেন। এখানে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের তিনি আহ্বান করতেন তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে। এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। কথিত আছে, একবার বিতর্কের বিষয় ছিল আদিম মানুষের কণ্ঠে যেদিন প্রথম ভাষা উচ্চারিত হয়েছিল, সে কোন্ ভাষা। আদিম মানুষ প্রথম কোন্ ভাষায় কথা বলতে শিখেছিল ? বিভিন্ন ধর্মের ধ্বজাধারীরা আপন আপন ধর্মগ্রন্থের ভাষাকেই মানুষের প্রথম ভাষা বলে দাবী করল। মুসলমানরা বলল, আরবী হচ্ছে মানুষের আদিমতম ভাষা ; হিন্দুরা দাবী করল সংস্কৃত, ইহুদীরা দাবী করল হিব্রু। এই বিতর্ক নিরসনের জন্য আকবর যে দীর্ঘস্থায়ী Experiment-এর আয়োজন করেছিলেন, তার মধ্যে কিছুটা নিষ্ঠুরতা থাকলেও কৌতূহলের উদ্দীপক করে। তিনি আদেশ করলেন, সদ্যোজাত বারোটি শিশুকে একটি মূক ও বধির ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখা হবে—এমনভাবে লোকালয় থেকে তাদের আলাদা ক'রে রাখা হবে যেন বারো বছরের মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বর তাদের শ্রুতিগোচর না হয়। বারো বছর বাদে যখন

সম্রাটের কাছে তাদের আনা হল, তখন দেখা গেল, বোবা ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে বারো জন বোবা শিশু গড়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে তাদের কথা শিখিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্রাট্ ক'রে দিয়েছিলেন।

আকবর শুধু বিদগ্ধই ছিলেন না, তিনি বিদ্যানুরাগীও ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানী ফতেপুরসিক্রি, আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিরাজ থেকে অধ্যাপক এনে আগ্রার মাদ্রাসায় নিয়োগ করা হয়। তাঁর ধাত্রীমা মাহম অনগ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিল্লীর মাদ্রাসা আবাসিক ছিল না। বাইরে থেকে শিক্ষার্থীরা এসে পড়ে যেত। আকবর ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সবাইকার বাদশা। তাই হিন্দুদের শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদের সঙ্গে তিনি মাদ্রাসায় হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। তাঁর সুযোগ্য রাজস্বমন্ত্রী টোডেব মল হুকুম জারী করেছিলেন—সব সরকারী হিসাব-নিকাশ পারসীক ভাষায় বাখা হবে। এর ফলে, বাধ্য হয়ে বহু হিন্দু সেই ভাষা শিক্ষা করে। আকবরেব সময় উর্দু ভাষাও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

শিক্ষা সম্পর্কে আকবর যে সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আকবরের সুহৃদ ও সভাসদ আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে একটি বিবরণী দিয়েছেন। আকবরের নির্দেশ ছিল ছেলেরা প্রথমে ফারসী বর্ণমালা ও উচ্চারণ শিখবে এবং ছেদচিহ্ন কোথায় পডবে, তা শিখবে। কযদিনের মধ্যে এগুলি শেখা হলে তারপর যুক্তবর্ণ শিখবে। এব এক সপ্তাহ পর তারা ছোট ছোট নীতিকথা বা ধর্ম-সম্পর্কীয় পদ্য ও গদ্য রচনা পডতে চেষ্টা করবে। এব মধ্যে যুক্তাক্ষববিশিষ্ট শব্দ থাকবে। ছাত্ররা যতটা সম্ভব স্বাধীন-ভাবেই এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। শিক্ষকরা সাহায্য করবেন—তবে যতটা সম্ভব কম। শিক্ষকদের কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হত। যথা :—বর্ণমালা, শব্দার্থ, যুক্তবর্ণ, নতুন অর্ধাশ্লোক শিক্ষা, দ্বিচরণ শ্লোক শিক্ষা, যা পড়া হল তাব পুনরাবৃত্তি। এই নতুন পদ্ধতিতে কয়েক মাসেব মধ্যে কয়েক বছরেব শিক্ষা আয়ত্ত করা সম্ভব হত। আকবর সুন্দর হস্তলিপিব উপর জোর দিতেন। একে চিত্রাঙ্কনের মধ্যে ধরা হত। এজন্য পারিতোষিকেব ব্যবস্থা ছিল।

মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। আকবরের সময় পাঠক্রমের মধ্যে ছিল গণিত, জ্যামিতি, হিসাব, কৃষি, জমির জরিপ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতি-শাস্ত্র ইত্যাদি। সংস্কৃত শিখতে হলে ছাত্রদের ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত, পাতঞ্জলি ইত্যাদি শিখতে হত। আকবর চেয়েছিলেন, যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে একটা গতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করতে, যাতে শিক্ষার্থীরা অল্প সময়ে লেখাপড়া শিখতে পারে। হিন্দুপ্রথায় পড়ার আগে লেখা শেখানো হত, এ-প্রথার কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আকবর ফারসী বিদ্যালয়ে পড়ার আগে লেখা শেখার রীতির প্রবর্তন করেন। ছাত্ররা যতটা সম্ভব নিজেরাই শিখবে, এই নির্দেশের মধ্যে আমরা একজন আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌কেই পাই। শুধু তাই নয়, ছাত্ররা যা পড়বে, তার শব্দার্থ শিক্ষা ক'রে বলে

দিতে হবে—অর্থাৎ, না বুঝে পড়া চলবে না। আজকের দিনে আমরা তোতাবৃত্তি পরিহার করতে চাই, আকবরও চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন না-বুঝে মুখস্থ করবার যন্ত্রে পরিণত না হয়।

আকবর শিক্ষা সম্পর্কে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন, তার উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর ততটা উৎসাহী না হলেও তিনিও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। জাহাঙ্গীর ফারসী ও তুর্কী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের একখানা আত্মচরিত রেখে গিয়েছেন। তিনি নিয়ম করলেন—কোন ধনীর উত্তরাধিকারী না থাকলে তার বিষয়সম্পত্তি রাজকোষে জমা হবে এবং সেই অর্থ মাদ্রাসা-স্থাপন, মাদ্রাসা-সংস্কার প্রভৃতি শিক্ষামূলক কাজে ব্যয় হবে। তিনি বহু পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংস্কার করেন ও সেখানে শিক্ষক নিয়োগ ক'রে ও ছাত্রের যোগান দিয়ে সেগুলিকে বাঁচিয়ে তোলেন। আগ্রা, তাঁর সময় পর্যন্ত, প্রাচ্যের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা এখানে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মত-প্রচারের জন্য সমবেত হতেন।

শাহজাহান যতটা জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন, ততটা শিক্ষাপ্রিয় ছিলেন না। শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা শিক্ষাপ্রসারের জন্য যেসব ব্যবস্থা করেছিলেন, তার কোন পরিবর্তন করেননি। তাঁর রাজত্বকালে দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শিক্ষানুরাগী না হলেও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি হিন্দুদর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। উপনিষদ ও ভগবত-গীতা সহ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার ভারতে আসেন। তিনি ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে একটি হতাশাব্যঞ্জক বিবরণ রেখে গিয়েছেন। বার্ণিয়ারের বিবরণ সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হলেও ভারতের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যে খুব আশাপ্রদ ছিল না, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

ভারতের শেষ বিদ্যানুরাগী মুসলিম বাদশা হচ্ছেন ঔরঙ্গজেব। ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত গোঁড়া হলেও তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। নিজের মাতৃভাষা তুর্কী ছাড়াও তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা অতি সুন্দর বলতে ও লিখতে পারতেন। সমগ্র কোরান ও হাদিস্ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন এবং এই ধর্মান্ধতাই তাঁকে মুসলিম শিক্ষা প্রসারের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যে উৎসাহ নিয়ে তিনি হিন্দুর মন্দির নির্বিচারে ধ্বংস করেছেন ও হিন্দুশিক্ষার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন, সেই উৎসাহ নিয়েই তিনি মুসলিম শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি বড় বড় শহরে বিদ্বান মুসলমানদের জন্য পেন্সন ও ভাতার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ছাড়াও বহু মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাট ও অন্যান্য কয়েকটি সুবার শাসকদের নির্দেশ দেন—প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থীকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। গুজরাটের বোহরা সম্প্রদায়কে শিক্ষিত ক'রে তোলবার জন্য তিনি শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাদের মাসিক পরীক্ষার ফল ও অগ্রগতি সম্পর্কে বাদশাকে নিয়মিত সংবাদ দিতে হত।

রাজকীয় গ্রন্থাগারটি বহু মুসলিম ধর্মগ্রন্থে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেবের সময় শিয়ালকোট ইসলামিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল রূপে খ্যাতিলাভ করে। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ফতোয়া-ই আলমগীরি নামে বিখ্যাত মুসলিম আইনগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। তাঁর রাজত্ব-কালে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মহম্মদ হাসিম 'কাফি খাঁ' এই ছদ্মনামে একখানা ইতিহাস রচনা করেন।

মোঘলযুগে দেখা যায়, জীবনস্মৃতি ও ইতিহাস রচনা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। ঔরঙ্গজেবকে বাদ দিলে মোঘল সম্রাটদের মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষ বিশেষ ছিল না। তার ফলে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। ঔরঙ্গজেব গদীতে বসেই আবার সেই প্রথম যুগের সুলতানদের মত আদেশ দিলেন—'হিন্দু মন্দির আর বিদ্যালয় ধ্বংস কর'। এ ক্ষতি তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন মক্তব আর মাদ্রাসা স্থাপন ক'রে। রাজনৈতিক দিক্ থেকে এর ফল ভাল হয় নি। সাধারণ শিক্ষার কথা বিচার করলেও দেখি এর ফল ক্ষতিকরই হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের পর মোঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগের অবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শিক্ষারও দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। প্রথম বাহাদুর শাহের সময় দিল্লীতে দুটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এর পর নাদির শাহের আক্রমণের পর (১৭৩৯) মোঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব শুধু নামেই টিকে রইল। এর বহু পূর্ব থেকেই ইউরোপীয় মিশনারীদের উদ্যোগে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার গোড়া পত্তন হয়।

।। নারী শিক্ষা ।।

মুসলমান মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও মেয়েরা ঘরেই কোরানের সুরা আবৃত্তি করতে শিখত। রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে বিদ্যার সমাদর ছিল বলে মনে হয়। রাজপরিবারের মহিলারা অনেক সময় রাজনীতিতে বাস্তব শিক্ষা লাভ করতেন। সুলতানা রিজিয়া রাজকার্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। জাহাঙ্গীর শাসন ব্যাপারে নূরজাহানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। মোঘলযুগে মহিলারা রাজকার্যে পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতেন বলে জানা যায়। মোঘল রাজ-অন্তঃপুরে কাব্য ও সাহিত্যের সমাদর ছিল। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম তাঁর ভাইয়ের জীবনী "হুমায়ুন নামা" রচনা করেন। হুমায়ুনের ভাগনী সেলিমা সুলতানা ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। নূরজাহান সুশিক্ষিতা ছিলেন। শাহজাহানের কন্যা জাহানারার আত্মজীবনী বিখ্যাত গ্রন্থ। ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবউন্নিসা বিদুষী ও ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। মুসলিম নারীরা মাদ্রাসা স্থাপন ক'রে শিক্ষার মর্যাদা দিয়েছেন। মাহম অনগ-এর কথা আগেই বলা হয়েছে, মুসলিম সমাজে অবরোধ-প্রথা কঠোর হলেও মক্তবে মেয়েরা সাত বছর পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

।। মক্তব ও মাদ্রাসা ।।

মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র।

প্রত্যেক মসজিদের সঙ্গেই প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্ররূপে মক্তব যুক্ত থাকত। ধর্মীয় রীতিনীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কোরানের অংশবিশেষ শিক্ষার জন্য মুসলিম শিশুকে মক্তবে পাঠানো হত। মসজিদের ইমাম বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সাহায্যে মক্তব পরিচালনা করতেন। হিন্দুদের যেমন বিদ্যারম্ভ বা 'হাতে খড়ি' আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়, মুসলমানদেরও তেমনি মক্তবে পাঠানো একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। শিশুর বয়স যখন চার বছর চার মাস চার দিন, সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিসমিল্লা' নাম স্মরণ ক'রে শিশুকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করা হত। এখানে শিক্ষা সাধারণতঃ কিছু সুরা বয়েৎ মুখস্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এডাম তাঁর সময়ে দেখেছেন, যাঁরা মক্তবে শিক্ষা দিতেন, তাঁদের অনেকে নাম সই পর্যন্ত করতে পারতেন না। যে সব বিষয় পড়ানো হত, তার অর্থও সব শিক্ষক বুঝতেন না। তাঁরা অক্ষর, শব্দ ও তার উচ্চারণ শিখে নিয়ে তাই শিক্ষার্থীদেব শিক্ষা দিতেন। [*"They do not pretend to be able even to sign their names and they disclaim altogether the ability to understand that which they read & teach."—Adam's Report as quoted by K. S. Vakil*]

মক্তবগুলিকে প্রধানতঃ মসজিদ-সংলগ্ন কোরান শিক্ষার স্কুলই বলা যেতে পারে। পড়া মুখস্থ করানোই এখানকার প্রধান কাজ ছিল। শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মক্তবে মৌখিক। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গিয়েছে, মক্তবে প্রাথমিক লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো হচ্ছে।

মুসলিম যুগে মাদ্রাসাগুলি ছিল উচ্চশিক্ষাব কেন্দ্র। মক্তবের মত মাদ্রাসাও সাধারণতঃ মসজিদ-সংলগ্ন থাকত। এখানকার পাঠক্রম ছিল ব্যাপক। ফারসী ভাষার মাধ্যমে এখানে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, আইন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। আকবরেব সময় মাদ্রাসার পাঠক্রম আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল। মাদ্রাসায় আরবী ভাষা ছিল বাধ্যতামূলক। মাদ্রাসার শিক্ষাকে বর্তমান যুগের কলেজের শিক্ষার সমতুল বলে গ্রহণ করা যায়। কোন কোন মাদ্রাসার খ্যাতি ভারতেব বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বহু পর্যটক এসব মাদ্রাসা দেখতে আসতেন।

॥ ফলশ্রুতি ॥

মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে মাদ্রাসায় মুসলিম শিক্ষার্থীরাই শিক্ষালাভ করত। সেকান্দর লোদীর সময় হিন্দুরাও ফারসী ভাষা শিখবার জন্য মাদ্রাসায় আসতে থাকে। সরকারী চাকরির প্রয়োজনেই হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল। মুসলিম যুগে বহু হিন্দু যোগ্যতার সঙ্গে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে দিল্লীর বাদশা ও প্রাদেশিক নবাবদের অধীনে কাজ ক'রে গিয়েছেন।

ভারতে মুসলিম শাসনকালে উর্দু নামে একটি নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়। হিন্দীর সঙ্গে ফারসী ও আরবী ভাষার বহু শব্দ মিশিয়ে এই ভাষাটির সৃষ্টি হয়। হিন্দু ও

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সহজতর ক'রে তোলবার প্রয়োজনেই এ ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। ফারসী হরফে উর্দু ভাষা লেখা হয়। উর্দু কথার অর্থ হচ্ছে 'শিবির'। সৈন্যদের শিবির থেকেই এই ভাষার উদ্ভব হয়েছিল বলে একে 'উর্দু' বলা হয় বলে অনেকে মনে করেন। যেভাবেই সৃষ্টি হোক, উর্দু ভারতের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষা।

মধ্যযুগে হিন্দুদের টোল ও পাঠশালা এবং মুসলমানদেব মাদ্রাসা ও মক্তব উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছে। উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত। মুসলিম সমাজেও শিক্ষকের জন্য একটা মর্যাদার আসন নির্দিষ্ট ছিল। 'সর্দার পোড়ো' প্রথা উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই প্রচলিত ছিল। সুলতানী আমলেই আমরা প্রথম দেখতে পাই, আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সমৃদ্ধি লাভ করছে। প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দী, মারাঠী, বাংলা, ব্রজবুলি প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ এ যুগে সাধিত হয়। বাংলা সাহিত্য বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী, হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। নুসরৎ শাহেব আমলেও মহাভাবতেব বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। ভাগবতেব অনুবাদক মালাধব বসুকে হুসেন শাহ্ "গুণরাজ খাঁ" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় অনুবাদ করান।

মুসলিম যুগে বাংলায় চণ্ডী ও মনসার কাহিনী নিয়ে বহু মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়। এছাড়া ধর্ম-মঙ্গলেব কাহিনী নিয়ে বহু কবি ধর্ম-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মঙ্গল-কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে চণ্ডী-মঙ্গলের রচয়িতা মুকুন্দরামেব নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। মুকুন্দরামের কাব্যে সমসাময়িক সমাজেব ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনের একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এই যুগে রাধাকৃষ্ণের কাহিনীকে উপজীব্য ক'বে বহু বৈষ্ণব কবি অজস্র পদ রচনা করেন। বাংলার বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ কবি বলে পূজিত হন। বিদ্যাপতির সমকালীন কবি চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকে শেষভাগে বীরভূম জেলার নান্নুরে আবির্ভূত হন। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হলেও তিনি বাংলার বৈষ্ণব সমাজেই বিশেষ সমাদৃত।

চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে এই যুগে রচিত চরিতগ্রন্থসমূহ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। মহাপ্রভুর জীবনী গ্রন্থসমূহের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পূর্বে লিখিত হয়। তৎকালীন বাংলার ও বাঙ্গালী জীবনের ব তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে চৈতন্য-জীবন সম্পর্কে নতু কথা আছে। ত্রিলোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদের কাছে বিশেষ প্রিয়। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। 'চৈতন্যচরিত' গ্রন্থ সমূহে মধ্যে এর স্থান 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পরেই বলে অনেকে মনে করেন।

মুসলিম যুগে বাংলার মত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষাতেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়। মুসলমান শাসনকালে ভারতে কয়েকজন যুগপ্রবর্তক ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়। সেইসব নেতার ধর্মীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে আঞ্চলিক সাহিত্য-সমূহ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের এত সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। রামানন্দ ও কবীর হিন্দিতে তাঁদের বাণী প্রচার করেন। তাঁদের রচিত দোঁহা হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নামদেবের চেষ্টায় মারাঠা ভাষার উন্নতি হয়। নানক ও তাঁর শিষ্যদের প্রচেষ্টায় ও রচনায় পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী ভাষার উন্নতি হয়। মীরাবাঈ ও অন্ধ কবি সুরদাসের রচনা ব্রজভাষাকে সমৃদ্ধ করে। হিন্দী সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও ধর্মপ্রাণ হিন্দী ভাষা-ভাষীদের নিত্যপাঠ তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' এই যুগে রচিত হয়।

সুলতানী আমলে ইতিহাস-বচনায় এক বিস্ময়কর আগ্রহ দেখা যায়। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, জিয়াউদ্দীন ববণী, সামস্‌-ই-সিরাজ আফিফ, আজ-উদ্দীন খালিদ খানী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের বচনায় সুলতানী যুগেব ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারি। এই ইতিহাস রচনাব ধারা মোঘল যুগেও অব্যাহত ছিল। তারিখ-ই-আল্‌ফি, আইন-ই-আকবরী, আকবর নামা, মাসির রহিমী প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আকবরের সময় রচিত হয়।

প্রাচীন ভারত ছিল ইতিহাসবিমুখ। ইতিহাস ও জীবনস্মৃতি রচনায় হিন্দু যুগে কোন প্রচেষ্টা দেখি না। মুসলিম যুগ ইতিহাস ও জীবনস্মৃতি বা জীবনী-রচনায় সমৃদ্ধ। বাবরের জীবনস্মৃতি, হুমায়ুনের জীবনী, জাহাঙ্গীবেব জীবনস্মৃতি, শাহজাহান-নামা, আলমগীব-নামা প্রভৃতি জীবনী মোঘলযুগে রচিত হয়। মুসলিম যুগেই বাংলাসাহিত্যে প্রথম চবিত-সাহিত্য রচিত হয়। সাহিত্য শুধুমাত্র দেবদেবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেবোপম মানুষের জীবনী বাংলায় বচিত হয়।

মুসলিম শিক্ষা প্রধানতঃ ব্যক্তিবিশেষের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মুসলিম যুগের সমৃদ্ধির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসাগুলি চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। ব্যক্তি-নির্ভরশীলতার জন্য মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা কোনদিনই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারে নি। তবুও ধর্মশিক্ষার কেন্দ্ররূপে মসজিদ-সংলগ্ন মক্তবগুলি চিরদিনই মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছে। মক্তবগুলি যদি শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে লৌকিক শিক্ষার দিকে একটু দৃষ্টি দিত, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরক্ষরতা এতটা ব্যাপক হত না।

অষ্টম অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি লেখা, পড়া ও সামান্য গণিত শেখবার ব্যবস্থা করা। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় (Knowledge of 3 R's)। বর্তমান যুগে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে যা বোঝানো হয়, অতি প্রাচীন যুগে ভারতে সে অর্থে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ চালাবার মত শিক্ষাই যে শিক্ষাদর্শের শেষ কথা, সেরূপ শিক্ষাদর্শ প্রাচীন ভারতীয়দের মনে কোনদিন রেখাপাত করেনি। আদি ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেদশিক্ষাই ছিল শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। বেদের আদিযুগে আর্যরা লিপির ব্যবহার জানত কিনা, এ-সম্পর্কে মতভেদ আছে। লিপির ব্যবহার যখন আর্য সমাজে প্রচলিত হল, তখনও বেদকে লিপিবদ্ধ করবার পথে অনেক বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। তাই প্রথম যুগে শিক্ষার প্রধান প্রশ্ন ছিল লেখাপড়া শেখা নয়, প্রধান প্রশ্ন ছিল সঠিকভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, হ্রস্ব-স্বর, দীর্ঘ-স্বরের পার্থক্য, বৈদিক মন্ত্রেব সঙ্গে সংযোজিত হলে শব্দেব উচ্চারণ ও অর্থভেদ, এই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিষযবস্তু। লৌকিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা তখন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বেদশিক্ষাব প্রস্তুতিই ছিল বাল্যের শিক্ষা।

খ্রীঃ পূঃ ১০০০ শতাব্দীর পূর্বেই আর্যরা লিপিব ব্যবহার শুরু করেছিল, এব বহু প্রমাণ আছে। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে গ্রীক লেখক নিয়র্কস ও কিউ কার্টিয়ার্স লিখে গেছেন—ভারতীয়রা গাছের বাকল ও কাপড়েব উপর লিখত। এর কিছুদিন বাদে গ্রীক দূত মেগাস্থানীস লিখেছেন—ভারতীয়রা পথের দূরত্ব-নির্দেশক মাইলস্টোনের ব্যবহার করত। দেশের প্রচলিত অলিখিত নির্দেশ অনুসারে বিচাবকার্যাদি হত বলে মেগাস্থানীস বলেছেন, ভারতীয়রা লিখতে জানত না। মনে হয়, সেই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ও সাধারণের মধ্যে সরকাবী নির্দেশ প্রচার ইত্যাদি কার্যেই লিপির ব্যবহার হত। সাহিত্য, কি ধর্মশাস্ত্রসমূহ, বহুদিন পর্যন্ত অলিখিত ছিল বলেই অনুমান করা হয়। মেগাস্থানীসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার কিছু পরেই অশোকের শিলালিপি ও অনুশাসন সমূহ ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত হয়ে সাধারণে প্রচারিত হয়েছিল। মেগাস্থানীসের ৫০ বছরের মধ্যে অশোকের শিলালিপি ও অনুশাসনে ব্রাহ্মীলিপির যে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, মেগাস্থানীসের মন্তব্য—'ভারতীয়রা লিপির ব্যবহার জানত না', তা গ্রহণযোগ্য নয়।

খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৪৫০ অব্দে লেখা 'শীল' নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে ছেলেদের বহুবিধ খেলার উল্লেখ করা হয়েছে। বহু খেলার মধ্যে একটি হচ্ছে 'আক্ষরিকা'। এই খেলায় ছেলেরা একজন অপর জনের পিঠে আঙ্গুল দিয়ে বা শূন্যে আঙ্গুল দিয়ে কিছু লিখত, তা অপরজনকে অনুমান ক'রে বলতে হত। লিপির ব্যবহার প্রচলিত না হলে

এ খেলার উদ্ভব সম্ভব ছিল না। মহাবগ্‌গের একটি কাহিনী থেকে জানা যায়—রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর) উপালি নামে একটি ছেলের বাবা ও মা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মহা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা প্রথমে স্থির করল ছেলেকে লিখতে শেখানো হবে—কিন্তু তাতে ছেলের আঙ্গুলে ব্যথা পাবার সম্ভাবনা আছে। তারপর ঠিক হল, অঙ্ক শেখানো হবে, কিন্তু তাতেও অসুবিধা আছে—ছেলের বুকে ব্যথা হবে। তাহলে রূপ (ব্যবসা ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্ক) শেখানো যাক—কিন্তু তাতে বাছার চোখের ক্ষতি হবে। শেষে ঠিক হল—এসব হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে উপালি বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ দেবে। তাই দেখা যাচ্ছে, মহাবগ্‌গ যখন লেখা হয়, তখন লেখা, পড়া ও অঙ্ক শেখবার ব্যবস্থা ছিল। হস্তীগুম্ফার খোদিত শিলালিপিতে (খ্রীঃ পূঃ ১৫৭ বা ১৪৮ অব্দ) কলিঙ্গের রাজা খারবেলের শিক্ষার যে বর্ণনা আছে, তা থেকে জানা যায়, তিনি লেখা-পড়া-রূপ—সবই বাল্যে শিখেছিলেন। ললিত-বিস্তব থেকেও শিশুদের লেখাপড়ার কথা জানা যায়। অশোক রাজ্যেব বহু স্থানে পাহাড়ের গায়ে, স্তম্ভে ব্রাহ্মী লিপিতে প্রজাদের জন্য অনুশাসন লিখে দিয়েছিলেন। রাজকীয় নির্দেশ জারী ক'রে আঞ্চলিক ভাষায় শিলালিপির বহুল ব্যবহাবে মনে হয়, সাধারণের মধ্যে লেখাপডার বহুল প্রচলন ছিল বলেই এসব অনুশাসন প্রচারিত হয়েছিল।

লিপিব ব্যবহার প্রচলিত হবাব পর লেখা ও পডা প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়। বেদশিক্ষা মৌখিক হলেও ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কাব প্রভৃতি লিখে শিখবার পথে কোন অন্তরায় ছিল না। বেদশিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর পক্ষে এসব শেখা অত্যাবশ্যক ছিল। লিপির ব্যবহাব চালু হবাব পর শিক্ষার্থীবা লিখে শিখবার সুযোগকে অবহেলা কবত বলে মনে হয় না। লিপির ব্যবহার শুরু হবার পরও বহুদিন পর্যন্ত বেদ লিপিবদ্ধ হয়নি--তাই বেদ গুরুর কাছে মুখে শুনেই শিক্ষা করতে হত।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের উপনয়ন ছিল বাধ্যতামূলক সংস্কার। খ্রীস্টজন্মের পূর্বে উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়ে সবাইকে উপনয়নের পব বেদশিক্ষা করতে হত। তাই তিন বর্ণের মধ্যে সেই যুগে শিক্ষিতের হাব খুব বেশী ছিল বলেই মনে হয়। ছান্দগ্য-উপনিষদে এক বাজা গর্ব ক'রে বলেছিলেন—তাঁর রাজ্যে কোন অশিক্ষিত নেই। তখনও প্রাকৃত ভাষার লিখিত রূপ হয়নি, তাই প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতই শিখতে হত। প্রাথমিক ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, ছন্দ ও গণিত প্রাথমিক পাঠক্রমের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয়। সে যুগে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার কি ব্যবস্থা ছিল, সে সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা নেই। প্রথম অবস্থায় পরিবারের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পবে বৈদিক শিক্ষার জন্য শিশুকে গুরুগৃহে পাঠানো হলে সেখানে গুরুই প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। কোন কোন অঞ্চলে মনে হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কারণ জাতক থেকে জানা যায়, ধনীর পুত্ররা যখন পাঠশালায় যেত, তখন ভৃত্যরা তাদের কাষ্ঠফলক (শ্লেট) নিয়ে তাদের অনুসরণ করত। এসব স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় কিভাবে পরিচালিত হত, কারা শিক্ষকতা করতেন, কি ক'রে ব্যয় নির্বাহিত হত, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে

পারিনি। ললিত-বিস্তর থেকে জানা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে "লিপিশালা" ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে 'দ্বারকাচার্য' বলা হত। অনুমান করা হয়, বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধভিক্ষুরা বিহারের নিকটবর্তী গ্রামের শিশুদের শিক্ষা দিতেন। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই গ্রামের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষায় দায়িত্ব গ্রহণ করত। ভারতে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মধ্যেও সেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল মনে হয়। খ্রীস্টজন্মের পর থেকে দেখা যায়, আমাদের সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা একটা সুনির্দিষ্ট স্থান লাভ করেছে। শিশুর পাচ বছর বয়সে "বিদ্যারম্ভ" সংস্কার বা "অক্ষরস্বীকরণ" সংস্কারের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত। শুভদিন দেখে শিশুকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হত। চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা ছ' বছর বয়সে শুরু হত অক্ষর-পরিচয়, যুক্তাক্ষর-পরিচয় প্রভৃতি শিখতে প্রায় ছ' মাস ব্যয় হত। গণিতের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রায় এক বছর লাগত। খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দ থেকে ২৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রাকৃতের প্রাধান্যের যুগ। তাই শিক্ষার্থীকে প্রাকৃত শিখতে কিছু সময় ব্যয় করতে হত। ২৫০ খ্রীস্টাব্দের পর আবার সংস্কৃত প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় থেকে তাই প্রাথমিক শিক্ষা আবার সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যায়ে ৮—১১ বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে কিছু কিছু পাণিনির সূত্র ও সহজ ব্যাকরণের সূত্র অভ্যাস করতে হত।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উল্লেখ খুব কমই পাওয়া যায়। সর্বসাধারণের জন্য লিপিমালা প্রথম অবস্থায় খুবই কম ছিল বলে অনুমতি হয়। এই স্তরে শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ পরিবার-নির্ভর—এছাড়া শিক্ষক নিজগৃহে বা শিক্ষার্থীর গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন। পরিবারের পুরোহিতের হাতে বহু দিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। ঠিক কিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালযসমূহের উদ্ভব হয়েছিল, একথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার অব্যবহিত পূর্বে যেসব দেশীয় পাঠশালা আমাদের দেশে ছিল, তার উদ্ভবের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে সে যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্ভব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

প্রতি গ্রামের গ্রাম্যদেবতার পূজার জন্য নির্দিষ্ট পূজারী ছিল। গ্রামের মন্দিরের পুরোহিত অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। তিনি দেবতার জন্য নির্দিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করতেন। ছাত্রদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাদত্ত বেতন বা গুরুদক্ষিণা থেকেও তাঁর কিছু কিছু আয় হত। বহুগ্রামে মন্দির-সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্য পাঠশালা দেখে অনুমান করা হয়, প্রাচীন যুগে কোন কোন স্থানে এই ভাবেই পাঠশালার উদ্ভব হয়েছিল।

কোথাও জমিদার বা গ্রামের বিত্তবান কোন লোক নিজের সন্তানের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতেন। গ্রামের আর পাঁচটি ছেলেও সেই সঙ্গে সেই গুরুমহাশয়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করত। সেই বিত্তবানের নিজগৃহের কোন অংশে বা ভিন্ন ঘরে এমনি ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

শুধুমাত্র রোজগারের উপায়রূপেও অনেক সময় যে-কোন বর্ণের সামান্য শিক্ষিত লোক পাঠশালা খুলে বসত। এজাতীয় বহু পাঠশালার সন্ধান এডাম ও ওয়ার্ড বাংলাদেশে পেয়েছেন।

কোন কোন জায়গায় স্থানীয় বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজ নিজ শিশুদেব পৈতৃক বৃত্তিতে পারদর্শী ক'রে তোলবাব জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করত। একে মহাজনী বিদ্যালয় বলা হত। দক্ষিণ ভাবতে মহাজনী বিদ্যালয়গুলি বহুদিন পর্যন্ত টি'কেছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্ভব সম্পর্কে এর থেকে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোড়া পত্তন হয়েছিল, তা বোঝা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উচ্চশিক্ষা দানে যেমন ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার ছিল—প্রাথমিক শিক্ষায় সব বর্ণের লোকেরই শিক্ষকতার অধিকার ছিল, এবং সব বর্ণের লোককেই শিক্ষকতা কবতে দেখা গিয়েছে। স্মৃতির যুগ থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ শিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছিল বলে জানা যায়। কোন কোন স্মৃতিতে অব্রাহ্মণ-শিক্ষকের নিকট ব্রাহ্মণ-শিশুব প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয় সর্বত্র একরূপ ছিল না। যেখানে পণ্ডিত মহাশয় নিজ দায়িত্বে বিদ্যালয় স্থাপন করতেন, সেখানে তাকে ছাত্রদের স্বেচ্ছাদত্ত বেতন ও বিভিন্ন পাল-পার্বণে, পূজা-শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে পাওয়া দানেব উপর নিভর করতে হত। ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হবাব সময় বাংলার গ্রাম্য শিক্ষকগণ মাসিক তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেন। মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষকগণ শস্যের ভাগ পেতেন—তবে এ-প্রথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না।

যে যুগে কাগজ ও বই মিলত না, সে যুগে প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে দেওয়া হত, তা কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। সে যুগের শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। ধনী সন্তানবা কাঠের ফলকেব উপর রং দিয়ে লিখত। পেশোয়ার মিউজিয়ামে একটি বুদ্ধমূর্তি ছিল, তাতে দেখা যায়, বুদ্ধদেব একটি চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডে লিখন-রত। গরীব ছেলেরা মাটির উপর বালু বিছিয়ে লিখত। পেন্সিল না থাকায় আঙ্গুল বা কাঠি দিয়ে একটির পর একটি অক্ষর লিখে বর্ণমালা লিখতে শিখত। শিক্ষক একটি বর্ণ লিখতেন —শিক্ষার্থীরা সমস্বরে তা উচ্চারণ ক'বে কাষ্ঠফলক বা বালুর উপব লিখত। খ্রীস্টজন্মের পর বর্ণপরিচয়ের যে পদ্ধতি প্রচলিত হয়, আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় বর্ণপরিচয়ের সেই পদ্ধতিই বজায় ছিল বা আছে। গুণের নামতা সমস্বরে আবৃত্তি ক'রে পড়বার পদ্ধতিটিও অতি প্রাচীন। গুরুমহাশয় বা সর্দারপোড়ো প্রথম নামতা আবৃত্তি করত, তারপর অন্যান্য পোড়োরা তা সুরে আবৃত্তি করত। এমনি ভাবে প্রাথমিক গণিত শিক্ষার পদ্ধতি আধুনিক যুগেও দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়বার মত পাঠ্যপুস্তক গত শতাব্দীর শেষ দিকেও সহজলভ্য ছিল না। শিক্ষার্থীদের যা কিছু শেখবার গুরুমশায়েব কাছে মুখে শুনেই শিখতে হত। বালুতে লেখা কিছুটা রপ্ত হলে গুরুমহাশয় তালপাতায় লোহার শলা দিয়ে অক্ষর লিখে ছাত্রদের দিতেন। ছাত্ররা

কাঠের কয়লার তৈরি ভূষো কালি দিয়ে খাগের কলমে তার উপর লিখত। লেখা হয়ে যাবার পর কালি মুছে ফেলে আবার সেই পাতায় লেখা চলত। একই তালপাতা দিনের পর দিন ব্যবহার করা যেত। হাত কিছুটা লেখার উপযুক্ত হলে ছেলেরা নিজেরাই কলাপাতার উপর লিখত। তারপর নিজেরা তালপাতায় লেখার অভ্যাস করত। বই না থাকায় লেখার উপর বেশী জোর দেওয়া হত। হাতের লেখা ভাল করবার চেষ্টা প্রথম থেকেই করা হত। সুন্দর হাতের লেখাকে সে যুগে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হত।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হত, তাকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় টোলের উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব বলে গ্রহণ করা যায় না। টোলের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, সাধারণ মানুষ একে প্রয়োজনীয় শিক্ষা (useful knowledge) বলেই গ্রহণ করেছিল। সাধারণভাবে মাতৃ-ভাষায় পড়তে, চিঠি লিখতে, কাজ চালানোর মত হিসাব শিখতে পাঠশালার শিক্ষাই যথেষ্ট ছিল। (আঞ্চলিক ভাষাগুলি লিখিত রূপ পাবার আগে প্রাথমিক শিক্ষাতেও সংস্কৃতের একাধিপত্য ছিল)। এছাড়া, গুরুমহাশয়ের কাছে মুখে মুখে শুনে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীও শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করত। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় মক্তবকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। ('মুসলিম শিক্ষা' অধ্যায় দেখুন।) মক্তবে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল, মুসলিম শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় আচরণ শিক্ষা দেওয়া। এজন্য কোরানের নিত্যপ্রয়োজনীয় অংশবিশেষ, হাদিসের কিছু অংশ এখানে শেখানো হত। আনুষঙ্গিকরূপে কোন কোন মক্তবে সামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পাঠশালায় ধর্মীয় আচরণ শিক্ষার কোন আয়োজন ছিল না —পুরাণের বা হিতোপদেশের কাহিনীর মধ্য দিয়ে নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

যতদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়ন-প্রথা প্রচলিত ছিল, ততদিন প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল বলে মনে হয়। বিদ্যারম্ভ বা অক্ষর-স্বীকরণ সংস্কারের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবর্ণের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। ডাঃ আলটেকার অনুমান করেন, খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে ত্রিবর্ণের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৮০ জন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পর থেকে মেয়েদের এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের মধ্যে থেকে উপনয়ন-প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। তাই উপনয়নের অপরিহার্য অঙ্গরূপে শিক্ষার যে ব্যবস্থা এদের মধ্যে ছিল, তাও বন্ধ হয়ে যায়। শূদ্ররা ব্রাহ্মণ্য-যুগে কোনদিনই লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি, অথচ তাদের সংখ্যাই ছিল প্রচুর। তারপর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার চাপ কমে যাওয়ায় অতি অল্পসংখ্যক লোক শিক্ষা গ্রহণ করত। এছাড়া, মেয়েরাও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে দেশে সাক্ষরের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল।

ভারতের গুপ্তযুগ সংস্কৃতের সমৃদ্ধির যুগ। গুপ্তযুগের অবসানের পর সংস্কৃতের প্রাধান্য

কমতে থাকে। সাধারণ লোক সংস্কৃত বুঝত না। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে একটা সুসংহত রূপ নেয়। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভাষাই প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়ের কিছু কিছু শিলালিপিতে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষায় আঞ্চলিক ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল দৈনন্দিন জীবনের কাজ চালানোর মত প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া। তাই আঞ্চলিক ভাষাগুলির উদ্ভব হলে স্বাভাবিক-ভাবেই লেখা-পড়া ও প্রাথমিক গণিত শেখানোতে আঞ্চলিক ভাষা প্রাধান্য লাভ করে।

প্রাচীন যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্ভব, পাঠক্রম, শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষক প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা কোন বিস্তৃত বিবরণ পাইনি। মুসলিম যুগের অবসানে ও আধুনিক যুগের শুরুতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য পাঠশালার যে চিত্রটি আমরা পাই, তা থেকেই সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পাঠশালার রূপ কল্পনা ক'রে নিতে হয়।

ভারতের গ্রাম্য পাঠশালাসমূহে প্রায় একই রকম শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আধুনিক সমালোচকগণ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিব ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে মুখর হলেও দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রশংসার দিক্‌ও আছে। দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত। যোগ্য শিক্ষার্থী আপন যোগ্যতা-বলে এগিয়ে যেতে পারত—শ্রেণীগত শিক্ষায় যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রকেও অপেক্ষা কবতে হয় সমগ্র শ্রেণীর জন্য। ব্যক্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থায় মেধাবী ছাত্রকে এগিয়ে যাবাব জন্য বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হত না। এর ফলে প্রতিভার অপচয়ের সম্ভাবনা কম ছিল।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিক্ষার্থীকে গুরুমহাশয় তাঁর কাজের সাহায্যেব জন্য নিয়োগ করতেন। এর ফলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অভাব কিছুটা পূর্ণ হত। এই প্রথাই পববর্তী কালে Monitorial System নামে ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়েব সাহায্য ক'রে দেশের ভবিষ্যৎ গুরুমহাশয়দেব "Practice teaching"-এর কাজটা ছাত্র-জীবনেই অনেকটা এগিয়ে থাকত।

আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পডাব আগে লেখা শেখার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় যখন লিপির ব্যবহার শুরু হয়, তখন প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে পড়ার আগে লেখা শেখানোর রীতিই অনুসৃত হত। বালুর উপর লেখা, তালপাতায় দাগা বুলিয়ে হাতের মাংসপেশীকে লেখায় অভ্যস্ত করা, এসব বহুদিন থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীন যুগে যে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল, বহু ভাঙ্গাগড়া ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও সেই শিক্ষাপদ্ধতি গ্রামীণ ভারতের শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছে। মুসলিম যুগে রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্ব গৌরবের আসন থেকে বঞ্চিত হয় ও ভারতে একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। আধুনিক শিক্ষা-রীতি চালু হবার বহু দিন পরও দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল জনপ্রিয় শিক্ষাব্যবস্থা। এডাম, মনরো, থমসন প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌রা এই সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার ক'রে এর উপর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি-স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন।

নবম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার অবদান

ভারতের শিক্ষা ধর্মভিত্তিক। প্রাচীন ঋষিরা জীবনে যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সত্যের আলোকে তাঁরা আমাদেব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। শক্তিমান আর্যঋষিরা তাঁদের জীবনে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন—মানুষের মনে এক আনন্দময় শুদ্ধ চেতনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে—তাঁবা চেয়েছিলেন, মানুষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার সেই সত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করুক। অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিজের অমব সত্তার সন্ধান পাওয়া বা পূর্ণতা লাভ করাই হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য। একেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—*"The manifestation of Perfection already in man."*

বহুশত বর্ষ আমবা পাব হয়ে এসেছি—সে যুগের শিক্ষাব আদর্শ আজ শুধু ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। প্রাচীন জীবনেব ধারা ও শিক্ষাদর্শ—দুই থেকেই আমরা বিচ্ছিন্ন। আত্মোপলব্ধির আদর্শ অপেক্ষা বস্তুতান্ত্রিক জগতের সাফল্যলাভই আমাদের জীবনেব পরম কাম্য। শ্রেয়ঃবোধ যখন এমনিভাবে বদলে গিয়েছে, তখন তপোবনের শিক্ষাব মূল্যায়নের কি প্রযোজন?

পরিপূর্ণতার বিকাশ বা অমৃতত্বলাভই জীবনের শেষ কথা হলেও আর্য ঋষিরা জগতে বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় লৌকিক শিক্ষার উপযোগিতার কথাও স্বীকার কবেছেন। উপনিষদে বিদ্যাকে পরা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই লৌকিক বিদ্যার মূল্য স্বীকৃত, কিন্তু ঋষিরা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক কবেছিলেন, একেই যেন আমরা জীবনের শেষ কথা বলে গ্রহণ না করি। তাই উপনিষদেব ঋষি বলেছেন, মানুষের সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির জন্য লৌকিক-বিদ্যা বা অপরা বিদ্যার প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের চবম সত্যকে উপলব্ধি করবাব জন্য তাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে হবে। যে আধ্যাত্মিক চিন্তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র লৌকিক জ্ঞান-অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ কবে, সে অজ্ঞতার তিমিরেই ডুবে থাকে। তেমনি সে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-অর্জনেব জন্য তাব সর্বশক্তি নিয়োগ করে, তাহলে সে আরও বেশী অন্ধকাবে তলিয়ে যায়—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে
অবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ বিদ্যায়াং রতা। (ঈশউপনিষদ)

আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে হলে লৌকিক-বিদ্যা (Secular Knowledge) ও শুদ্ধ-বিদ্যা (Spiritual Knowledge) দুয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। ভারতের শিক্ষায় জড়-বিজ্ঞান ও ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়েছিল। উপনিষদে আছে, বিদ্যা ও অবিদ্যা

ধারা যুক্ত ক'রে দেখেন, তাঁরাই সত্য দেখেন। শুধুমাত্র বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি লাভ হলেই যদি জীবনে শান্তি আসত, তাহলে জড়বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত ক'রেও পাশ্চাত্ত্য জগতে এত অস্থিরতা দেখা দিত না। কল্যাণের পথ, যে পথ হিংসায়-উন্মত্ত পৃথিবীকে বাঁচবার পথের সন্ধান দিতে পারবে, সে পথের নির্দেশ জড়-বিজ্ঞান দিতে পারেনি। সে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন ভারতের আর্য ঋষিরা। নিজেকে জানা—মানুষের মধ্যে দেবত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরা,—সেই দেবত্বকে উদ্বোধিত করাই ছিল ভারতের শিক্ষার শেষ কথা।

ভারত বহু ধর্মমতেব জন্মভূমি। অসাম্প্রদায়িকতা ভারতের অতি প্রাচীন আদর্শ। ভাবত চিরদিনই পরমত ও পবধর্ম সহিষ্ণু। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তরাজদের আর্থিক সহায়তা না পেলে বৌদ্ধশিক্ষার সবশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নালন্দা মহাবিহার গডে উঠতে পারত না। আজকের ভাবতের রাষ্ট্রাদর্শ—ধর্ম-নিবপেক্ষতা। কিন্তু একথা যেন আমরা মনে না কবি যে, আমাদেব ধর্ম-নিরপেক্ষতার অর্থ ভারত ধর্মবিবর্জিত দেশ। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ—একথার অর্থ এই নয় যে; আমাদের দেশ ধর্মহীন। মাত্রাহীন ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের চিন্তায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে, তার ফল সমাজ-জীবনে অতি বিষময়রূপে দেখা দেবার আশঙ্কায় আজ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই শঙ্কিত। শুধুমাত্র জড-বিজ্ঞানেব সাধনায় একটা জাতির ভবিষ্যৎকে গডে তোলা যাবে না। বস্তুতান্ত্রিক সমৃদ্ধিব মধ্যে জীবনেব সব সমস্যার সমাধান নিহিত থাকলে পশ্চিম জগতে আধ্যাত্মিক পিপাসা এত তীব্রভাবে দেখা দিত না। ধর্ম বলতে কোন একটা পদ্ধতি বোঝায় না। যে শিক্ষা মানুষেব বুদ্ধিকে মার্জিত করবে, যে শিক্ষা আমাদের কল্যাণেব পথে নিয়ে যাবে, আমাদেব শ্রেয়ঃবোধকে উদ্বোধিত করবে—তাকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাব্যবস্থা গডে তুলতে চাইলে সে শিক্ষা হবে নীতিজ্ঞানহীন শিক্ষা। আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যদি আমরা ভবিষ্যৎ ভারতের নাগবিকদের গড়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদেব লৌকিক শিক্ষা আব শুদ্ধ-শিক্ষার সমন্বয় করতে হবে। পবা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা জীবনে দুই-ই প্রয়োজনীয়—তাই আর্যঋষিরা উভয়কে তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গ্রহণ করেছিলেন।

ইউবোপীয়দের আগমনের পব এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মিশনাবীবা ধর্মপ্রচার ও ভারতীয়দের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য ভারতে শিক্ষা-বিস্তাবে এগিয়ে আসেন। বণিক ইংরেজ নবলব্ধ সাম্রাজ্য রক্ষা ও ব্যবসায়িক স্বার্থে শিক্ষাব লক্ষ্য ও আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভারতে শিক্ষাবিস্তাবের লক্ষ্য সম্পর্কে ইংবেজ মনোভাব উডের ডেসপ্যাচে স্পষ্ট ভাষায ব্যক্ত হয়েছে—নৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি ও ইংলণ্ডের কারখানার জন্য ভারতীয় কাঁচা মালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল কোম্পানীর শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্য। ইংরেজ শাসনকালে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসকে আলোচনা করলে দেখা যায়, উডের ঘোষিত নীতিই প্রায় একশ' বছর ভারতের শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন

অনুভূত হয় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার। জাতীয় শিক্ষা হবে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক। জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি তার প্রধান বাহন, জাতীয় আদর্শ মুখ্য উপজীব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হচ্ছে, সে শিক্ষা মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাধারা আলোচনা করলে এর অসারতাই প্রমাণিত হয়। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য লৌকিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুধাবন করলে লৌকিক শিক্ষা বা অপরা বিদ্যার যে রূপটি আমরা দেখতে পাই, তাতে দেখা যায়, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই লৌকিক শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না। যে সমাজের ভিত্তি ধর্ম, সেই সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার লক্ষ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীর ধর্ম-জীবন ও নৈতিক জীবন যাতে গড়ে উঠতে পারে, তার সহায়তা করা। ধর্ম ও নীতির উপর প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। আমাদের শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমন্বয়সাধন। এই সমন্বয়ই হচ্ছে ভারতের অন্তরাত্মার বাণী। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা শিক্ষাক্ষেত্রেও সাফল্য লাভ করেছে। বহু দেশের পর্যটকগণ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয়দের চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে যে উচ্ছ্বসিত বিবরণ রেখে গেছেন, তা এই শিক্ষারই ফল। খ্রীস্টজন্মের পূর্বে মেগাস্থানিস, পিলনি, স্ট্রাবো প্রভৃতি বৈদেশিকগণ বলেছেন—ভারতীয়রা সাধারণতঃ মিথ্যা কথা বলত না, তারা তাদের গৃহ অরক্ষিত রাখত—চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দেশে মামলা-মকদ্দমা ছিল না, কোনকিছু গচ্ছিত রাখবার সময় সাক্ষীসাবুদের দরকার হত না—মানুষ বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে কাজ করত। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙ্ ও আরও পরে ই-ৎসিঙ্ ভারতীয়দের নীতিজ্ঞান ও নৈতিক জীবনের মান সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আরও পরবর্তী কালে ইউরোপ ও আরব পর্যটকরা যেসব বিবরণ রেখে গিয়েছেন, তাতে তাঁরা ভারতীয়দের সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সৎ, ন্যায়পরায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নীতিবোধ সম্পর্কে মানুষ উচ্চ ধারণা পোষণ করে না, কিন্তু মার্কোপোলো ভারতের ব্যবসায়ী সম্পর্কে বলেছেন—*"You must know that these Brahmanas are the best merchants in the world and the most truthful, for they would never tell a lie for anything on the earth. If a foreign merchant, who does not know the ways of the country, applies to them and entrusts his goods to them, they would take charge of these and sell them in the most zealous manner, seeking zealously the profit of the foreigners and asking no commission except what he pleases to give."*

(Yule, Marcopolo, Vol. II, as quoted by Dr. A. S. Altekar.)

বিদেশী পর্যটকরা ছিলেন তীক্ষ্ণ সমালোচক। কোন দোষত্রুটিকে তাঁরা ক্ষমার চোখে

দেখতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত পর্যটক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতীয়দের নীতিবোধ ও উচ্চ চরিত্র সম্পর্কে প্রশংসা ক'রে গেছেন। এর থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য উন্নত জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় চরিত্রের নিন্দাসূচক কোন বিবরণী আমরা পাই নি।

চরিত্র-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-গঠন ছিল প্রাচীন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এদিক্ থেকেও ভারতীয় শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। শিক্ষাকে যদি বলা যায় জীবনের প্রস্তুতি, তাহলে দেখি, ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ সত্য স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

মুসলিম-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাণশক্তির অভাব সূচিত হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নানা নিয়মকানুনের বন্ধনে যেভাবে সমাজ-জীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে দেয়, তার ফলে হিন্দুসমাজ তার পূর্ব গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা সংস্কারের বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে একটি প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার অপমৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। এক সময়ে ভারত চিকিৎসা-বিদ্যায় অত্যন্ত উন্নত ছিল। ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান ভারতের বাইরেও সমাদৃত হত। কিন্তু যেদিন সমাজের নির্দেশে চিকিৎসকদের মধ্যে শব-ব্যবচ্ছেদ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন থেকে চিকিৎসা-বিদ্যার অবনতি শুরু হল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ বহু পূর্বেই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের কারণ জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু সত্যকে জেনেও ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্যের মত পণ্ডিত সেই সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে সাহসী হন নি। পুরাণের রাহুকেতুর চন্দ্র-সূর্য গ্রাসের কাহিনী জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও মেনে নিয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক কারণ দু'টির উল্লেখ ক'রে তাঁরা পৌরাণিক কাহিনীকেই সঠিক বলে রায় দিয়েছেন। একমাত্র আর্যভট্টই পুরাণের গল্পকে ভ্রান্ত বলেছেন, কিন্তু জোরের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রচার করতে সাহসী হন নি। মধ্যযুগে হিন্দুদের স্বাধীন চিন্তা প্রায় লোপ পেতে বসে। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছে, ততদিন তাঁদের সৃজনশীল মনের মৌলিক চিন্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। নবম কি দশম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় মনে জড়ত্ব দেখা দেয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাণশক্তি হারিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে এক গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তারপর মুসলিম বিজয়ের পর থেকে হিন্দু-সমাজ 'কূর্মবৃত্তি' অবলম্বন করে। তার চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রকে সংকুচিত ক'রে সমাজকে কতগুলি কঠিন নিয়মের নিগড়ে বেঁধে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। যে হিন্দুরা সুদূর যাভা, সুমাত্রা, বলীদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, মধ্যযুগে সেই হিন্দু সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। এমনি ক'রে ভারতীয় হিন্দুসমাজ নিজের গণ্ডিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ক'রে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব স্বীকার ক'রে নেয়। মৌলিক চিন্তার সঙ্গে মৌলিক সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়। প্রায় একহাজার বছর হিন্দু পণ্ডিতরা টীকা-টিপ্পনি, ভাষ্য, ব্যাখ্যা ছাড়া উল্লেখযোগ্য

কোন মৌলিক রচনায় ব্রতী হয় নি। মুসলিম বিজয়ের পর ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অতি শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অতি কষ্টে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর অতি প্রাচীন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়।

একটা জাতিকে গড়ে তুলতে হলে তা উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সম্ভব। আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে যেভাবে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তা দেখে মনে হয়, আমাদের দেশের শিক্ষাজগতের ভাগ্য-বিধাতারা আজও শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু আমরা যেভাবে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার রূপ দিতে যাচ্ছি—তাতে সত্যি আমাদের জাতীয় ভাবধারা পুষ্ট হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। পৃথিবীর কোন সুসভ্য জাতির ইতিহাসে শিক্ষার এমন একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সন্ধান মেলে না। যে শিক্ষাধারা তার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ত্রুটি-বিচ্যুত সত্ত্বেও প্রায় অপরিবর্তিত থেকেই বিশাল হিন্দু সমাজের প্রয়োজন মিটিয়েছে, আধুনিক যুগেও তার মধ্যে গ্রহণ-যোগ্য উপাদান কিছু আছে কিনা, তা চিন্তা করা দরকার।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তপোবনের শিক্ষাব্যবস্থা। নগরের কৃত্রিমতা ও কলকোলাহলের বাইরে নির্জন প্রকৃতির সান্নিধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি হত, তা সব দিক্ থেকেই আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ। প্রাচীন ভারতে তীর্থক্ষেত্রে বা প্রসিদ্ধ নগরে যে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তা নয়—তক্ষশীলা, বারাণসী প্রভৃতি স্থান হিন্দু-শিক্ষার কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। কিন্তু, তপোবনের শিক্ষাকেই ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়। উচ্চ ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়ে তপোবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনকে তাঁরা শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়গুলিকে যথাসম্ভব কোলাহল-মুখর শহর থেকে দূরে সরিয়ে আনবার কথাই চিন্তা করছেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ও হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে পল্লী প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে স্থাপিত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষা-আদর্শের শ্রেষ্ঠতারই স্বীকৃতি।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে আকর্ষণের দিক্ হচ্ছে গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত, তা যে-কোন শিক্ষাব্যবস্থায় অনুকরণীয়। প্রাচীন ভারতে শিক্ষকতা বৃত্তি ছিল না—ছিল জীবনের ব্রত। আচার্য শিক্ষাদান পবিত্র সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করতেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে দেনা-পাওনার সম্পর্ক ছিল না—ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্ক। পরিবারের একজন পরিজনরূপেই শিক্ষার্থীকে গুরু গ্রহণ করতেন। আচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীর জীবন গড়ে উঠত। শ্রদ্ধাবনত, একনিষ্ঠ, সংযত ইন্দ্রিয় (শ্রদ্ধা-

বাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়) শিক্ষার্থিগণ "সেবা করি, প্রশ্ন করি, নমি অনুক্ষণ" (তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া) গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করত। আবাসিক ও ব্যক্তিগত শিক্ষার সব রকম সুবিধাই এ ব্যবস্থায় ছিল। গুরু তাঁর সাধ্যের অতিরিক্ত ছাত্র গ্রহণ করতেন না। আবাসিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মনোযোগ কয়েকটি মাত্র ছাত্রেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্ষীণ যোগসূত্রকে দৃঢ় ক'রে তুলতে পারলে শিক্ষাজগৎকে বহু ব্যাধি থেকে মুক্ত করা সম্ভব বলে শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন। আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের সান্নিধ্যে তাঁর চরিত্রের প্রভাব অনিবার্যরূপেই শিক্ষার্থীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাকে বাইরের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখত। আজকের দিনেও ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগ গভীর হলে যে একটা প্রীতির সম্পর্কই গড়ে উঠবে তাই নয়, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্রের মান ও শিক্ষার মান, দুই-ই উন্নত হবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা এজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার কমিয়ে আনবার কথা বলেছেন। বোস্টন শহরেব সুপ্রসিদ্ধ Massa-Chusetes Institute of Technology শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হাব ১:৫ জন (শিক্ষার্থী ৪৮৭৪ জন, শিক্ষক ১১৭১ জন), রীভ কলেজের হার হচ্ছে ১:১০ জন (শিক্ষার্থী ৬০০, শিক্ষক ৬০ জন)। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে আমবা জানতে পাই নালন্দায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীব হার ছিল ১:৫ জন। তক্ষশীলায় সাধারণভাবে এই হার ছিল ১:২০ জন। মাধ্যমিক শিক্ষায় দূরের কথা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীব এই আনুপাতিক হাব আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও বয়স্ক ছাত্ররা শিক্ষাদানকার্যে গুরুর সহায়তা করত। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় এ প্রথা "সর্দারপোড়া" প্রথা নামে সুপরিচিত ছিল। কিছুদিন পূর্বেও দেখা যেত গ্রাম্য পাঠশালায় 'সর্দারপোড়োরা' পণ্ডিত মশায়কে শিক্ষাকার্যে সহায়তা করছে। মিশনারী ডাঃ বেল মাদ্রাজে এই প্রথার উপযোগিতায় মুগ্ধ হয়ে বিলেতে গিয়ে এই প্রথা প্রবর্তন করেন। এই স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাপদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই ব্যবস্থা Monitorial System নামে ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এক-শিক্ষক যুক্ত বিদ্যালয়ে এই প্রথার এখনও যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, শিক্ষার্থীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও গুরু করতেন—এজন্য শিক্ষার্থীকে কোন খরচ দিতে হত না। রাজা ব্রাহ্মণ-আচার্যকে অর্থসাহায্য ও গ্রাম দান করতেন, একে 'অগ্রাহার গ্রাম' বলা হত। সময় সময় বিত্তবানেরা ব্রাহ্মণদের সাহায্য করতেন। নালন্দা, বিক্রমশীলার মত মহাবিহারে—যেখানে হাজার হাজার ছাত্র পড়ত, সেখানকার সমস্ত ব্যয়ভারই রাজা ও বিত্তবান শ্রেণীরাই বহন করতেন। অতি অল্পদিন পূর্বেও নবদ্বীপে প্রায় দশহাজার ছাত্র টোলে থেকে শিক্ষালাভ করত। এদের থাকা-খাওয়া-শিক্ষার জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে

হ'ত না। নীতিগতভাবে অধিকাংশ রাষ্ট্রই শিক্ষা যতদূর সম্ভব অবৈতনিক হওয়া উচিত বলে মেনে নিয়েছে। ভারতের মত দরিদ্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক করাব কথা নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকেই যদি সর্বত্র বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা যেত, তাহলে অতি অল্পদিনেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জনসাধারণ মুক্তি পেত।

জীবনের সার্থক রূপায়ণ ও পরিপূর্ণ বিকাশে প্রাচীন শিক্ষার অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয়েছিল 'জীবনে কি লক্ষ্য'? এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীতে তার আভাষ পাওয়া যায়। তপোবনের বিচিত্র তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষা-সাধনা আছে, তাকে আশ্রয় ক'রে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরাবিদ্যা নয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা-বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয়, তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে। তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে প্রীতির সম্বন্ধে, ঔৎসুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করবে। আবার মানুষের সঙ্গে মানুষকেও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করবে। এ সংযোগ শুধু স্বার্থের সংযোগ নয়, একাত্মবোধের সংযোগ।"

প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সামনে একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আমাদের সামাজিক আদর্শবোধ পরিবর্তিত হয়েছে। নৈতিক নয়, অর্থ নৈতিক মাপকাঠিই হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র উপায়। এযুগের শিক্ষার্থীর জীবনের চরম ও পরম কাম্য হচ্ছে শিক্ষা শেষ ক'রে কোনক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। বৈশ্য মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়েই আমরা শিক্ষায় তৎপর হই। শিক্ষার্থীকে কোন একটা বৃত্তিলাভের উপযোগী ক'রে তোলাই বর্তমান শিক্ষার শেষ কথা। ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রাচীন যুগেও অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু নৈতিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন শিক্ষাই দেশের কল্যাণসাধন করতে পারে না। "এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজ-পরীক্ষা পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে।" —(রবীন্দ্রনাথ)। পরা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যার সমন্বয় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় সম্ভব হয়েছিল। জাতি-গঠনে সেই সনাতন শিক্ষার আদর্শই আমাদের যুগোপযোগী ক'রে গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক-পূর্ব জাতীয় শিক্ষার ধারা ও এডামের রিপোর্ট

[প্রাক্-বৃটিশ যুগের শিক্ষানুসন্ধান—মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলাদেশ। এডামের রিপোর্ট। জাতীয় শিক্ষার সাধারণ রূপ।]

বর্তমানে ভারতে আমরা যে শিক্ষাধারার সহিত পরিচিত, সেই নব্য শিক্ষাধারার প্রবর্তন হয় য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ এদেশে আসবার পর। পাশ্চাত্ত্য বণিক্‌গণ এদেশে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিশনারিগণ এদেশে এসে উপস্থিত হন। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনায় দেশীয় ভাষা শিখে তাঁরা বাইবেলের অনুবাদ, খ্রীস্টের বাণী প্রচার এবং দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার লাভ করবার পর ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের দায়িত্ব কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত হয়। ইংরেজ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করবার পূর্বে এদেশে অতি প্রাচীন একটি নিজস্ব শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। মিশনারিগণ ও কোম্পানীর বা সিভিলিয়ানগণের চোখে ভারতের এই ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার কোন মূল্যই ছিল না। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ও তৎকালীন সিভিলিয়ানদের রূপ মনোভাব মেকলের দম্ভোক্তির মধ্যেই পরিস্ফুট। বৈদেশিক সরকারের প্রয়োজনে একটি সুপ্রাচীন জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিয়ে ভারতীয়দের পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ক'রে তোলবার জন্য এদেশে সম্পূর্ণ এক নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করা হল।

একটি সুপ্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে যে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি শুরু হল, সেই নতুনকে জানবার আগে জাতীয় শিক্ষার লুপ্ত ধারাটিকে জানা দরকার। সাধারণের মধ্যে, এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যন্ত, এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে মুসলিম যুগে ও তৎপরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় শিক্ষার বুনিয়াদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন শিক্ষা-সৌধ নির্মাণ করেছে। শাসকসম্প্রদায়ের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে অবহেলা ও অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে সম্ভাবনাময় জাতীয় শিক্ষার ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেল, আমরা সে সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞই থেকে গেলাম।

মুসলিম যুগে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা অতীত গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেও দেশের জনসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে আপন সম্মানের স্থানটিকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই সময়ে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল, কিন্তু রুদ্ধ

হয়ে যায় নি। মুসলিম আমলে মুসলিম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা শিক্ষাব্যবস্থাও গ
উঠেছিল। ভারতের বুকে এই দুইটি শিক্ষাধারাই সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। ইংরে
শাসন প্রবর্তিত হবার পরেও বহুদিন এই দুইটি ধারার মধ্যেই অতীতের ঐতিহ্য
শিক্ষাব্যবস্থা আপন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্প
বিদেশী শাসকগণ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরা দেশীয় শিক্ষাকে 'অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহী
বলেই মনে করত। ভারতবন্ধু যে সামান্য কয়েকজন ইংরেজ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা
সংস্কার ক'রে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন, নব্যতন্ত্রীদের বিরোধিতায় তাঁ
সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ভারতের লুপ্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্যকরূপে জেনেই আধুনিক ভারতের শিক্ষা
ধারাকে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এই জানার পথে বিঘ্ন অনেক
ভারতীয়গণ ইতিহাসবিমুখ জাতি, এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের নেই যা দি
জাতীয় শিক্ষার সঠিক ইতিহাস আমরা জানতে পারি। ঊনবিংশ শতকে ইংরে
সরকারের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু এই তথ্য পর্যাপ্ত বা
নির্ভরশীল নয়, যার ওপর ভরসা ক'রে জাতীয় শিক্ষার সঠিক রূপটিকে আমরা ধার
করতে পারি। তথ্য যা সংগ্রহ করা হয়েছে, তা ইংরেজ-শাসিত অঞ্চল থেকেই হয়েছে
দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত ভারতের একটা বিশাল অংশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্প
ধারণা করবার মত কোন উপাদান আমাদের নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে শুরু ক'রে ধীরে ধীরে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্প
দেশের শাসকরূপে দেখা দিলেও দেশের শিক্ষা-সম্পর্কে কোম্পানী ছিল উদাসী
ইংরেজ কোম্পানী অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষা-বিস্তারে বেসরক
প্রচেষ্টাকে সামান্য সাহায্য করলেও দেশের শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর কোন প্রত্য
দায়িত্ব আছে, একথা স্বীকার করেনি (রাজনৈতিক কারণে কলকাতা, মাদ্রাসা ও কা
সংস্কৃত কলেজ স্থাপন এর ব্যতিক্রম)। দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কারণে ধী
ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য কোন ব্যবস্থা বা মৃতপ্র
দেশীয় শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা কোম্পানীর ছিল না। এই উদাসীনতার বি
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিছু লোক ইংলণ্ডে এক আন্দোলন শুরু করেন। ১৮১৩
কোম্পানীর সঙ্গে পুনর্নবীকরণের জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হয়। এই সময়ে কোম্পা
কোর্ট আব্ ডাইরেক্টরস্ ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণদের নিজ নিজ প্রদেশে দেশীয় শি
তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য পত্র পাঠান। এই পত্রের নির্দেশ অনু
১৮২২ খ্রীঃ মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার টমাস মনরো প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্র
আদেশ দেন। বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর মাউণ্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের আ
১৮২৩ খ্রীঃ এই প্রদেশের কলেকটরগণ প্রথম শিক্ষা-সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ ক
দু'বছর বাদে আবার বিচার-বিভাগের দ্বারা তথ্য সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে
বেন্টিঙ্কের আদেশে উইলিয়ম এডাম নামে একজন ভারতহিতৈষী শিক্ষাব্রতী মিশ
১৮৩৫-৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান ক'রে পর পর তিনটি রিপোর্ট পেশ ক

লী ও নাগপুর জেলাতেও কিছু তদন্ত হয়েছিল। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। গৃহীত তথ্যসমূহের মধ্যে এডামের তথ্যই নির্ভরযোগ্য ও প্রায় নির্ভুল।

মাদ্রাজ ॥

মাদ্রাজে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা'থেকে জানা যায়, ১৮২৬ খ্রীঃ ই প্রদেশে ১২৪৯৮টি বিদ্যালয়ে ১,৮৮,৬৫০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করছিল। সমগ্র নসংখ্যার (১,২৮,৫০,৯৪১) অনুপাতে প্রতি ১০০০ জনে একটি বিদ্যালয় ছিল। দি এই সংখ্যা থেকে মেয়েদের বাদ দেওয়া হয়, তাহালে প্রতি ৫০০ জনের জন্য একটি য় ছিল। মনরো যে রিপোর্ট পেয়েছিলেন, তাতে দেখা যায়, প্রতি ৬৭ জনে ১ জন ক্ষা পেত। এই সময় এই প্রদেশে মেয়েদেব শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ছাড়া, রিপোর্টে এক মাদ্রাজ শহর ভিন্ন অন্য কোন জেলার গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের ॥ হয়নি। মনরো হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, মোট জনসংখ্যা থেকে মেয়েদের বাদ যে ৫ থেকে ১ বছর পর্যন্ত ছেলেদের এক-তৃতীয়াংশ বা সমগ্র জনসংখ্যার এক-মাংশ শিক্ষালাভ করছিল।

মনরো বলেছেন—ইংলণ্ডের তুলনায় এদেশের শিক্ষার ব্যবস্থা খারাপ, কিন্তু রোপের অন্য যে-কোন দেশে কিছুদিন পূর্বেও শিক্ষার যে অবস্থা ছিল, সেই তুলনায় দেশের (ভারতের) শিক্ষার অবস্থা ভাল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিছুদিন পূর্বে রও অনেক ভাল ছিল।

মাদ্রাজের শিক্ষার হার সম্পর্কে স্যার ফিলিপ হার্টগ বলেছেন, এ সংখ্যা অতিরঞ্জিত। ন্তু মনরো নিজে বলেছেন, তাঁর কাছে যে রিপোর্ট রয়েছে, তাতে সঠিক সংখ্যার ান পাওয়া যায় না। কারণ, বাড়ীতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যারা শিক্ষালাভ ছে, তাদের সংখ্যা ধরলে দেশের এক-নবমাংশ কিছু-না-কিছু শিক্ষা পেয়েছে, একথা াস না করবার কোন কারণ নেই। রিপোর্টে বলা হয়েছে—I am however, clined to estimate the portion of male population who receive hool education to be nearer to one-third than one-fourth of e whole, because we have no returns from the provinces of the mber taught at home In Madras the number taught at me is 26,403 or above five times greater than that taught in hools. (*Selection from the Records of the Government of adras, No. II, App. 6.*)

এখানে মাদ্রাজ বলতে শুধু মাত্র মাদ্রাজ শহর বোঝানো হয়েছে। মাদ্রাজ শহরে াবে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, এই প্রদেশের অন্য কোথাও সেভাবে তথ্য সংগ্রহ হয়নি। তাই এই প্রদেশের গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যা আমরা পাই না।

বেলারীর জেলা কালেক্টরের রিপোর্ট ॥

াজের জেলা কালেক্টরগণ তৎকালীন দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক ারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তার মধ্যে বেলারীর জেলা কালেক্টরের

রিপোর্টটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশী প্রাথমিক শিক্ষার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সুন্দর বাস্তব চিত্র এই বিবরণীর মধ্যে ফু উঠেছে। 'হাতে খড়ি'র ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীর সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাকালে তা শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদানের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা এই বিবরণী থেকে আমরা করতে পারি। দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব শিক্ষার যে রূপটি আমরা এই রিপোর্ট পাই, সমগ্র ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্য অদল-বদল ক'রে এই পদ্ধতি মোটামুটিভাবে চালু ছিল বলে মনে হয়। কৌতূহলী পাঠকের সুবিধার জন্য নীচে দী উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

॥ Report of the Collector of Bellary ॥

6. "The education of the Hindu youths generally commence when they are five years old, on reaching this age, the master and scholars of the school to which the boy is to be sent, are invited to the house of his parents, the whole are seated in a circle round the image of Gunasee and the child to be initiated is placed exactly opposite to it. The schoolmaster sitting by his side, after having burnt incense and presented offerings, causes the child to repeat a prayer to Gunasee, entreating wisdom. He then guides the child to write with its finger in rice the mystic name of the deity, and is dismissed with present from the parents according to their ability. The child next morning commences the great work of his education.

7. "Some children continue at school only five years, the parents, through poverty or other circumstances, being often obliged to take them away, and consequently in such cases the merest smattering of an education is obtained, where parents can afford it, and take a lively interest in the culture of their children's minds, they not unfrequently continue at school as long as 14 or 15 years.

8. "The internal routine of duty for each day will be found with very few exceptions and little variation, same in all schools The hour generally for opening school is six o' clock. The first child that enters has the name of Saraswatee or the goddess of learning written upon the palm of his hand as a sign of honour, and on the hand of the second a cypher is written, to show that he is worthy neither of praise nor censure, the third scholar receives a gentle

stripe, the fourth two, and every succeeding scholar that comes an additional one. The idle scholar is flogged and often suspended by both hands and a pulley to the roof, or obliged to kneel down and rise incessantly, which is a most painful and fatiguing, but perhaps a healthy mode of punishment.

9. "When the whole are assembled, the scholars according to their number and attainments are divided into several classes, the lower ones of which are partly under the care of monitors, whilst the higher ones are more immediately under the superintendence of the master, who at the same time has his eye upon the whole school. The number of classes is generally four, and a scholar rises from one to another according to his capacity and progress. The first business of a child or entering school is to oblain a knowledge of the letters, which he learns by writing them with his finger on the ground in sand, and not by pronouncing the alphabet, as among European nations. When he becomes pretty dexterous in writing with his finger in sand, he has then the privilege of writing either with an iron style on cadjan leaves, or with a reed on paper and sometimes on the leaves of the *Aristolochia Indica*, or with a kind of pencil on the Hulligi or Kadala, which answers the purpose of slates. The two latter in these districts are most common. One of these is a common oblong board about a foot in width and three feet in length, this board when planed smooth has only to be smeared with a little rice and pulverized charcoal, and it is then fit for use. The other is made of cloth, first stiffened with rice water, doubled into folds resembling a book, and it is then covered with a compositon of charcoal and several gums. The writing on either of these may be effaced by a wet colth, the pencil used is called Bultapa, a kind of white clay substance, somewhat resembling a crayon with the exception of being rather harder.

10. "Having attained a thorough knowledge of the letters, the scholar next learns to write compounds or the manner of embodying symbols of the vowels in the consonants and formation of syllables etc. then the names of men, animals, villages etc., and lastly arithmetical signs. He then commits to memory an addition table and

counts from one to 100, he afterwards writes easy sums in addition and subtraction of money multiplication and the reduction of money, measure etc. Here great pains are taken with the scholar in teaching him the fractions of an integer, which decend, not by tens as in our decimal fractions, but by fours and are carried to a great extent. In order that these fractions together with the arithmetical tables in addition, multiplication and three-fold measures of capacity, weight and extent, may be rendered quite familiar to the minds of the scholars, they are made to stand up twice a day in rows, and repeat the whole after one of the monitors.

11. "The other parts of native education consist in deciphering various kinds of handwriting in public and other letters which the schoolmaster collects from different sources, writing common letters, drawing up forms of agreement, reading fables and legendary tales and committing various kinds of poetry to memory, chiefly with a view to attain distinctness and clearness of pronunciation together with readiness and correctness in reading any kind of composition.

16. "The economy with which children are taught to write in the native schools, and the system by which the most advanced scholars are caused to teach the less advanced, and at the same time to confirm their own knowledge, is certainly admirable and well deserve the imitation it has received in England. The chief defects in the native schools are the nature of the books and learning taught and the want of competent masters

[As quoted from "Selections from the Records of the Government of Madras No. II, Appendix D", by Syed Nurullah & J. P. Naik in their 'A Student's History of Education in India'.]

॥ বোম্বাই ॥

মাদ্রাজের ন্যায় বোম্বাই প্রদেশেও শিক্ষা-সম্পর্কীয় তথ্য সংগৃহীত হয়। বোম্বাই প্রদেশে দু'বার অনুসন্ধান হয়। প্রথম হয় ১৮২৪-১৮২৫ খ্রীঃ জেলা কালেক্টরদের দ্বারা, দ্বিতীয় বার হয় ১৮২৯ খ্রীঃ জেলা জজদের দ্বারা। রিপোর্টে দেখা যায়, সমগ্র প্রদেশের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, তা থেকে মোটামুটিভাবে দেখা যায় প্রতি শহরে ও বড় বড় সব গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। দেখা গিয়েছে, কোন জায়গাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না। মন্দির, বিত্তবানদের

গৃহের এক অংশ ও শিক্ষকের নিজের বসতবাটির এক অংশেই স্কুল বসত। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। সব সম্প্রদায় থেকেই ছাত্র আসত। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের থেকেই বেশী ছাত্র আসত, তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ জন। হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা হত না। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আসত। শিক্ষাকাল ছিল ২ থেকে ৩ বছর। কোন কোন স্থানে শিক্ষাকাল ৩ থেকে ৪ বছরও হত। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কাজ চালাবার মত লেখা-পড়া ও অঙ্ক শেখানো হত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, সাধারণ স্কুলগুলিতে শুধু ছেলেরাই পড়ত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। এ ছাড়া, প্রভু, মারাঠা, কুন্তা, ভাণ্ডারী, বেনিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাও শিক্ষকতা করত। শিক্ষকদের মাসিক বেতন ছিল গড়ে ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা। তবে মাইনে সব সময় নগদ অর্থে দেওয়া হত না। টাকার বদলে দ্রব্য সামগ্রীতে মাইনে দেওয়া হত। মাস মাইনে ছাড়াও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে শিক্ষক মহাশয়রা কিছু অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্য উপহার পেতেন। সেই বাল্য বিবাহের যুগে ছাত্রের বিয়েতে বা গ্রামে বিয়ে, দশরা উৎসবে, দেওয়ালীতে শিক্ষকরা বিশেষ পার্বনী পেতেন। বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রা গেলে ছাত্ররা পেত ছুটি, আর শিক্ষক মহাশয় পেতেন কিছু প্রণামী। শিক্ষক মহাশয়দের বিদ্যাসম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তা খুব আশাপ্রদ ছিল না। বিদ্যা তাদের অতি সামান্যই ছিল—তারা যেটুকু জানতেন, ততটুকুই প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শেখাতেন।

১৮২৯ খ্রীঃ জেলা জজগণ যে অনুসন্ধান চালান, তাতে দেখা যায়, তখন ১৭০৫টি বিদ্যালয়ে ৩৫,১৫৩ জন ছাত্র ছিল। তাঁরা যে অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করেন, তার লোক-সংখ্যা ছিল ৪,৬৮১,৭৩৫ জন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তথ্য সংগ্রহকারীরা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা নিরূপণে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রর কথাই বলেছেন। পারিবারিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কথা এসব রিপোর্টে বলা হয়নি। এছাড়া, কোন কোন জেলায় রিপোর্ট খুব অল্প দিনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক অনুসন্ধান ক'রে যতটা সম্ভব বাস্তব ও তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট পেশ করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হয়। পারিবারিক বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে ও অনুষ্ঠানিক স্কুলের সঠিক সংখ্যাও নিরূপিত হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। তথ্য সংগ্রহ করায় সে যুগে অনেক অসুবিধা ছিল, দেশের দূর-দূরান্ত অঞ্চলে যাতায়াতের যানবাহনের অসুবিধা ছিল। দেশে ইংরাজ শাসন তখন মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ ছিল। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে লোকে কোন খবরতো দিতই না, বরং সরকারী তথ্য-সংগ্রহকে সন্দেহের চোখে দেখত বলে খবর যথা সম্ভব গোপন করত। এই সব রিপোর্টে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ঐ যুগের খ্যাতনামা রাজকর্মচারীদের সংগৃহীত তথ্যসমূহের মধ্যে বেশ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ১৮২৪-২৫ খ্রীঃ এবং ১৮২৯ খ্রীঃ সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জে, পি,

নায়েক ও সৈয়দ নুরুল্লা মন্তব্য করেছেন,—"From qualitative point of view it may be admitted that they give a fairly correct picture of the indigenous educational institutions of the period. But it may well be doubted whether they give an equally realistic picture on the quantitative side."

এই প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে শ্রী আর, ভি, পার্লেকর তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন রাজপুরুষদের যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তা দেখে মনে হয়, এই প্রদেশের সাধারণ শিক্ষার অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। বম্বের গভর্ণর কাউন্সিলের সদস্য মিঃ. জি. এল, প্রেণ্ডারগাস্ট লিখেছেন—"There is hardly a village, great or small through out our territories in which there is not at least one school and in larger villages more, many in every town and in larger cities in every Division, where young natives are taught reading, writing and arthmetic·· ···"

১৮১৯ খ্রীঃ বম্বের এডুকেশন সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, "There are probably as great a portion of persons in India who can read write & keep simple accounts as are to be found in European countries" পরের বছর রিপোর্টে বলা হয়, "Schools are frequent among natives and abound everywhere. এই থেকে মনে হয় বম্বে প্রদেশের সাধারণের শিক্ষার জন্য একটা নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, যার জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি।

বাংলা ঃ—বাংলা দেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয়, তার পিছনে কোন সরকারী প্রচেষ্টা ছিল না। স্কটল্যাণ্ডবাসী সহৃদয় মিশনারী উইলিয়াম এডাম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ তিনি তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ককে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। তাঁর থেকে কোন জবাব না পেয়ে তিনি ১৮৩৪ খ্রীঃ আবার পত্র দেন। এই পত্রে তিনি জানান, তিনি নিজেই এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী আছেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ সপরিষদ বড়লাট তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। বাংলাদেশের শিক্ষা-সম্পর্কীয় অনুসন্ধানের জন্য এডাম কমিশনার নিযুক্ত হন। তাঁকে মাত্র কয়েকটি জেলায় অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮৩৫—৩৮ খ্রীঃ মধ্যে এডাম এই অনুসন্ধানের কাজ শেষ করেন। বহু পরিশ্রম ক'রে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টে তা সরকারের নিকট পেশ করেন। বাংলা ও বিহারের তৎকালীন দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি নির্ভুল ও অবিকৃত চিত্র তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কিত এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্ভুল ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ আমাদের আর নেই।

।। এডামের প্রথম রিপোর্ট ।।

১৮৩৫ খ্রীঃ ১লা জুলাই এডাম প্রথম বিবরণীটি পেশ করেন। এই বিবরণীটিতে পূর্বে সংগৃহীত কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। এডাম এই বিবরণীতে জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের এক বিশিষ্ট সদস্যের মতামতের উপর নির্ভর ক'রে বলেছেন, বাংলা ও বিহারে চার কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ পাঠশালা ও মক্তব ছিল। বাংলা ও বিহারের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতি ৪০০ জন লোকের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। দেশে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এই দুই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। গৃহ-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল।

স্যার ফিলিপ হার্টগ এক লক্ষ বিদ্যালয়ের হিসাবটিকে কাল্পনিক বা উপকথার ('mythor legend') সামিল বলে মন্তব্য করেছেন। এডামের এই উক্তি নিয়ে বহু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য ও বিদ্যালয় বলতে এডাম কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে আলোচনা করলে এই হিসাবকে অত্যুক্তি বা অতি-রঞ্জিত বলে মনে হয় না। স্কুল বলতে বর্তমান ধারণা অনুযায়ী আমরা যদি বুঝি 'আধুনিক' "কেতাদুরস্ত বিদ্যালয়", তাহলে এডামের উক্তি নিশ্চয়ই সত্যের অতি-রঞ্জিত অপলাপ (fantastic exaggeration of facts)। কিন্তু, এডাম স্কুল বলতে আধুনিক ধরনের যে স্কুল আমরা বুঝি, তা মনে করেন নি। তখন গৃহশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল—কোন পরিবারে শিক্ষক দিয়ে বা আপন পরিজনদের দিয়ে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হত, তাকেও বিদ্যালয় বলা হত। এডাম রাজসাহী জেলা সম্পর্কে বলেছেন, এই জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই ভাগ করা যায়, সাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গৃহশিক্ষা-ব্যবস্থা "Public & Private according as it is communicated in public school or in private families." এডামের সত্যতা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করেন নি। তাঁর সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধ সমালোচক হার্টগ বলেছেন, এডাম প্রাপ্ত পরিসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি (could not "summarize his statistics clearly")। এডামের সমগ্র রিপোর্ট থেকে আমরা তাঁর বিচারবুদ্ধি ও পর্যালোচনা শক্তির যে পরিচয় পাই, তাতে হার্টগের উক্তি মেনে নেওয়া যায় না। এডামের পূর্বে মনরো বলেছেন, মাদ্রাজে প্রতি গ্রামে একটি ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, "বাংলা দেশে মিঃ ওয়ার্ড দেখেছেন, প্রায় প্রতি গ্রামে লেখা-পড়া ও অঙ্ক শেখাবার মত বিদ্যালয় রয়েছে। মিঃ ম্যালকম দেখেছেন, মালবে যেখানে একশ ঘর বাসিন্দা আছে, সেখানেই একটা স্কুল আছে। এমন কি, লর্ড মেকলে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, বাংলা দেশে ৮০,০০০ বিদ্যালয় আছে। সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েও ভারতের গ্রামসমূহে যে একটা নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল, এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্যে তাই প্রমাণিত হয়। বাংলায় প্রতি গ্রামের একটি স্কুল ছিল (পারিবারিক বা সাধারণ স্কুল) একথা সরকারী তথ্যের সাহায্যেই সত্য বলে প্রমাণিত

হয়েছে। সব দিক্ বিচার ক'রে এডামের হিসাবকে অবিশ্বাস করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

।। দ্বিতীয় রিপোর্ট ।।

এডাম ১৮৩৫ খ্রী: ২৩শে ডিসেম্বর তাঁর দ্বিতীয় বিবরণী পেশ করেন। এই বিবরণীতে তিনি রাজশাহী জেলার নাটোর থানার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান ক'রে তথ্যগুলি বিশ্লেষণ ক'রে উপস্থাপিত করেন। নাটোর থানার লোকসংখ্যা ছিল ১,৯৬,২৯৬ জন, এর মধ্যে মুসলমান ১,২৯,৬৪০ জন, বাকী ৬৫,৬৫৬ জন হিন্দু। এই থানার মোট ৪৮৫টি গ্রামে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যার মোট ছাত্রসংখ্যা ২৬২জন, এর মধ্যে ১০টি বাংলা স্কুলে ছাত্র ছিল ১৬৭ জন, ৪টি ফার্সী স্কুলে ২৩ জন, ১১টি কোরান শিক্ষার আরবী স্কুলে ছাত্র ছিল ৪২ জন, ২টি ফার্সী ও বাংলা মিশ্র স্কুলে ছাত্র ছিল ৩০ জন। এই প্রাথমিক স্কুলগুলির বাইরে ১৫৮৮টি পরিবারে তাদের নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল যেখানে ২৩৪২টি শিশু শিক্ষা পেত, অর্থাৎ সাধারণ স্কুলে যে ছাত্র পড়ত, তার চেয়ে নয় গুণ বেশী ছাত্র পারিবারিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করত। মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এডাম লিখেছেন, 'অজ্ঞতার গভীরে ও হতাশাময় অন্ধকারে মেয়েরা ডুবেছিল'। কোন কোন পরিবারে একান্ত নিজস্বভাবে মেয়েদের কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হত। অতি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়বার সুযোগ তারা কমই পেত।

স্কুলগুলিতে গড ৮ বছর বয়সে ছেলেরা ভর্তি হত, আর ১৪ বছর বয়সে শিক্ষা শেষ করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গড মাসিক বেতন ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা। নাটোর থানায় এডাম ৩৮টি সংস্কৃত শিক্ষার কলেজ দেখেছেন। এখানে ৩৯৭ জন ছাত্র শিক্ষা পেত। উচ্চ শিক্ষা শুরু হত সাধারণত: ১১ বছর বয়স থেকে শেষ হত ২৭ বছর বয়সে। সব ছাত্র এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করত, দূরবর্তী স্থান থেকে এ সব উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রে ছাত্ররা আসত, তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা অধ্যাপকই করতেন। নাটোর থানায় সমগ্র পুরুষ জনসংখ্যার আনুপাতিক শিক্ষার হার ছিল ৬·১%, নারী-পুরুষ মিলিয়ে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৩·১%।

।। তৃতীয় রিপোর্ট ।।

১৮৩৮ খ্রী: ২৮শে এপ্রিল এডাম তাঁর তৃতীয় বিবরণীটি পেশ করেন। তিনটি বিবরণীর মধ্যে এইটি বিশেষ মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য। এই বিবরণীতে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি ব্যাপক চিত্র দেওয়া হয়েছে। এই বিবরণীর প্রথম অংশে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত এবং দক্ষিণ বিহার এই পাঁচটি জেলার শিক্ষা-সম্পর্কীয় তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে, দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এডাম তাঁর নিজস্ব প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন।

এই বিবরণীর মুখবন্ধেই তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রতি জেলার মাত্র একটি

থানার কাজ তিনি নিজে পরিচালনা করেছেন, বাকী থানার কাজ লোক দিয়ে করাতে হয়েছে। ফলে, পরিসংখ্যানগত কিছু ত্রুটি হয়ত রয়ে গিয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানকে তিনি সঠিক হিসাব থেকে কম (under-estimated) বলে মনে করেন। এই সময়ে অনুসন্ধান ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়ার অনেক অসুবিধাও ছিল। দেশের লোক সরকারী অনুসন্ধানকে সন্দেহের চোখে দেখতো। যে কোন অনুসন্ধানের পিছনেই সরকারের কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে, এই ভয়ে তারা সত্য গোপন রাখত। তারপর যাদের দিয়ে তিনি কাজ করিয়েছেন, তারা দুর্গম গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নিজেরা গিয়ে খোঁজ করে নি। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও এডাম যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, নিঃসন্দেহে তাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায়।

যে পাঁচটি জেলায় তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন, সে পাঁচটি জেলায় মোট ২৫৬৭টি স্কুলে ৩০,৯১৫ জন ছাত্র শিক্ষা পেত। এই হিসাবে পারিবারিক বিদ্যালয়সমূহকে ধরা হয়নি। বিদ্যালয়গুলি ছিল সাত প্রকার—বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবীয়, ফরমাল আরবী ও মেয়েদের স্কুল। সমগ্র জেলার পারিবারিক বিদ্যালয়ের সন্ধান না করতে পারলেও তিনি প্রতি জেলার একটি ক'রে থানার পারিবারিক বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান করেছিলেন। নীচের তালিকায় পাঁচটি জেলার বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়েছে :—

জিলা	অধিবাসী	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
মুর্শিদাবাদ	১৮৬,৪৮১	১১৩	১৩৯৬
বীরভূম	১০৬৭,০৬৭	৫৪৪	৭৩৫০
বর্ধমান	১১,৮৭,৫৮০	৯৩১	১৫,৮১৪
দঃ বিহার	১৩,৪০,৬১০	৬০৫	৫০৩৬
ত্রিহুত	১৬,৯৭,৭০	৩৭৪	১৩১৯

এডাম বর্ধমান জেলায় ৪টি, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় একটি ক'রে মোট ৬টি বালিকা বিদ্যালয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই ৬টি বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মোট ২১৪ জন। তিনি ২৪২ জন ইংরাজী শিক্ষার্থীর সন্ধানও এই স্কুলগুলিতে পেয়েছিলেন।

স্যার ফিলিপ হার্টগ এই তালিকা দেখে বলেছেন, এডামের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি প্রতি ৪০০ জনে একটি স্কুল থাকত, তাহলে স্কুলের সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল মুর্শিদাবাদে ৪৬৭টি, বীরভূমে ৩,১৬৮টি, বর্ধমানে '২,৯৬'টি, দঃ বিহারে ৩৩৫২টি ও ত্রিহুতে ৪,২৪৪টি। আপাতঃদৃষ্টিতে হার্টগের যুক্তি অখণ্ডনীয় বলেই মনে হবে, কিন্তু তিনি যদি পাঁচটি থানার পরিবারিক শিক্ষা-কেন্দ্রের হিসাবটি বিচার ক'রে দেখতেন, তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে, প্রতি ৪০০ জনে একটি বিদ্যালয়ের হিসাব মোটেই কল্পনাবিলাস নয়। এডাম নিজেই স্বীকার করেছেন, পাঁচটি জেলার পারিবারিক

শিক্ষাকেন্দ্রের হিসাব নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে পাঁচটি থানায় যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যায়—

	সাধারণ বিদ্যালয়	পারিবারিক বিদ্যালয়	মোট
মুর্শিদাবাদ (শহর)	৮৮	২১৬	৩০৪
দৌলতবাজার (থানা)	২৫	২৫৪	২৭৯
নাঙ্গলিয়া (থানা)	৩৬	২০৭	২৪৩
কালনা (থানা)	১১৯	৪৭৫	৫৯৪
জেহানাবাদ (থানা)	৯২	৩৬০	৪৫২
ভাওয়ারা (থানা)	১৩	২৩৫	২৪৮

যদি প্রতি ৪০০ জনের জন্য একটি বিদ্যালয় থাকত, তাহলে মুর্শিদাবাদে ৩১২, দৌলতবাজারে ১৫৫টি, নাঙ্গলিয়ায় ১১৬টি, কালনায় ১৯১টি, জাহানাবাদে ২০৩টি ও ভাওয়ারায় ১৬৪টি—মোট ১,১৪১টি বিদ্যালয় থাকবার কথা। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয় ও পারিবারিক বিদ্যালয় মিলিয়ে এডাম মোট ২,১২০টি বিদ্যালয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে, এডাম বিদ্যালয়ের যে আনুমানিক হিসাব দিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা তার চেয়ে বেশীই ছিল।

দেশের শিক্ষিতের হার সম্পর্কে এডাম একটি তথ্যপূর্ণ পরিসংখ্যান (Statistics) দিয়েছেন। এই তথ্য সম্পর্কে হার্টগ মন্তব্য করেছেন, 'the first systematic census of literacy in India"। এই পরিসংখ্যানে এডাম শিক্ষিত জনসংখ্যাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে ষষ্ঠ ভাগে ধরা হয়েছিল যারা শুধু মাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে। শুধু মাত্র নাম স্বাক্ষরকারীদের শিক্ষিত বলে স্বীকার করতে হার্টগের আপত্তি আছে। তাই তিনি এই হিসাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বর্তমান যুগের শিক্ষার মানদণ্ডে সেই যুগের বিচার করতে বসলে বিচারের নামে অবিচারই করা হবে। শিক্ষিতের হার নির্ণয়ে এডাম যে নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই নীতিই যুগোপযোগী। এডামের প্রদত্ত হিসাব অনুসারে দেখা যায়, ছয়টি থানার মোট জনসংখ্যা ৪,৯৬,৯৭৪ জনের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৮,৬৯৭ জন অর্থাৎ মোট সংখ্যার ৫·৮% শিক্ষিত। ১৯২১ খ্রীঃ জনগণনায় শিক্ষিতের হার ছিল ৭·৩%। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ খ্রীঃ গোলটেবিল বৈঠকে এই পরিসংখ্যানের উল্লেখ ক'রে ভারতে ইংরেজ শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা বলেন। গান্ধীজির উক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য স্যার ফিলিপ হার্টগ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন, এবং এডামের পরিসংখ্যানকে কল্পনা (myth) বলে ঘোষণা করেন। এডামের দেওয়া হিসাব যে বাস্তব ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তা ভারতের বহু শিক্ষাবিদ্ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছেন। উপরের আলোচনায় এডামের সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রমাণিত হয়।

এডাম সংগৃহীত তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট শিক্ষিতের সংখ্যা

(১৮৩৫ খ্রীঃ)

	জনসংখ্যা	স্কুলের ছাত্রসংখ্যা	গৃহে শিক্ষা-প্রাপ্তদের সংখ্যা	বয়স্ক শিক্ষিতের সংখ্যা	মোট শিক্ষিতের সংখ্যা
মুর্শিদাবাদ (শহর)	১২৪,৮০৪	৯৫৯	৩০০	৭,৩৫০	৮,৬০৯
দৌলতবাজার (থানা)	৬১,০৩৭	৩০৫	৩২৬	১,৭৭২	২,৪০৩
নাঙ্গলিয়া (থানা)	৪৬,৪১৬	৪৩৯	২৮৫	১,৬১৩	২,৩৩৭
কালনা (থানা)	১১৬,৪২৫	২,২৪৩	৬৭৬	৭,৩০৮	১০,২২৭
জেহানাবাদ (থানা)	৮১,৪৮০	৩৪৬	৫৩৯	২,৮৩৫	৩,৭৪০
ভাওয়ারা (থানা)	৬৫,৮১২	৬০	২৮৮	১,০৩৩	১,৩৮১
মোট—	৪৯৬,৯৭৪	৪,৩৭২	২,৪১৪	২১,৯১১	২৮,৬৯৭

এডামের বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই দেশের শিক্ষা দুইভাগে বিভক্ত ছিল—উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক। বর্তমানের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বলে কিছু ছিল না। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি পড়ানো হত। দেশীয় ধনী ব্যক্তিগণ আর্থিক সহায়তার দ্বারা উচ্চ শিক্ষার পরিপোষণ করতেন। প্রাথমিক শিক্ষায় বেতন লাগত, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। দূরাগত ছাত্রদের জন্য অধ্যাপকগণ নিজগৃহে ছাত্রদের থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা করতেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের নিজেদের কোন ব্যয় বহন করতে হত না। রিপোর্টে দেখা যায়, আলোচ্য এলাকায় ১৯০টি টোল ও ও ২৯০টি কেন্দ্রে অরবী-ফারসী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এডামের অনুমান সারা বাংলায় ১৮০০টি টোল ও ১২,৮০০ জন অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকগণ নিজগৃহে বা ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় বা চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপনা করতেন। ছাত্ররা ছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, সামান্য সংখ্যক অন্য উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছাত্রও টোলে পড়ত। এখানে ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি পড়ানো হত।

আরবী, ফার্সী মাদ্রাসাগুলি বসত সাধারণতঃ মসজিদে। মাদ্রাসার অধ্যাপকগণ মুসলমানই হতেন, তবে ফার্সী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু অধ্যাপকও দেখা গিয়েছে। ফার্সী

ছিল তখনকার সরকারী ভাষা। তাই চাকরির জন্য হিন্দু কায়স্থরা ফার্সী ভাষা শিক্ষা করতেন। দেখা যায়, আলোচ্য এলাকায় ফার্সী স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্র ছিল ৫৫১ জন, হিন্দু ছাত্র ৮৩৫ জন। এই হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কায়স্থ ছিল ৭১১ জন। ধনী মুসলমানদের মধ্যে 'আখনজি' রেখে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। অতি অল্প-সংখ্যক লোকই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করত, আর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অতি অপ্রচুর। এই শিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ হত, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে এ শিক্ষা বিশেষ কোন কাজে লাগত না। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছিল প্রাথমিক শিক্ষা। এই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য এডাম কয়েকটি সুপারিশ করেন।

।। এডামের মন্তব্য ।।

তৃতীয় বিবরণীর শেষ অংশে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার পর্যালোচনা ক'রে মৃতুপথযাত্রী দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ক'রে বাঁচিয়ে তুলে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিরূপে দাঁড় করানো যায়, সে সম্পর্কে এডাম কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে, এবং বেশ কিছু দিন ধরেই ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থিতিশীল, প্রগতিশীল বা ক্ষয়িষ্ণু যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার যে-কোন আয়োজন সার্থক ক'রে তুলতে হলে এই ভিত্তির উপরই তাকে দৃঢ় ক'রে দাঁড় করাতে হবে। স্মরণাতীত কাল থেকে এই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, প্রগতিশীল স্থায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে একেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এডামের ভাষায়—"To whatever extent such Institutions may exist and in whatever condition they may be found stationary, advancing, or retrograding they present the only true and sure foundation on which any scheme of national education can be established. We may deepen and extend the foundation, we may improve, enlarge and beautify the superstructure, but these are the foundations on which the building should be raised.........existing native institutions from the highest to the lowest of all kinds and classes were the fittest means to be employed for raising and improving the character of the people, that to employ those institutions for such a purpose would be the simplest, the safest, the most popular, the most economical and the most effectual plan for giving that stimulus to the native mind which it needs on the subject of education and for eliciting the exertions of the

native themselves for their improvement without which all other means must be unavailing. (*Adam's Report : Calcutta Edition.*

এডাম তাঁর মন্তব্যে চুঁইয়ে-পড়া নীতির (downward filtration theory) তীব্র সমালোচনা ক'রে এর বিরোধিতা করেছেন। উনবিংশ শতকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় ও দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রথমে উচ্চ বর্ণের লোকদের শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চ বর্ণের মধ্যে নব্য শিক্ষার প্রসার হলে সেই শিক্ষা ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে চুইয়ে নেমে অবশেষে নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তাই প্রথমে জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেবার আবশ্যকতা নেই। উচ্চ বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হলেই তা আপন থেকেই জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এডাম বললেন, লোকে শুরুতেই কলেজ যায় না —বর্ণপরিচয় থেকেই শুরু হোক। সুউচ্চ প্রাসাদের ভিৎ থাকে মাটীর গভীরে। ধাপে ধাপে শিক্ষা-সৌধ গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেবার জন্য তিনি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, পরীক্ষামূলকভাবে তিনি তা মাত্র দু'টি জেলায় প্রয়োগ করবার কথা বলেছিলেন।

॥ এডামের প্রস্তাব ॥

প্রথমেই নির্বাচিত জেলার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান ক'রে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

শিক্ষক ও ছাত্রদের উপযোগী ভারতীয় ভাষায় এক প্রস্থ পাঠ্যপুস্তক রচনা ক'রে তার প্রচার করতে হবে।

প্রতি জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য একজন পরীক্ষক (Examiner) নিযুক্ত করতে হবে। তিনি শিক্ষা-সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। পাঠ্যপুস্তক কি ক'রে ব্যবহার করতে হয় তা বুঝিয়ে দেবেন, পরীক্ষা-পরিচালনা, পুরস্কার-বিতরণ এবং সমগ্রভাবে পরিকল্পনা-রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

শিক্ষকদের বই পড়তে উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষকগণ স্কুল ছুটির সময় বছরে একমাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত একাদিক্রমে চার বছর সময়ের মধ্যে তাঁদের শিক্ষণ-শিক্ষা সমাপ্ত করবেন।

শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সেই শিক্ষা ছাত্রদের দান করবেন—ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষকদের গ্রাম থেকে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করবার জন্য তাঁদের ভূমিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

তৎকালীন শাসক সম্প্রদায় এডামের সুপারিশসমূহ বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করেন নি। এই রিপোর্ট বের হবার আগেই মেকলে পাঠশালা ও দেশীয় শিক্ষকদের মান-উন্নয়নের চেষ্টাকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে ঘোষণা করেন। জাতীয় শিক্ষা-উন্নয়নের

একটি প্রচেষ্টা সরকারী বিমুখতায় সূচনাতেই ব্যর্থ হয়ে যায়। এডামের প্রস্তাবকে তখন প্রত্যাখ্যান না করা হলে মনে হয় জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি এতটা পিছিয়ে থাকত না। অশিক্ষার অন্ধকার যেভাবে দেশকে গ্রাস করছিল, জাতীয় শিক্ষা-ধারাকে বাঁচিয়ে রাখলে তা কখনই হত না। যদিও তৎকালীন শাসকগণ এডামের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি, কিন্তু পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনায় তাঁর নীতিকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন আলোচনায় দেখা যায়, তাঁর প্রস্তাবসমূহ পরবর্তী কালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

।। জাতীয় শিক্ষার সাধারণ রূপ ।।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলার শিক্ষা-মানচিত্রের যে রূপটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তা থেকে সমগ্র ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক রূপকে আমরা কল্পনা করতে পারি। এই রূপ-কল্পনায় কিছু ফাঁক (gap) থেকে যাচ্ছে, তবু ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়েই যে রূপটিকে আমরা দেখতে পাই, তা থেকে দেখি প্রাচীন ভারতে গ্রামীণ শিক্ষার একটা ব্যাপক আয়োজন ছিল। শ্রদ্ধেয় অনাথ বসু মশায় বলেন, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন নবীন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইল, তখনও সেই সুপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় নাই, তখনও দেশের সর্বত্র বহু টোল চতুষ্পাঠী ছিল, মক্তব মাদ্রাসা ছিল, তখনও গ্রামে গ্রামে গুরুমহাশয়গণ পাঠশালায় দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, টোলে অধ্যাপকগণ শাস্ত্রচর্চায় রত ছিলেন।"

বিদ্যালয় ছিল দুই শ্রেণীর—প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষালয়। হিন্দু-মুসলমানদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ছিল। হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা, মুসলমানদের জন্য মক্তব। উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দুদের টোল (পশ্চিম ভারতে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রকে পাঠশালা বলা হত, বাংলায় আমরা তাকে টোল বলি) আর মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা। উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্যায়তনগুলোই রাজা, জমিদার ও ধর্মপ্রাণ নর-নারীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘর কোথাও ছিল না। চণ্ডীমণ্ডপ, মসজিদ, অধ্যাপকদের গৃহ, বড়লোকের বৈঠকখানা—এইগুলিই শিক্ষাদানের কেন্দ্র ছিল। ধনী মুসলমানদের মধ্যে 'আখেনজী' রেখে উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাদান করতে গুরুমহাশয় প্রায়ই গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতেন। গাছের ছায়ায় 'বেত্রপাণি' গুরুমহাশয় বিদ্যাবিতরণ করছেন, পল্লী বাংলার এই রূপটির সঙ্গে বাস্তব পরিচয় আমাদের মনে গেঁথে রয়েছে।

পাঠশালার যেমন নিজস্ব ঘর ছিল না, তেমনি বসবার নির্দিষ্ট সময়ও ছিল না। গুরুমহাশয়ের সুবিধামত সময়ই ছিল পাঠশালা বসবার সময়। একজন গুরুমহাশয় এক-একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। এ যুগের মত ছুটিরও ধরাবাঁধা কোন নিয়ম ছিল না। পূজা-পার্বণ, গ্রাম্য উৎসবে পাঠশালা ছুটি থাকত, এছাড়াও ছুটির প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। নিয়ম-কানুন বলতে গুরুমহাশয়ের মর্জি আর মেজাজ, শাসন-ব্যবস্থা বলতে রক্তচক্ষু আর উদ্যত বেত্র। সে যুগের শাস্তি অনেক সময় নির্মমই হত। তবু ছাত্র ও

ক্ষকের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত। ছাত্রসংখ্যা অল্প হওয়ায় গুরুমহাশয় ক্তিগত মনোযোগ বেশী দিতে পারতেন।

বর্তমানের মত শ্রেণীবিভাগ সে সময়ে ছিল না। যে-কোন সময়ে ভর্তি হওয়া যেত, ল ছেড়ে যাওয়ারও কোন নির্দিষ্ট সময় বা বয়স ছিল না। শিক্ষার উপকরণের কোন হুল্য সে যুগে ছিল না। বালির উপর আঙ্গুল চালিয়ে একটু রপ্ত হয়ে উঠলে লপাতা বা কলাপাতায় লিখতে শেখানো হত। এরপর স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষর ভৃতি লিখতে ও পড়তে শেখানো হ'ত। ছেলেরা গুরুমহাশয়ের থেকে মুখে মুখে শুনে দী, গ্রাম, জন্তু-জানোয়ারের নাম মুখস্থ করত আর লিখতে শিখত। মুখে-মুখেই ৌরাণিক কাহিনী আয়ত্ত করত। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, নামতা, শুভঙ্করীর আর্যা ভৃতি শেখানো হ'ত। হাতের লেখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। পাঠশালা ঠের শেষ পর্যায়ে পুঁথি, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি পড়তে ও লিখতে শেখানো ত। কাজ চালানোর মত হিসাব রাখতেও শিক্ষা দেওয়া হত। বাস্তব জীবনের ত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর শিক্ষালাভ হলেই পাঠশালার পাঠ শেষ হ'ত।

তখনকার দিনে পাঠশালায় একটি অভিনব প্রথা ছিল। ছেলেদের যোগ্যতা ুসারে দুটি ভাগ করা হ'ত। উঁচু শ্রেণীর ছেলেদের হাতে ছোট ছোট ছেলেদের ানোর ভার দেওয়া হ'ত। বড়দের পড়ানোর কাজ গুরুমশায় নিজেই করতেন। ও বড়দের পড়াটা ভালভাবে আয়ত্ত হ'ত, আর গুরুমশায় কিছুটা সময় বেশী পেতেন দের দিকে নজর দেবার। একে **'সর্দার পোড়ো প্রথা'** বলা হ'ত। বিদ্যালয়ের লা-রক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি এদের হাতে থাকত। মাদ্রাজের মিশনারী ডাঃ বেল 'সর্দার পোড়ো প্রথা'র উপযোগিতায় মুগ্ধ হন এবং বিলেতে গিয়ে এই প্রথাটির তন করেন। এই স্বল্পব্যয়ী শিক্ষা-পদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ য়ক হয়েছিল। এই ব্যবস্থা Monitorial system নামে ইংলণ্ডের প্রাথমিক ক্ষার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে।

পাঠশালার পড়ুয়া সব সম্প্রদায় থেকেই আসত। উচ্চবর্ণের ছাত্রসংখ্যাই ছিল । নিম্নবর্ণ থেকেও ছাত্র যে আসত না, তা নয়। এমন কি হাড়ি, বাগ্দি, মুচি, লী, জেলে, কাহু, মাহু, কামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ছাত্রের সন্ধানও আমরা পাই। রা পাঠশালায় পড়তে আসত না—যেটুকু লেখাপড়া শিখত বাড়ীতেই শিখত। নকার দিনে উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, কিন্তু পাঠশালায় মাইনে দিয়ে পড়তে । এই বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না। যার যেমন সাধ্য, সে সেই রকম ন দিত। কেউ কেউ নগদ পয়সা দিতে পারত না, চাল-ডাল-তরি-তরকারি দিয়ে গুরু ণা দিত। এ ছাড়া, পূজা পার্বণাতে বিদায়ী ও সিধা গুরুমশায়ের প্রাপ্য ছিল। হিসেব দেখা গিয়েছে, তাঁরা মাসে তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেন। আজকালকার ায় তাঁদের অবস্থা ভালই ছিল বলা যায়। তখনকার দিনে পাঁচ টাকায় দোল- ৎসব করা যেত। সমাজে শিক্ষকদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। চতুষ্পাঠীর

অধ্যাপকদের কেউ করুণার চোখে দেখত না। তাঁরা সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

॥ উচ্চ শিক্ষা ॥

উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল ও মাদ্রাসা। উচ্চশিক্ষা অতি অল্পলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঠশালা যেমন প্রতি গ্রামের অঙ্গ ছিল, উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি ছিল দেশময় ছড়ানো। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। আরবী, ফার্সীর চর্চা হ'ত দিল্লী, পাটনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরে। দেশ-দেশান্তর থেকে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা এসে এসব কেন্দ্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করত। টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ প্রভৃতির চর্চা হত। টোলের অধ্যাপকরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হতেন। ছাত্রদের শিক্ষা শুধু অবৈতনিক ছিল না—থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য অধ্যাপক কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না।

মাদ্রাসাগুলিও অবৈতনিক ছিল। ফার্সী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই দেখা যেত। ফার্সীর হিন্দু অধ্যাপকও ছিল। ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যেই উচ্চশিক্ষা চলত। যোগ্যতা অনুসারে অধ্যাপকগণ বৃত্তিলাভ করতেন। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও দেশে উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রসার ছিল না। উচ্চশিক্ষা জীবনানুসারী না হওয়ায় পাণ্ডিত্যলাভ যতটা হত, বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ততটা এ শিক্ষায় মিটত না।

দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার এই বিস্তৃত আলোচনার কারণ হচ্ছে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল কিনা, তার বিচার করা। এডাম দৃঢ়স্বরে বলেছেন, এই সম্ভাবনাময় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি আমরা দেখেছি, কিন্তু আজকের জগতে যে-সব জাতি শিক্ষায় প্রগতিশীল, একশ বছর আগে সে-সব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি আমাদের দেশের তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে উন্নত ছিল? ইংলণ্ডের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে সংস্কার ক'রে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছে। Monitorial প্রথার উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই ইংলণ্ডের জনশিক্ষা-প্রসারের প্রথম ধাপে এই প্রথাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। ইংলণ্ড যে-প্রথার সদ্ব্যবহার করল, আমরা তাকে ত্যাগ করলাম। চুঁইয়ে-পড়া নীতির ভূত আমাদের এমনি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল যে, এডাম, মনরো, থমসন প্রভৃতি চিন্তাবিদদের সব সুপারিশ উপেক্ষা ক'রে আমাদের শাসকবর্গ এমন এক শিক্ষানীতি গ্রহণ করলেন, যার সঙ্গে জাতির আত্মিক কোন যোগই ছিল না। এর শোচনীয় পরিণাম আমরা ইংরেজ-শাসনে প্রত্যক্ষ করেছি। দেশের মুষ্টিমেয়ের জন্য শিক্ষার আয়োজন ইংরেজ করেছিল, তার ফলে দেশের প্রকৃত জনসাধারণ অজ্ঞতার তিমিরে ডুবে রইল। স্বাধীনতা-লাভের ত্রিশ বছর বাদে আজও আমরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাইনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদিপর্ব

(১৬০০ খ্রীঃ—১৮১৩ খ্রীঃ)

[মিশনারী প্রচেষ্টা—পর্তুগীজ, ফরাসী, দিনেমার। বাংলায় মিশনারী প্রচেষ্টা ও শ্রীরামপুর ত্রয়ী। শিক্ষা-বিস্তারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচেষ্টা—বেসরকারী প্রচেষ্টা, গ্রাণ্টের আন্দোলন, মিণ্টোর মন্তব্য, ১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের শিক্ষাধারা (Education Clause)।]

বহির্ভারতীয়দের কাছে ভারতবর্ষ ছিল 'স্বর্ণভূমি'। ভারতের অতুল সম্পদের লোভে যুগে যুগে বিদেশী লুণ্ঠনকারীর দল ভারতের বুকে হানা দিয়েছে। ইউরোপীয় বণিক্‌দের লোলুপ দৃষ্টি ছিল ভারতের ঐশ্বর্যের দিকে। ভারতে আসবার দুঃসাহসিক অভিযানে কলম্বাস আবিষ্কার করেন নতুন মহাদেশ। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীঃ কালিকটের উপকূলে উপস্থিত হ'ল। ভারতে ইতিহাসে সূচনা হ'ল এক নতুন যুগের। ভারতীয় পণ্যের লোভে দলে দলে ইউরোপীয় বণিকের দল ভীড় জমাল ভারতের কূলে। পর্তুগীজ বণিক্‌দের সঙ্গে সঙ্গে এল দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, সবশেষে এল ইংরেজ। বণিকের দল এল পণ্যের লোভে। তার পিছু পিছু এল খ্রীস্টান মিশনারীর দল ধর্মপ্রচারের জন্য। মিশনারিগণ ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের ভাষা শিখল, বাইবেলের অনুবাদ করল, ধর্মান্তরিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা-প্রসারে আত্মনিয়োগ করল। মিশনারীদের চেষ্টায় শুরু হ'ল ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-বিস্তারের আদি পর্ব।

মিশনারী প্রচেষ্টা :—

পর্তুগীজ :—ইউরোপীয় বণিক্‌দের মধ্যে পর্তুগীজ বণিকের দলই ভারতে প্রথম পদার্পণ করে। বাণিজ্যের জন্য তারা এসেছিল, কিন্তু তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, একথা বলা যায় না। কথিত আছে, তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে কিসের লোভে তোমরা এদেশে এসেছ? তারা বলেছিল, "We have come to seek Christians and spices." বাণিজ্য আর ধর্মপ্রচার দুইই তাদের লক্ষ্য ছিল। কালিকট, গোয়া, দমন, দিউ, বেসিন, বম্বে, হুগলী প্রভৃতি পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রে বণিক্‌দের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক এসে উপস্থিত হন ও ভারতের পঃ উপকূলে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্বদেশীয় আদর্শে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে আধুনিক শিক্ষাধারার প্রথম প্রবর্তক পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায় পর্তুগীজ মিশনারীদের মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার ও রবার্ট-ডি-নোবিলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এঁরা ভারতে আসেন। সেন্ট-জেভিয়ারের নাম এখনও ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছে। ১৫৪২ খ্রী সেন্ট জেভিয়ার ভারতে আসেন। তিনি গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেন। শিক্ষাপ্রচার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'প্রতি গ্রামে একটি ক'রে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে ছেলেরা রোজ সেখানে লেখাপড়া শিখতে পারে—"To build schools in every village, that the children may be taught daily". (Richter—A History of Missions in India)। ১৫৪১ খ্রী মিশনারীরা ধর্মান্তরিতদের শিক্ষার জন্য সেমিনারী অব্ সান্টা ফি (Seminary of Santa Fe) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৫৪৩ খ্রীঃ সেন্ট জেভিয়ার এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৭৫ খ্রীঃ গোয়াতে প্রথম জেস্যুইট কলেজ স্থাপিত হয়, এখানে তিনশতের বেশী শিক্ষার্থী ছিল। ১৫৯২ খ্রীঃ কালিকটে সেন্ট এনস কনভেন্ট নামে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজটি ক্রমে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৭৩৯ খ্রীঃ মারাঠাদের দ্বারা অধিকৃত হবার ভয়ে কলেজ ভবনটিকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়।

পর্তুগীজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

মিশন ও গীর্জার সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। ভারতীয় অনাথদের জন্য আশ্রয়স্থল, এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কৃষিবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য জেস্যুইট কলেজ। ধর্মশিক্ষা ও পাদ্রী তৈরীর সেমিনারী।

পর্তুগীজরাই ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৫৬ খ্রীঃ গোয়াতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এছাড়াও এদের আরও চারটি ছাপাখানা ছিল।

ভারতে পর্তুগীজ শক্তির পতনের ফলে পর্তুগীজ মিশনারীদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এদের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ দেশীয় খ্রীস্টানদের প্রচেষ্টায় বহুদিন সক্রিয় ছিল।

ফরাসী ঃ—মাহে, ইয়ানান, কারিকল, পণ্ডিচারী, চন্দননগর প্রভৃতি ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্রে ফরাসী মিশনারিগণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসব বিদ্যালয়ে স্থানীয় ভাষায় দেশীয় শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পণ্ডিচারীতে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে শিক্ষার্থীদের ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত. এই স্কুলগুলি প্রধানতঃ দেশীয় খ্রীস্টানদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হলেও খ্রীস্টান বিদ্যার্থীকেও ভর্তি করা হত এবং তাদের প্রলুব্ধ করবার জন্য বিনামূল্যে বই, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবার প্রভৃতি দেওয়া হত।

॥ দিনেমার ॥ তাঞ্জোর, ত্রানকুয়েবার ও শ্রীরামপুরে দিনেমার বণিক্‌দের প্রধান আড্ডা ছিল। দিনেমার মিশনারিগণ ছিলেন প্রোটেস্টান্ট, তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল

ত্রানকুয়েবার ও শ্রীরামপুরে। দিনেমার মিশনারিগণ তাদের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের সহায়তা-লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। দিনেমার মিশনারীদের মধ্যে জিগেনবাল্গ (Ziegenbalg) ও প্লুশো (Plütschau) শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁরা ত্রানকুয়েবারে প্রথম কাজ শুরু করেন। ১৭১৬ খ্রীঃ এখানে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, এর আগে ১৭১৩ খ্রীঃ একটি তামিল ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭১৭ খ্রীঃ মাদ্রাজে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য চাঁদা তুলে দু'টি চ্যারিটি স্কুল খোলা হয়। এঁদের কার্যকলাপ শুধু খ্রীস্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দঃ ভারতে অখ্রীস্টান ভারতীয়দের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় এঁরা স্থাপন করেন। এসব স্কুলে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ও ধর্মীয় সেমিনারীতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ডেনমার্ক থেকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে ইংল্যাণ্ডের Society for Promoting Christian knowledge নামে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে দিনেমার মিশনারীদের আর্থিক সাহায্য করা হয়, এই সাহায্যে তাঁরা কাজ চালিয়ে যান। জিগেনবাল্গ তামিল ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন ও একখানি তামিল ব্যাকরণ রচনা করেন।

১৭১৯ খ্রীঃ জিগেনবাল্গের মৃত্যুর পর স্থলজ (Schultz) স্বোয়াৎর্স (Schwartz) ও কায়ের্ণাণ্ডার (Kiernander) তাঁর অসমাপ্ত কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এঁরা শুধুমাত্র দিনেমার অঞ্চলে এঁদের কাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র দঃ ভারতে এঁদের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করেন। পূর্বের মত ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে এঁদের সাহায্য করা হতে থাকে।

কায়র্ণাণ্ডার ১৭৪২ খ্রীঃ ইউরেশীয় ও ভারতীয়দের জন্য ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে চ্যারিটি স্কুল খোলেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ১৭৫৮ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভ এঁকে বাংলায় আমন্ত্রণ করেন। বাংলা দেশে তিনি কয়েকটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপন করেন। দঃ ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে স্বোয়াৎর্সের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি ব্রিটিশ কোম্পানী ও দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে সমভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঞ্জোর ত্রিচিনপল্লীতে তিনি প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহীশূরের হায়দার আলী তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে প্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাঞ্জোরের ইংরেজ রেসিডেণ্ট মিঃ সুলিভান (Sullivan) ভারতীয়দের জন্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করলে স্বোয়াৎর্স তাঁর পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য তাঞ্জোর, রামনাদ ও শিবগঞ্জে তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ১৭৮৭ খ্রীঃ প্রতি স্কুলের জন্য বার্ষিক ২৫০ প্যাগোডা সাহায্য মঞ্জুর করেন। স্থির হয়, ইংরেজী শিক্ষার জন্য নতুন স্কুল খোলা হলে সেগুলিতেও এই সাহায্য দেওয়া হবে। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের এই প্রচেষ্টায় কোম্পানীর সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে শিক্ষা-প্রসারে

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাব এই সাহায্যদানের মধ্যেই পরিস্ফুট। মিঃ সুলিভান ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে বলেছিলেন, এতে ভারতীয়দের সঙ্গে কাজকর্মের সুবিধা হবে। ভাষাগত বাধা অপসারণে কোম্পানীর স্বার্থ জড়িত ছিল বলেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টায় আর্থিক সাহায্য দিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে কোম্পানীর শিক্ষানীতি-বিচারে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

।। বাংলায় মিশনারী শিক্ষা-প্রচেষ্টা ও শ্রীরামপুর-ত্রয়ী ।।

দঃ ভারতে মিশনারিগণ তাঁদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা-বিস্তারের কাজে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য লাভ করলেও বাংলায় মিশনারী প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য পায়নি। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত কলকাতাতেও স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৭২০ খ্রীঃ রেভারেণ্ড বেলমীর প্রচেষ্টায় একটি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৭৩১ খ্রীঃ Society for the Promotion of Indians একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কার্যণাণ্ডারের চেষ্টায় ১৭৫৮ খ্রীঃ পর কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে মিশনারীদের সম্পর্কে বাংলায় কোম্পানীর কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভ ও কোম্পানীর দেওয়ানী-লাভের পর রাজনৈতিক কারণে কোম্পানীর নীতির পরিবর্তন হয়। দেশের শাসন-সৌকর্যের জন্য কোম্পানী শিক্ষা-ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। মিশনারীদের কার্য-কলাপে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে, এই সম্ভাবনায় কোম্পানী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে বিরোধিতা শুরু করে।

।। শ্রীরামপুর-ত্রয়ী ।।

কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে মিশনারিগণ দিনেমার বাণিজ্য-কেন্দ্র শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র ক'রে উত্তর ভারতে তাঁদের প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ উইলিয়ম কেরী কলকাতায় ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য শুরু করলে কোম্পানী তাঁকে বাধা দেয়। শ্রীরামপুরকে ধর্মপ্রচারের নিরাপদ আশ্রয় মনে ক'রে কেরী এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এর আগে ১৭৯৪ খ্রীঃ কেরী তাঁর কর্মস্থল মালদহে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ খ্রীঃ মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড এসে কেরীর সঙ্গে মিলিত হন। কেরী ছিলেন প্রচার-বিশারদ, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণশিল্পী ও মার্শম্যান স্কুল-শিক্ষক। এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের এক নতুন অধ্যায় সৃষ্ট হয়। এঁরা শ্রীরামপুর-ত্রয়ী (Sreerampur Trio) নামে খ্যাত। এঁদের চেষ্টায় ১৮০১ খ্রীঃ বাংলা বাইবেল প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এঁরা ৩১টির বেশী ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেণ্ট' ছেপে প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যে এঁদের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রচারের অতি উৎসাহে এঁরা ১৮০৭ খ্রীঃ হিন্দু ও মুসলমান

উভয় সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য ক'রে একটি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের নিন্দা থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কোম্পানী বিরক্ত হয়ে এঁদের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত ক'রে কলকাতায় পাঠাবার নির্দেশ দেন। দিনেমার সরকারের মধ্যস্থতায় এ-যাত্রা এঁরা নিস্তার পান। দঃ ভারতে ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহের পর ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়।

সরকারী প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়েও মিশনারিগণ তাঁদের শিক্ষা-বিস্তারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮১০ খ্রীঃ মার্শম্যান দেশীয় খ্রীস্টান শিশুদের শিক্ষার জন্য Calcutta Benevolent Institution প্রতিষ্ঠা করেন। মার্শম্যান শ্রীরামপুরে একটি আবাসিক স্কুল খুলেছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ মধ্যে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় কলকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে ১১০টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করত।

।। মিশনারীদের দান ।।

ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীদের একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মিশনারীরা ধর্ম প্রচার করতে এসে কেন শিক্ষা-প্রচারে ব্রতী হন, তাও জানা দরকার। ধর্মান্তরিতদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন, তাই স্কুল খুলতে হল। খ্রীস্টানদের জন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে বাইবেল ছাপানো প্রয়োজন, তাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। ভারতীয় ভাষা শিখতে হলে ভাষার ব্যাকরণ জানা দরকার। আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ তখনও রচিত হয়নি—দেখা যায়, বাংলা ব্যাকরণ ও তামিল ব্যাকরণ মিশনারীরাই প্রথম লিখেছেন। দেশীয় খ্রীস্টানগণ যাতে কাজকর্ম পায়, সেজন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও মিশনারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ ছিল। ফলে, কোথাও ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে শিক্ষা-বিস্তার শুরু হল, কোথাও শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা চলতে লাগল। শিক্ষা-বিস্তার ও ধর্ম-প্রচার মিশনারী প্রচেষ্টায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

মিশনারীরা যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার কার্যপদ্ধতি গতানুগতিক দেশীয় পাঠশালার অনুরূপ ছিল না। আমরা স্কুল বলতে বর্তমানে যা বুঝি, তার প্রথম সূচনা মিশনারী-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির মধ্যে দেখা যায়। যদিও খ্রীস্টধর্মে শিক্ষা দেওয়াই স্কুলগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল, তবুও এখানে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ানো হত। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হত। কাজকর্মের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মিশনারীরাই এদেশে ছাপিয়ে স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করেন ও স্কুলে তার প্রচলন করেন। স্কুল বসবার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ ছিল। শিক্ষকের সংখ্যাও একের অধিক হত। একজন শিক্ষকের অধীনে একটি শ্রেণী পরিচালিত হত। মিশনারী স্কুলগুলিতে যে শিক্ষা-পদ্ধতি ও পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল, পরবর্তী কালে আমাদের দেশের শিক্ষা-

ব্যবস্থায় সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। এই মিশনারী স্কুলের মধ্য দিয়েই আমাদে
দেশে নতুন শিক্ষাধারার প্রথম প্রবর্তন হল।

॥ শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর প্রচেষ্টা ॥

ভারতে বাণিজ্যের জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল। বাণি
প্রধান লক্ষ্য হলেও প্রথম থেকেই নিজেদের এলাকায় ধর্মপ্রচারে কোম্পানী
সচেষ্ট দেখা যায়। ১৬১৪ খ্রীঃ একজন ভারতীয়কে খ্রীস্টধর্মপ্রচারে শিক্ষা দেবার জ
কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাত নিয়ে যাওয়া হয়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস স্বয়ং দীক্ষ
সময় এর নাম দিয়েছিলেন পিটার। ১৬৩৬ খ্রীঃ আর্চবিশপ লর্ড ভারতীয়দের মা
ধর্মপ্রচারের জন্য অক্সফোর্ডে পাদ্রীদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৬৫৯ খ
কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এক ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্মপ্রচারে মিশনারী
ভারতে আসবার সর্বপ্রকার সুবিধা-দানের নির্দেশ দেয়। ১৬৯৮ খ্রীঃ কোম্পানী
সনদ নতুন ক'রে দেওয়ার সময় মিশনারী-সংক্রান্ত একটি ধারা যোগ ক'রে দেও
হল। এতে নির্দেশ ছিল ৫০০ টনের ও তার অধিক প্রতি জাহাজে ও কোম্পানী
প্রতি কুঠিতে একজন ক'রে পাদ্রী রাখতে হবে। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে
ধর্মপ্রচারই এই নির্দেশের পরোক্ষ লক্ষ্য ছিল, তবে ধর্মপ্রচারে কোম্পানীর ইচ্ছ
থাকলেও খুব উৎসাহ ছিল না।

॥ মাদ্রাজ ॥

শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর বিশেষ কোন আগ্রহ না থাকলেও প্রয়োজনে
ক্ষেত্রে কোম্পানী চুপ ক'রেও থাকেনি। কোম্পানী মাদ্রাজ এলাকায় কোম্পানী
কর্মচারীর ছেলেমেয়ে ও ইউরেশিয়ান ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে
এসব স্কুলে প্রথম ভারতীয় কর্মচারীদের সন্তানদের পড়বার অধিকার ছিল না। পরে
এই অধিকার দেওয়া হয়। ভারতীয়দের জন্য পৃথক্ স্কুলও স্থাপিত হয়। কুঠি
সঙ্গে যুক্ত এই স্কুলগুলিকেই ইংরেজ কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারে প্রথম প্রচেষ্টা ব
গ্রহণ করা যায়। দক্ষিণ ভারতে কোম্পানী মিশনারীদের শিক্ষা-বিস্তারে নানাভাবে
সহায়তা করেছে। মিশনারীদের চ্যারিটি স্কুল স্থাপনে আর্থিক সাহায্য, স্কুলগৃহ নির্মাণে
এককালীন দান, স্কুলগৃহ মেরামতের খরচ, লটারীর সাহায্যে অর্থ-সংগ্রহের অনুমতি
দান, স্কুল তহবিলের টাকা বেশী সুদে কোম্পানীর নিকট জমা রাখা প্রভৃতি উপায়ে
কোম্পানী দঃ ভারতে মিশনারীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে।

মাদ্রাজ সরকার ১৭১৫ খ্রীঃ কোম্পানীর প্রোটেস্টাণ্ট কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা
জন্য সেণ্ট মেরীস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ মাদ্রাজের গভর্ণর পত্নী লেডি
ক্যাম্পবেল 'ফিমেল অরফ্যান এসাইলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কি
দিন পরে একটি 'মেল অরফান এসাইলাম'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর ডাইরেক্টর
এখানে ছাত্র-পিছু মাসিক পাঁচটাকা সাহায্য করতেন। আর্কটের নবাব এদের জন্য

বাড়ী তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। এছাড়া, স্থানীয় ধনীদের কাছ থেকেও এই এসাইলাম-গুলির জন্য প্রচুর সাহায্য পাওয়া যেত। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পাদ্রী ডাঃ বেল মেল অরফ্যানের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানেই তিনি প্রথম 'সর্দার পোড়ো পদ্ধতির' (Monitorial System) সহিত পরিচিত হন। এই পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ক'রে তিনি ইংলণ্ডে প্রয়োগ করেন।

॥ **বম্বে** ॥

বম্বের সেণ্ট্ টমাস গির্জার পাদ্রী বিচার্ড কব ১৭১৮ খ্রীঃ গরীব ইউরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট ছেলেদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৭ খ্রীঃ কোম্পানী এই স্কুলটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং বার্ষিক ৩,৬৮০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। ১৮১৫ খ্রীঃ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বম্বে এডুকেশন সোসাইটির হাতে দেওয়া হয়।

॥ **বাংলা** ॥

দঃ ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে মিশনারী ও কোম্পানীর মধ্যে যে সহযোগিতা দেখা যায়, বাংলায় তা সম্ভব হয় নি। বাংলায় দেওয়ানী-লাভের পর রাজনৈতিক কারণে কোম্পানী ধর্মসম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। মিশনারীরা ধর্ম-প্রচারে বাধা পেলেও শিক্ষা-প্রচারে বাধার সম্মুখীন হয় নি। মিশনারী ও কোম্পানীর প্রচেষ্টায় কলকাতায় কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ কলকাতার ইউরোপীয় অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য 'ফ্রি স্কুল সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান 'ফ্রি স্কুল' স্থাপন করেন। ১৭৮১ খ্রীঃ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 'কলিকাতা মাদ্রাসা'র প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে শিক্ষার প্রসার ছাড়া একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধিও ছিল। মুসলিম-তোষণই মাদ্রাসা-প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হয়—"To qualify sons of Mohomedan gentlemen for responsible and lucrative offices in the state, even at that time largely monopolised by the Hindus". (Howel) শিক্ষায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মনোভাবটি এই উদ্দেশ্যের মধ্যে অত্যন্ত নগ্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। মুসলিম ছাত্রদের আকৃষ্ট করবার জন্য এখানে ছাত্রদের জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে শিক্ষার জন্য আসত। প্রকৃতি-দর্শন, কোরান সম্পর্কীয় ধর্মতত্ত্ব, পাটীগণিত, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ আরবী ভাষার মাধ্যমে এখানে পড়ানো হত। এখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বের হলে বিচার-বিভাগে মুসলমান আইন ব্যাখ্যার মৌলবীর কাজ পাওয়া যেত।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বেনারসের রেসিডেণ্ট মিঃ জোনাথন ডানকান ১৭৯১ খ্রীঃ বেনারসে 'সংস্কৃত কলেজে'র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার কোম্পানী বহন করতে থাকে। এখানে হিন্দু আইন, সাহিত্য, ভেষজবিদ্যা, শিল্পশিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি

পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। সংস্কৃত ছাত্ররা এখানকার শিক্ষা শেষ ক'রে বিচার-বিভাগে হিন্দু আইন ব্যাখ্যার জন্য 'জজ পণ্ডিতে'র কাজ পেতেন।

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রীঃ কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নব্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের হিন্দু ও মুসলমান আইন, ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যক্ষভাবে ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-গোষ্ঠীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রইবে। এই কলেজের রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার, কেরী প্রভৃতি অধ্যাপকদের দানেই বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রূপ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। আধুনিক উর্দু গদ্যের জনক ডাঃ গিলক্রাইস্ট এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি একখানি উর্দু অভিধান ও হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কলেজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

।। বে-সরকারী প্রচেষ্টা ।।

ইংরেজ শাসনের আদি যুগে ইংরেজীর সামান্য জ্ঞানই চাকরিলাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হত বলে এই সময়ে বেসরকারী চেষ্টায় বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজী স্কুল খুলে বসেন। এগুলিকে ঠিক স্কুল বলা চলে না, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষাদানের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাদের কিছু আর্থিক উপার্জন হত। আর এখানে যারা শিক্ষার জন্য আসত, তারাও কিছু ইংরাজী শব্দের পুঁজি নিয়ে চাকরির সন্ধানে বের হত। ১৭৮৮ খ্রীঃ মিঃ ব্রাউন কলকাতায় হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কলকাতায় প্রায় কুড়িটি এই জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল অর্থোপার্জন। মেয়েদের জন্যও ছয়টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীঃ মিসেস হজেস মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল খোলেন। মিঃ ম্যাকিনন ছেলেমেয়েদের জন্য ক্যালকাটা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া, পুরাতন নথিপত্রে দেখা যায়, এরটুন, শেরবোর্ণ জগমোহন বসু, শিবু দত্ত প্রভৃতি অনেকে ইংরেজী স্কুল খুলেছিলেন। এসব ইংরেজী স্কুলে ছাত্রের ভীড় সব সময়ই লেগে থাকত, অনেক সময় অনেক ছাত্র স্থান না পেয়ে ফিরেও যেত। এগুলি ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান হলেও ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে এদের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে যখন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোন প্রচেষ্টাই ছিল না, সেই সময়ে এই ব্যবসাদারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের ইংরেজী শিক্ষার চাহিদাকে কিছুটা পূরণ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

।। গ্রান্টের আন্দোলন ।।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সামান্য কিছু করলেও শিক্ষা-বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন দায়িত্ব আছে, একথা স্বীকার করেনি। অর্থনৈতিক

বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহায্যের অভাবে দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিশনারীদের কার্যকলাপে কোম্পানীর তরফ থেকে বাধ সৃষ্ট হওয়ায় এদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। কোম্পানীর মিশনারী-বিদ্বেষের ফলে ইংলণ্ডে মিশনারিগণ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। চার্লস গ্রাণ্ট নামক কোম্পানীর এক প্রাক্তন কর্মচারী ইংলণ্ডে মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানীর মিশনারী-বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। গ্রাণ্ট এদেশে এসে প্রচুর অর্থ উপার্জন ক'রে ১৭৯০ খ্রীঃ দেশে ফিরে যান। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ভারতীয় সমাজের শোচনীয় নৈতিক অবস্থার বর্ণনা ক'রে একখানা প্রচার-পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকার নাম "Observation on the state of society among Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to their morals and on the means of improving them" সাধারণভাবে গ্রাণ্টের এই পুস্তিকাকে 'Observation' বলা হয়। এই পুস্তিকায় তিনি ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, সারা বাংলা দেশে সত্যবাদী চরিত্রবান লোক দুর্লভ, এরা অর্থের জন্য সব অপরাধ করতে পারে। হিন্দুস্থানে দেশপ্রেম বলে কোন বস্তু নেই। এর কারণ সম্পর্কে গ্রাণ্ট বলেছেন, হিন্দুরা ভুল করে, কারণ তারা অজ্ঞ। ভুল বুঝিয়ে দিয়ে অন্ধকার দূর করতে হলে আলোর প্রয়োজন, আর জ্ঞানের আলোকেই এই অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা সম্ভব —"The cure of darkness is introduction of Light The Hindoo err because they are ignorant, and their errors have never fairly been laid before them. The communication of our light and knowledge to them, would prove the best remedy for their disorders."—(*The History of English Education in India—By Sayed Mahmood*). গ্রাণ্ট প্রস্তাব করলেন, ভারতীয়দের উন্নতির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের কুসংস্কার দূর হবে। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও গ্রাণ্টের কোন কোন অভিমতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের যে প্রস্তাব করেছিলেন, চল্লিশ বছর বাদে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সরকারীভাবে সেই নীতিই গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, ভারতীয়গণ ইংরাজী শিক্ষা-গ্রহণে আগ্রহশীল। ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভিড় করবে। ইংরেজী ভাষাকে সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করবার উপদেশও তিনিই দিয়েছিলেন। ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে জনমতগঠনে যে গ্রাণ্টের মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো, তা অনস্বীকার্য।

১৭৯৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ নতুন ক'রে অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা

হয়। এই সময়ে দাসত্বপ্রথা-উচ্ছেদের প্রখ্যাত উদারনৈতিক নেতা উইলবরফোর্স শিক্ষা-বিষয়ক একটি ধারা সনদে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে তিনি বলেন, সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ে ভারতীয়দের উন্নতি ও সুখের বিধান করাই পার্লামেণ্টের কর্তব্য। এই জন্য এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে ধীরে ধীরে ভারতীয়দের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মসম্পর্কীয় জ্ঞানের বিকাশ হয়। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, যাঁরা লোকসেবামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে যেতে চান, তাঁদের যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। প্রস্তাবে শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করবার কথাও বলা হয়।

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বললেন, লেখাপড়া শিখিয়ে আমেরিকা হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে, ভারতীয়দের আর লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ নেই। আর জ্ঞানের কথা যদি তোলা যায়, তাহলে ভারতকে জ্ঞান দান-করার চেয়ে সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা করাই বরং আমদের উচিত হবে। অর্থাৎ কোম্পানী শিক্ষার জন্য কোন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তাই কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে উইলবরফোর্সের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল।

পার্লামেণ্টে এই পরাজয়ের পরও গ্রাণ্ট আন্দোলন বন্ধ করলেন না। কিছুদিন বাদে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন, এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এইবার তিনি পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন চালাতে থাকেন।

॥ **মিণ্টোর মন্তব্য** ॥

১৮০৭ খ্রীঃ লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্য-বিদ্যার অনুরাগী। ১৮১১ খ্রীঃ ৬ই মার্চ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতি সম্পর্কে এক বিবরণী তিনি কোম্পানীর নিকট পেশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতের সাহিত্য ও বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি নষ্ট হয়ে যাবে। সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে শিক্ষারই শুধু অবনতি হবে না, যাঁরা বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রে এই জ্ঞানের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই পণ্ডিত-সমাজও লোপ পেয়ে যাবে। বর্তমান অবস্থা সৃষ্ট হবার পূর্বে রাজা ও ধনীরা বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দিতেন, এখন তার অভাব ঘটেছে। বিদ্যানুরাগী ইংরেজ জাতি যদি এ বিষয়ে যত্ন না নেয়, তাহলে সে অতি লজ্জার কথা হবে।

মিণ্টো তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের সংস্কারের প্রস্তাব করেন। এই সঙ্গে নদীয়া ও ভোরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন এবং জৌনপুর ও ভাগলপুরে মাদ্রাসা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।

॥ **১৮১৩ খ্রীঃ সনদ-আইন** ॥

১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ-আইন পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। জনমতের চাপে এই সনদ আইনের ৪৩ ধারায় ভারতে শিক্ষা-বিষয়ক একটি শর্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

ধারার দুটি অংশ। প্রথম অংশে বলা হল, বৃটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও
-বিধান, পণ্ডিতদের উৎসাহ-দান এবং এদেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার
নকল্পে কোম্পানী অন্য সব রকম খরচখরচা মিটিয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ
ন—"a sum of not less than one lac of rupees in each year
l be set apart and applied to the revival and improvement
literature and encouragement of the learned natives of India,
for the introduction & promotion of a knowledge of
nces among the inhabitants of the British territories in
a."

৮১৩ খ্রীঃ সনদ-আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারে প্রথম
রী পদক্ষেপ বলা যায়। এর পূর্বে কোম্পানী শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করলেও
যে সমাজের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা স্বীকার করেনি। এই শিক্ষাধারার বলে
পানী আইনগতভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। মিশনারীরা স্বাধীনভাবে
দেবার অধিকার পেয়ে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা ক'রে নব্য শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হল।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা

(১৮১৩ খ্রীঃ—১৮৩৩ খ্রীঃ)

শিক্ষাধারা (Education Clause) সম্পর্কে সরকারী মনোভাব
মিশনারী প্রচেষ্টা :—
বাংলা
বম্বে
মাদ্রাজ

বেসরকারী প্রচেষ্টা :—
বাংলা—হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রী-শিক্ষা সূচনা।
বম্বে, মাদ্রাজ, ইউ-পি।
সরকারী উদ্যোগ পর্ব—
বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ।

১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ-আইনে শিক্ষাধারাটি (Education Clause) গৃহীত হবার ফলে আশা করা গিয়েছিল, সরকারী প্রচেষ্টায় দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটবে এবং সরকারী* শিক্ষা-সম্পর্কীয় একটি সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণ ক'রে শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষা-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোম্পানীর প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। তাই সর্বভারতীয় কোন নীতি দ্বারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোন প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হয়নি। শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট এক লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার ফলে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতারই সৃষ্টি হয়। যদি কর্তৃপক্ষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতেন, তাহলে ভারতের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দলেরও সৃষ্টি হত না—আর দুই পক্ষ এতটা বিতর্ক সৃষ্টি করবার অবকাশও পেত না।

।। শিক্ষাধারা (Education Clause) সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাব ।।

সনদ-আইনের শিক্ষাধারায় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি ("the revival and improvement of literature") বলতে ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বোঝায়, তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। সনদে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন (the introduction and promotion of a knowledge of the science) করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে প্রাচ্য বিজ্ঞান কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, তা কিছুই স্পষ্ট ক'রে বলে দেওয়া হয়নি। ফলে, শিক্ষা-ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ যদি সুস্পষ্টভাবে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন, তাহলে কোন জটিলতার সৃষ্টি হত না। শিক্ষাধারা সম্পর্কে

* সরকার ও ভারত সরকার বলতে ১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার বুঝতে হবে।

কোম্পানী ১৮১৪ খ্রীঃ ৩রা জুন একটি ডেস্‌প্যাচ পাঠান—এই ডেস্‌প্যাচ থেকে মনে হয় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ প্রাচ্য বিদ্যা প্রসারের জন্যই এই ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে চেয়েছিলেন।

ডেস্‌প্যাচে গভর্ণর জেনারেলকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়। ডেস্‌প্যাচে টাকা কিভাবে খরচ হবে, সেই সম্পর্কে কিছুটা আভাষও দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য ধরনের ইংরেজী শিক্ষার কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবের তাঁরা বিরোধিতা করেন। তাঁদের ভয় ছিল, এতে হিন্দুরা আপত্তি করবে। প্রাচ্য দর্শন, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, ভেষজ-বিদ্যা প্রভৃতির উপযোগিতার কথা উল্লেখ ক'রে প্রাচ্য বিদ্যার জন্য টাকা খরচের কথা বলা হয়। কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারিগণ যাতে দেশীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রাচ্য বিদ্যা শেখেন, তাও বলা হয়েছিল। ডেস্‌প্যাচে বলা হয়, এতে ভারতীয়দের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ়তর হবে। পল্লীতে পল্লীতে মাতৃভাষার সাহায্যে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল, সেগুলি বাঁচিয়ে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম্য শিক্ষকদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে বলা হয়। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের একটা অংশ ও অন্যান্য দানের সাহায্যে গ্রাম্য শিক্ষককে প্রতিপালন করবার প্রাচীন সামাজিক প্রথাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার কথাও এই ডেস্‌প্যাচে বলা হয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের পক্ষে কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশনামায় কোন কথাই বলেন নি। কিন্তু কিছু দিন বাদেই কোম্পানীর মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেশের শাসন-ব্যবস্থা যখন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হ'ল, তখন কোম্পানীও সুর বদলাতে আরম্ভ করল। প্রাচ্য বিদ্যার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসারই যে কোম্পানীর সত্যিকারের অভিপ্রায়, পরবর্তী নির্দেশসমূহের মধ্যে তা পরিস্ফুট হতে থাকে।

॥ লর্ড হেস্টিংসের অভিমত ॥

কোম্পানীর এই নির্দেশের পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড হেস্টিংস ১৮১৫ খ্রীঃ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্য বরাদ্দ অর্থের বৃহৎ অংশ ব্যয় করার নির্দেশ মেনে নিয়ে তিনি বললেন, গণশিক্ষার প্রসার না হলে কোন দেশে শক্তিশালী সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। জনগণের অজ্ঞতা অপেক্ষা শিক্ষাই শক্তিশালী সরকার গঠনের উপায়। যে-কোন শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গ্রাম্য শিক্ষকদের কথা সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম্য শিক্ষক অতি সামান্য পারিশ্রমিকে লেখাপড়া, অঙ্ক, দোকান ও জমিদারী হিসাবের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখিয়ে থাকেন। তিনি প্রতি জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুটি ক'রে স্কুল ও বিপথগামী ছেলেদের (infant profligates) সংশোধন ও চাকরির সংস্থানের জন্য শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ দেন। লর্ড হেস্টিংসের সাধু উদ্দেশ্য তিনি কাজে পরিণত করতে পারেননি। তিনি গুর্খা-যুদ্ধ, পিণ্ডারী-দমন প্রভৃতি কাজে তাঁর শক্তি নিয়োগ করায় তাঁর পক্ষে পরিকল্পনাকে আর রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

।। মিশনারী প্রচেষ্টা (১৮১৩—৩৩) ।।

।। বাংলা ।। ১৮১৪ খ্রীঃ থেকে পরবর্তী আট বছর শিক্ষা ডেসপ্যাচের নির্দেশমত শিক্ষা-বিস্তারের কোন চেষ্টাই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। সরকারী এই নিশ্চেষ্টতার যুগে মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যমে বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা শ্রীরামপুর অঞ্চলে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের ছাপাখানা থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করা হয়। ছাপা বই বাজারে সুলভ হওয়ায় শিক্ষা-প্রসারের পথ সুগম হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ ২৩শে মে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই বছরই ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা ভারতীয় খ্রীস্টান অখ্রীস্টান সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দিনেমার সরকারের এক সনদের বলে এই কলেজ থেকে ছাত্রদের তাঁরা ডিগ্রী দিতে শুরু করেন। এই কলেজই ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মিশনারী কলেজ।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেভারেণ্ড মে ১৮১৪—১৮ খ্রীঃ মধ্যে চুঁচুড়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ৩৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর প্রায় তিন হাজার ছেলে এখানে পড়াশুনা করত। সরকার থেকে এই স্কুলগুলির জন্য প্রথম মাসিক ৬০০ টাকা ও পরে ১,৮০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। রেঃ মে'র মৃত্যুর পর পিয়ার্সন ও হার্লি এই স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের কালনা, বহরমপুর, চন্দননগর, শ্যামনগর প্রভৃতি স্থানে ও দঃ ভারতে ব্যাপকভাবে এঁরা স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানে ১০টি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। শিবপুরে ১৮২০ খ্রীঃ 'বিশপস্ কলেজ' নামে দ্বিতীয় মিশনারী কলেজ স্থাপিত হয়।

।। আলেকজাণ্ডার ডাফের মতবাদ ।।

স্কট মিশনারী চার্চের শিক্ষাবিদ্ পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮২৯ খ্রীঃ এদেশে আসবার পর মিশনারীরা নবীন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে মিশনারী শিক্ষা-প্রয়াস নীতিগতভাবে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। ডাফ এদেশের মিশনারীদের কার্য-পদ্ধতি দেখে মোটেই খুশী হতে পারেন নি। প্রাথমিক স্কুলসমূহে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। প্রধানতঃ, অনাথ বা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, উপাসনায় খুব কম লোক উপস্থিত হত। ডাফের মত গোঁড়া পাদ্রীর এতে খুশী হবার কথা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও বাইবেল দ্বারাই ভারতীয়দের মুক্তি সম্ভব। তিনি স্থির করলেন, সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচার করতে হবে এবং মিশনারীদেরকে সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। তিনি চুঁইয়ে-পড়া নীতিতে (downward

filtration theory) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মনোভাব গোপন রাখেন নি। এই নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৮৩০খৃঃ তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন—বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে খ্যাত। এখানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, বাইবেল এখানে ছাত্রদের 'অবশ্যপাঠ্য' তালিকাভুক্ত ছিল। খ্রীস্টধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। বাংলা দেশে এই কলেজেই প্রথমে Political Economics পড়ানো শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ের সুনাম এত বেশী ছিল যে, হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ এখানকার শিক্ষারীতির প্রশংসা করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হয়।

॥ **বম্বে** ॥

মিশনারী প্রচেষ্টা এই সময়ে শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮২২ খ্রীঃ স্কট মিশনারীরা কাথিয়াড়ে ইংরেজী ও ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন করেন। ডাঃ ডাফ বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেছিলেন, স্কট মিশনারী ডাঃ উইলসন বম্বে প্রদেশে সেভাবে কাজ শুরু করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ তিনি বম্বে শহরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছর বাদে ডাফের কলেজের আদর্শে তিনি ছেলেদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বম্বের উইলসন কলেজটি এই স্কুলেরই পরিবর্তিত রূপ।

আমেরিকান মিশনারী সোসাইটি উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বম্বে অঞ্চলে কাজ করছিল। এঁদের উদ্যোগে যথাক্রমে ১৮১৫ ও ১৮১৮ খ্রীঃ ছেলে ও মেয়েদের জন্য দু'টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। চার্চ মিশনারী সোসাইটি নীতি শিক্ষামূলক স্কুলপাঠ্য ছেপে প্রচার করতে থাকে। এই সোসাইটি ১৮২০ খ্রীঃ একটি স্কুল স্থাপন করে। এদের কর্মক্ষেত্র পুণা, থানা, বেসিন প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

॥ **মাদ্রাজ** ॥

সনদ আইনে 'শিক্ষাধারা' গৃহীত হবার বহুপূর্ব থেকেই মাদ্রাজে মিশনারিগণ বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিনেমার ও লণ্ডন স্কুল সোসাইটির কাজ খুব ভালভাবে চলছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ মিঃ হফ নয়টি স্কুল স্থাপন করেন, এই স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৮৩ জন। ১৮১৯ খ্রীঃ ওয়েলস মিশনারী সোসাইটি কাজ শুরু করে। এই সোসাইটি মাদ্রাজ শহরে দু'টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে। দুটি স্কুলের একটি বর্তমানে মাদ্রাজ রায়পেট কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খ্রীঃ হিসাবে দেখা যায়, চার্চ সোসাইটি মাদ্রাজে ১০৭টি স্কুল পরিচালনা করছে এবং এই স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ২২,৮৮২ জন।

।। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা-প্রসার ।।

।। বাংলা ।।

ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মিশনারী প্রচেষ্টা প্রথম যুগে ভারতীয়গণ সুনজরে দেখেন নি। মিশনারী শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াসের পিছনে যদি কোন অভিসন্ধি না থাকত, তাহলে হয়ত ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন না। সে যুগে শিক্ষা-বিস্তার আর খ্রীস্টধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টা একই সঙ্গে চলতে থাকায় দেশের গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিরোধিতাই করেন। উনবিংশ শতকের শুরু থেকে দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্তন শুরু হয়। প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হয়েও দেশের চিন্তানায়কগণ বুঝতে পারেন, দেশের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাব্রতী ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাহায্যে শিক্ষার প্রসার এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় প্রথম প্রচেষ্টা খুব সীমাবদ্ধভাবে শুরু হলেও পরবর্তী ব্যাপক বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব বলে এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় নব্য ভারতের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সম্পর্কে যখন এদেশের লোক বীতশ্রদ্ধ, সেই সময়ে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেন দেশের উন্নতির জন্য ও বিশ্বের প্রগতিশীল জাতিসমূহের সঙ্গে সম-মর্যাদার অধিকারী হতে হলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-গ্রহণ অপরিহার্য। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-বিস্তারে রামমোহনের সহযোগী হন ডেভিড হেয়ার। এঁদের সহায়ক ও সমর্থক রূপে রইলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট।

।। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ।।

ডেভিড হেয়ার এদেশে এসেছিলেন ব্যবসা করতে। তাঁর সাধারণ পরিচয় ওয়াচমেকার বলে। তাঁর নিজের কোন উচ্চ শিক্ষা ছিল না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন an uneducated man friendly to education. ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার দুরবস্থা দেখে তিনি শিক্ষাপ্রচার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ধর্মনিরপেক্ষভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে তিনি এদেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা রচনা ক'রে কলিকাতায় বিশিষ্ট হিন্দুদের হাতে দেন। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্যার ইস্ট তাঁর বাড়ীতে এক সভা আহ্বান করেন। তাঁর নিমন্ত্রণে ১৮১৬ খ্রীঃ ১৪ই মে বহু গণ্যমান্য বিত্তবান হিন্দু ও বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এক সভায় সমবেত হন। সভায় বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে

রামমোহন রায়ের কথাও উঠেছিল। কয়েকজন গোঁড়া হিন্দু তাঁকে বিদ্যালয় সমিতিতে গ্রহণে আপত্তি করেন। রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম থেকেই জানতেন এবং এর পিছনে তাঁর সমর্থনও ছিল। তিনি যুক্ত থাকলে এই প্রচেষ্টায় বাধাসৃষ্টি হতে পারে বিবেচনায় তিনি নিজ থেকেই দূরে সরে দাঁড়ালেন।

স্যার ইস্টের বাড়ীতে দ্বিতীয় সভায় স্থির হল প্রস্তাবিত কলেজের নাম হবে 'হিন্দু কলেজ'। কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ১০ জন ইউরোপীয় ও ২০ জন হিন্দু সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার ধনী সমাজ প্রচুর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজ চাঁদ বাহাদুর ১৩ হাজার টাকা দান করেন। প্রথম সভায় এক লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস আর্ভিন কলেজের ইউরোপীয় সম্পাদক ও দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। স্থির হয়, বিদ্যালয়ের দুটি বিভাগ থাকবে—স্কুল বা পাঠশালা বিভাগ এবং অ্যাকাডেমি বা মহাবিদ্যালয় বিভাগ।

হিন্দু সন্তানদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষিত ক'রে তোলাই ছিল কর্মকর্তাদের লক্ষ্য "to instruct the sons of Hindoos in the European and Asiatic languages and sciences". শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য প্রধান স্থান লাভ করে। এছাড়া, আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ও পাঠ্যতালিকায় স্থান লাভ করে।

১৮১৭ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী ৩৪নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে ২০ জন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের কাজ শুরু হয়। চন্দননগরবাসী জেমস আইজ্যাক ডি আনসেলম্ কলেজের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় শুরু হলেও ১৮২৩ খ্রীঃ বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম কিনবার ও অধ্যাপকদের বেতন দেবার জন্য 'শিক্ষা-সভা' (General Committee of Public Instruction) কলেজে অর্থ সাহায্য করে। ১৮২৪ খ্রীঃ থেকে নিয়মিত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই কলেজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮১৯ খ্রীঃ এখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭০ জন, ১৮২৯ খ্রীঃ ছাত্রসংখ্যা হয় ৪২১ জন। ১৮৩১ খ্রীঃ শিক্ষা-সভার (G.C.P.I.) এক রিপোর্টে জানা যায়, এখানকার ছাত্রদের মত ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে পারদর্শিতা ইউরোপীয় বিদ্যালয়সমূহেও কম দেখা যায়—"A command of English language and familiarity with English literature and science had been acquired to an excellence rarely equalled by any school in Europe".

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের নবজাগরণের প্রথম বার্তাবহরূপে আমরা দেখতে পাই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা

হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও বাংলার নব জাগরণের একজন অগ্রদূত। তাঁর উগ্র মতবাদ সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ না হলেও 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। একথ ঐতিহাসিক সত্য।

॥ সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা ॥

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতম শিক্ষার সম্যক ব্যবস্থার কথাও সমাজসেবিগ চিন্তা করতে শুরু করেন। বাংলা ও ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য ১৮১৭ খ্রী বেসরকারী প্রচেষ্টায় 'কলিকাতা বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয়। গভর্ণর জেনারেল পত্নী মার্শনেস অব হেস্টিংস প্রথম থেকেই সক্রিয়ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি নিজেই কিছু প্রাথমিক পুস্তক রচনা করেছিলেন। নামমাত্র মূল্যে এই সমিতি শিশুপাঠ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বইয়ের প্রচার করতে থাকে। অর্থের অভাব সত্ত্বে ১৮২১ খ্রীঃ মধ্যে সমিতি ৩৮টি বিভিন্ন বিষয়ক বইয়ের ১,২৬,৪৪৫ খণ্ড প্রচার করে ঐ বছর কমিটি সরকার থেকে ৭০০০ এককালীন দান ও মাসিক ৫০০ টাকা সাহায পায়। ১৮১৯ খ্রীঃ এই সোসাইটির অনুপ্রেরণায় ও বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতায় "ক্যালকাট স্কুল সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা হয়। এই কমিটির পরিচালনায় ১৮২১ খ্রীঃ ১১৫টি স্কুল ছিল এই স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৩,৮২৮ জন। সোসাইটির কর্মিগণ স্কুল গুলিতে বই দেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া, পরিচালনার দেখাশুনা প্রভৃতি কাজ করত সরকার থেকে কমিটিকে মাসিক যে ৫০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল, ১৮২৫ খ্রী কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স তা অনুমোদন করেন; ভারতের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকা এই প্রথম কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের অনুমোদন লাভ করল। এর আগে উচ্চ শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার জন্যই টাকা বরাদ্দ হত। গণশিক্ষার জন্য সরকারী দায়িত্বে এই প্রথম স্বীকৃতি।

সমিতি পাঠশালার শিক্ষকদের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। সোসাইটির আদর্শ-বিদ্যালয়গুলি থেকে ইংরেজী শিখে ছাত্ররা হিন্দ কলেজে ভর্তি হত। ১৮৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সোসাইটি প্রশংসনীয়ভাবে কাজ চালিয়ে যায় অর্থাভাবে সোসাইটির কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হলেও ১৮৩৪ খ্রীঃ ডেভিড হেয়ারের অর্থ সাহায্যে ও পরিচালনায় সমিতির পটলডাঙ্গার স্কুলটি একটি আদর্শ ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়। এই স্কুলকে অনেক সময় হিন্দু কলেজের Preparatory School বলা হত।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহন রায় সিমলায় একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই স্কুল হেদুয়ায় স্থানান্তরিত করেন এবং নাম দেন 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুল'। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ্যাংলো হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুলটি ও ভবানীপুরের জগমোহন বোসের ইউনিয়ন স্কুল ইংরেজী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। এ্যাংলো হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা নীতিধর্ম-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়

এখানকার ছাত্ররা অগ্রণী হয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় চর্চার জন্য একটি সভা স্থাপন করে।

১৮২৯ খ্রীঃ ১লা মার্চ গৌরমোহন আঢ্য কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বেতন নেওয়া হত। এখানে ইংরেজী সাহিত্য ও গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ইংরেজীর মাধ্যমে শেখানো হত। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর হেডমাস্টার হরম্যান জেওফ্রের সময়ে এই স্কুল জনপ্রিয়তায় হিন্দু কলেজের সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

॥ স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা ॥

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার কোন আয়োজনই ছিল না। মেয়েরা সামান্য যেটুকু লেখাপড়া শিখত, তা ঘরোয়াভাবেই শিখত। মেয়েদের জন্য মিশনারীরা প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য ১৮১৮ খ্রীঃ রেভারেণ্ড মে চুঁচূড়ায় একটি স্কুল খোলেন, স্কুলটি বেশী দিন চলেনি। ১৮১৯ খ্রীঃ কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় মেয়েরাই যাতে এগিয়ে আসে, সেজন্য ব্যাপটিস্ট মিশনের অনুরোধে মিসেস্ পিয়ার্স ও মিসেস্ লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮২০ খ্রীঃ ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এর নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে "—The Female Juvenile Society for the Establishment and support of Bengali Female Schools."

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরই সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম জুভেনাইল স্কুল স্থাপিত হয় এবং ক্রমে আরও স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীঃ এই সোসাইটির পরিচালনায় ২০টি স্কুল ছিল। ১৮৩২ খ্রীঃ এই সোসাইটি "The Calcutta Baptist Female School Society" এই নতুন নাম গ্রহণ করে। সমিতির স্থাপিত স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক, এবং এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত না। ১৮৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সমিতি সক্রিয় ছিল।

এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য লণ্ডনের "British and Foreign School Society"র পক্ষ থেকে কুমারী এন্. কুক্কে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ১৮২১ খ্রীঃ এদেশে আসেন এবং চার্চ-মিশনারী সোসাইটির আর্থিক সহায়তায় এক বছরের মধ্যে ৮টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। ভাল ছাত্রীদের সাড়ী, পয়সা ইত্যাদি দেওয়া হত। এছাড়া, পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। এ সব স্কুলে লেখা, পড়া, বানান, ভূগোল, হাতের কাজ প্রভৃতি শেখানো হত। ১৮২৪ খ্রীঃ মিস্ কুকের পরিচালনাধীনে ২৪টি স্কুল ছিল। মিঃ উইলসনের সঙ্গে মিস্ কুকের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় "Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে এই

স্কুলগুলির পরিচালনার ভার সেই সমিতিকে দেওয়া হয়। ১৮২৪ খ্রীঃ বড়লাট-পত্নী লেডী আমহার্স্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার কয়েকজন য়ুরোপীয় মহিলা Ladies Society for Native Female Education নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সমিতি জানবাজার ও ইন্টালী অঞ্চলে ৬টি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ২০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় 'সেণ্ট্রাল স্কুল' নামে মেয়েদের একটি আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই স্কুলে শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই স্কুল-গৃহেই স্কটিশচার্চ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

॥ বম্বে ॥

১৮১০ খ্রীঃ বেসরকারী ইউরোপীয়গণ বম্বে প্রদেশের ইউরোপীয় সৈনিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য The Society for Promoting the Education of the poor within the Govt. of Bombay নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সাধারণের দান ও সরকারী সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হত। থানা, সুরাট, বম্বে প্রভৃতি স্থানে সোসাইটি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করে। ১৮২০ খ্রীঃ দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল (১) নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা, (২) দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, (৩) দেশীয় স্কুলসমূহের উন্নতিসাধন। দু'বছরে মধ্যে কমিটির কাজ বেড়ে যাওয়ায় সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কমিটি দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি পূর্বনামে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অপর শাখা Bombay Native Education Society নাম গ্রহণ ক'রে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারে ব্রতী হয়। বম্বের গভর্ণর এলিফিনস্টোন ছিলেন এই সমিতির প্রথম সভাপতি। প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা সর্কে অনুসন্ধান ক'রে কমিটি দেখতে পায়, শিক্ষা-বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান-পদ্ধতি, পাঠ্য বইয়ের অভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। কমিটি এসব অসুবিধা দূর করবার জন্য স্কুলে ব্যবহারযোগ্য পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা, বম্বে শহরে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, এবং ভারতীয়দের জন্য ইংরেজী স্কুল খোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সমিতি সাহায্যের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হলে এলফিনস্টোনের সুপারিশে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স মাসিক ৬০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। কঙ্কন, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জায়গায় কমিটির পরিচালিত স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পাঠানো হয়। সমিতি দেশীয় ভাষায় ৪০ খানি বই প্রকাশ করে এবং বম্বে শহরে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস স্থাপন করে।

॥ মাদ্রাজ ॥

মাদ্রাজ প্রদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিশেষ আয়োজন হয়েছিল। বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়তায় বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালোরের ইংরাজী

স্কুলটি মহীশূর-রাজ থেকে নিয়মিত সাহায্য পেত। মাদ্রাজ স্কুল সোসাইটি সরকার থেকে বার্ষিক ৬০০০ টাকা সাহায্য পেত।

। ইউ. পি. ॥

সংযুক্ত প্রদেশে বেসরকারী প্রচেষ্টায় শহর ও গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ জয়নারায়ণ ঘোষাল বেনারস শহরে একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্কুল তহবিলে এককালীন ২০,০০০ টাকা দান করেন। সরকার থেকে এই স্কুলের জন্য বার্ষিক ৩,০৩৩ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। তাঁর ছেলে স্কুল তহবিলে আর ও ২০,০০০ টাকা দান করেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর সম্পত্তির আয় থেকে আগ্রা কলেজ স্থাপিত হয়। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ২০,০০০ টাকা।

। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ ॥

বাংলা :—১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনে শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর সরকারী তহবিল থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষার জন্য সরকার থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে কিছু করবার আছে, ১৮১৩ খ্রীঃ পূবে সরকার সে বিষয়ে সচেতন হয়নি। এর আগে সামান্য কিছু সাহায্য মঞ্জুর করা ছাড়া সরকারী চেষ্টা বা উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ক'রে কিছু গড়ে উঠেনি। ১৮২১ খ্রীঃ পুণায় একটি সংস্কৃত কলেজ, ১৮২২ খ্রীঃ কলকাতায় দেশীয় ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য 'মেডিকেল স্কুল' স্থাপন হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রচেষ্টা। সরকার থেকে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। ১৮২১ খ্রীঃ উইল্‌সনের পরামর্শে স্থির হয়, কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ খোলা হবে, বছরে পাঁচশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা খরচের কথাও স্থির হয়। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যে কলেজ খোলা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের কর্মনীতি দূর করলেন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল মিঃ এডাম। ১৮২৩ খ্রীঃ ৩১শে জুলাই সপারিষদ বড়লাট দশজন সভ্য নিয়ে General Committee of Public Instruction (G. C. P. I.) নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই 'শিক্ষাসভা'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধনের জন্য শিক্ষাসভা গঠিত হয়েছে।—"With a view to the better instruction of the people, to the introduction among them the useful knowledge and to the improvement of their moral character." বাংলা দেশের সিভিলিয়নদের নিয়েই এই 'সভা' গঠিত হয়। 'সভা'র সাহায্যের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হেরিংটন শিক্ষা-সভার প্রথম সভাপতি ও ডাঃ হোরেস উইল্‌সন্ প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমগ্র উত্তর ভারতে সভার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষাসভা (G. C. P. I.) গ্রহণ করে।

সভার হাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার ও বরাদ্দীকৃত লক্ষ টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরকারের হাতে না থাকায় স্থির হয় 'শিক্ষাসভা' শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবে।

১৮২৪ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী গোলদীঘির পাড়ে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১লা জানুয়ারী থেকেই বৌবাজারে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। আগ্রা ও দিল্লীতে দু'টি প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষার কলেজ খোলা হয়। সংস্কৃত ও আরবী বই ছেপে প্রচার করা হয়। ইংরেজী বই প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ ক'রে ছেপে প্রচার করবারও আয়োজন হয়।

দেশের জনসাধারণ যখন ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল, এবং শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিধাহীন, সেই সময়ে শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে এক পত্রে সংস্কৃতকলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন সরকারের আরও প্রগতিশীল ও উন্নত ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ টাকায় ভারতীয়দের জন্য গণিত, রসায়ন, প্রাকৃতদর্শন, শরীরবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। রামমোহনের স্মারকলিপিতে দেশের প্রগতিশীল শিক্ষিত জনসাধারণের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য রাধাকান্তদেব, ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল দল প্রাচ্য বিদ্যার ব্যাপক প্রচারের সমর্থনই করেছিলেন।

শিক্ষা-সভার (G.C.P.I.) প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থকগণ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ব useful knowledge-এর প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সংস্কৃত বা আরবীর মাধ্যমেই পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার অনুশীলন সম্ভব। বিলাতের কর্তৃপক্ষে ইংরেজী শিক্ষা-প্রচারের ইচ্ছা থাকলেও দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। শিক্ষা-সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের ডেসপ্যাচ থেকে বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে যে, তাঁদের মনোভাব প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের অনুকূলেই ছিল ইংরেজ শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতিগতিও বদলে যেতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স শিক্ষা সম্পর্কে ভারত সরকারকে এ পত্র দেন। অনেকে অনুমান করেন, জেম্‌স মিল এর খসরা তৈরি করেছিলেন এতে বলা হয়, 'শিক্ষা-সভা' (G.C.P.I.) শিক্ষার যে আয়োজন করেছে, তা বেশীর ভাগ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর। এর সামান্য অংশেরই মাত্র কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে— "A great deal of what was frivolous, not a little of what was purely mischievous and a small remainder in which utility was in any way concerned". শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় বিদ্যা সম্পর্কে কো বললেন, প্রয়োজনীয় বিদ্যা বলতে হিন্দু বিদ্যা বুঝায় না—"The great end should not have been to teach Hindu learning but useful learning."

'শিক্ষা-সভার' পক্ষ থেকে বড়লাটকে জানানো হল, দেশের লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী এবং প্রাচীন ভাষার সাহায্যে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সভার পক্ষ থেকে যাই বলা হোক-না-কেন, দেশের লোকের মধ্যে যে ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল, এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ইংরেজী শিক্ষার জন্য দেশবাসী আগ্রহশীল হয়েছিল তার অর্থ এই নয় যে, হঠাৎ দেশের লোকের মনে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ অনুরাগ বা শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজী শিখলে ভাল চাকরি মিলবে, সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। এক কথায় অর্থ ও মান এই দুই ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ। ইংরেজী শিক্ষার দাবীকে 'শিক্ষা-সভা' অস্বীকার করতে পারেনি। 'সভা' ১৮৩৩ খ্রীঃ আগ্রা কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দিল্লী ও বেনারসে ইংরেজী শিক্ষার জন্য জেলা স্কুল খোলা হয়। ১৮৩১ খ্রীঃ 'শিক্ষা-সভা'র কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, সভার পরিচালনায় ১৪টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ৩৪৯০ জন ছাত্র আছে। ১৮২৪ খ্রীঃ সভার পক্ষ থেকে একটি প্রেস স্থাপিত হয় এবং সংস্কৃত ও আরবী বই প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, এই বইগুলির কোন সাধারণ চাহিদা নেই। 'শিক্ষা-সভা' স্বীকার করতে বাধ্য হন দেশে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারের জন্য নিজ নিজ পল্লীতে ইংরেজী স্কুল খুলে 'সভা'র কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়, অর্থের অভাবে তাদের কোন সাহায্য করা সম্ভব হয়নি।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতে গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসবার পর সরকারী শিক্ষানীতি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি ১৮২৯ খ্রীঃ এক চিঠিতে শিক্ষা-সভাকে (G.C.P.I.) জানান, সরকারের নীতিই হচ্ছে ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষাকে চালু করা, এজন্য ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারের সবরকম প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে হবে—

"It is the wish and admitted policy of the British Govt. to render its own language gradually and eventually the language of puplic business throughout the country, and that it will omit no opportunity of giving every reasonable and practical degree of encouragement to the execution of this project". (*As quoted in Trevelyan.*)

কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতিকে সমর্থন জানিয়ে লেখেন—

"With a view to give the natives additional motive to the acquisition of English language, you have it in contemplation gradually to introduce English as the language of public business in all its departments." (*A. N. Basu—Indian Ed. in Parliamentary Papers*)

'শিক্ষা-সভা'য় প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষানুরাগীদের প্রাধান্য থাকায় প্রথম অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারের দিকে সভার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং সভায় দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। ১৮৩১ খ্রীঃ সভার দশজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক। এঁদের নেতা ছিলেন প্রিন্সেপ্, বাকী পাঁচজন ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী-শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না, নব্য সিভিলিয়ানগণ এই দলভুক্ত ছিলেন। সভায় দুই দলের সভ্যসংখ্যা সমান সমান হওয়ায় সভার কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দুই দলের বিবাদের ফলে দেশের সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রায় এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার বাহন নিয়ে যখন দুই দলের বিতর্ক জটিল অবস্থা ধারণ করেছে, সেই সময় (১৮৩৪ খ্রীঃ) পার্লামেণ্টের সদস্য টমাস বেবিংটন মেকলে (পরবর্তী কালে লর্ড মেকলে) বড়লাট পরিষদের আইনসচিবরূপে ভারতে আসেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ নতুন সনদ আইন পাস হবার সময় তিনি পার্লামেণ্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দেবার সময় ভারতবাসীদের নব্য শিক্ষা দান ক'রে গণতান্ত্রিক নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মেকলে এদেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বেণ্টিঙ্ক তাঁকে 'শিক্ষা-সভা'র সভাপতি নিযুক্ত করেন। মেকলের ঐতিহাসিক 'মিনিট' প্রকাশিত হবার পর সরকারী শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দ্বন্দ্বের অবসানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

॥ বম্বে ॥

১৮১৮ খ্রীঃ বম্বে প্রদেশ গঠিত হবার পর পুণার রেসিডেণ্ট মিঃ এলিফিনস্টোন নতুন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। এর পূর্বে বম্বে অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তার মিশনারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এলিফিনস্টোন পেশোয়ার 'দক্ষিণা তহবিলে'র অর্থে পুণায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পেশোয়ার রাজকোষ থেকে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা ও প্রণামী প্রভৃতির জন্য একটা নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ছিল। এই অর্থ যাতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্যাচর্চার জন্য ব্যয় হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পুণার সংস্কৃত কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাচর্চা ছাড়াও এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। পেশোয়ার অর্থে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার আয়োজন করলে দেশের সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সমর্থন সরকার লাভ করবে, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৩ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত সরকারের তরফে এই একটিমাত্র কাজ ছাড়া শিক্ষা-বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য আর কিছুই করা হয়নি। এই বছরই 'Bombay Native Education Society' শিক্ষাপ্রসার কাজে সরকারী সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। এই উপলক্ষে এলিফিনস্টোন শিক্ষা-বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রস্তাব করেন :—

দেশীয় শিক্ষা-প্রসারের জন্য দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এইসব স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্কুলের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে এবং দেশের নিম্নশ্রেণী যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে, সেজন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য দেশীয় ভাষায় নীতি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বই-এর প্রকাশ করতে হবে।

ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এলিফিনস্টোনের উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্য মিঃ ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনুরাগী। দেশীয় শিক্ষাকে তিনি অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করতেন। বাংলা দেশের মত বম্বে প্রদেশেও গভর্ণর পরিষদের সদস্যদের মধ্যে এ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই বিরোধের ফলে এই প্রদেশের সরকারী শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টার কাজ ব্যাহত হয়। নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও এলিফিনস্টোনের প্রচেষ্টায় ১২টি দেশীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলায় এডাম ও বম্বে প্রদেশে এলিফিনস্টোন একটি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব ক'রে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সিভিলিয়ানদের বিরোধিতার কোথাও দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। সরকারী প্রচেষ্টায় এই বিরাট দেশের সর্বত্র শিক্ষাপ্রসার সম্ভব নয়, একথা বিবেচনা ক'রে এলিফিনস্টোন বেসরকারী শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্য করবার সুপারিশ করেছিলেন। স্থায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে কাজে লাগাতে হবে, একথা বুঝতে পেরেই তিনি এই সুপারিশ করেছিলেন।

॥ **মাদ্রাজ** ॥

মাদ্রাজের গভর্ণর মনরোর নেতৃত্বে এই প্রদেশের সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। তিনি প্রদেশের কুড়িটি জেলায় ইংরেজী শিক্ষার জন্য ২টি ক'রে (একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমানের জন্য) স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেন। ধীরে ধীরে এই প্রদেশের ৩০০ তফশীলের হিন্দুদের জন্য একটি ক'রে দেশীয় স্কুল খোলার সিদ্ধান্তও করা হয়। মনরো তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স-এর কাছে বার্ষিক ৪৮,০০০ টাকা প্রার্থনা করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ বোর্ড এই প্রার্থিত অর্থ মঞ্জুর করেন, কিন্তু মনরোর অকাল মৃত্যুতে এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

১৮২৬ খ্রীঃ মাদ্রাজে Committee of Public Instruction গঠিত হয়। সমিতি শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাজ শহরে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করে। পরবর্তী কালে এই স্কুলই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩০ খ্রী ৯টি জেলা স্কুল

ও ৬১টি তফশীল স্কুল খোলা হয়। সরকারী পরিচালনায় শিক্ষার কাজ সামান্য যেটুকু অগ্রসর হয়েছিল, বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স-এর এক ডেসপ্যাচে তা বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ডেসপ্যাচে বলা হয়, মাদ্রাজে প্রাথমিক শিক্ষার কাজ যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টায় উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা আশানুরূপ হয়নি। এখন থেকে সরকারকে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হতে হবে, সরকারী অর্থও সেজন্য খরচ করা হবে। বাংলা দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আন্দোলন ও downward filtration theory বোর্ডের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ মাদ্রাজের Committee of Public Instruction ভেঙ্গে দিয়ে Committee of Native Education গঠিত হল এবং মাদ্রাজে সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব এই কমিটির হাতে দেওয়া হল।

।। রামমোহনের শিক্ষা-চিন্তা ।।

মুসলিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন—এই সময়টিকে বলা যায় আমাদের সার্বিক অবক্ষয়ের যুগ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় যে দিকেই দৃষ্টি দিইনা কেন, আমাদের সামনে ভেসে উঠবে একটি হতাশার চিত্র। উনবিংশ শতকের শুরুতে ভারতের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে সামাজিক রূপান্তর ও উদার ধর্মমতের প্রবর্তন আমাদের সমাজ-জীবনে ও ধর্মক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয়, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব। রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যেই পাই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস. উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে নবজাগরণের তিনি অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা ও রূপকার। কৈশোর পার হয়েই তিনি প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যার জন্য পিতার সঙ্গে মতান্তরের ফলে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। প্রায় চার বছর সারা ভারত তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অপরিসীম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

হুগলি জেলায় রাধানগর গ্রামে এক বিত্তবান অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৭৭২ খ্রীঃ রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ ক'রেই রামমোহন মৌলবীর নিকট ফার্সী ভাষা শেখেন। এরপর তিনি পাটনায় যান আরবী ভাষা শিখতে। শিক্ষা শেষ হতে কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত শেখেন। পাটনা ও কাশী থাকা কালীন তিনি কোরান পাঠ করেন ও সুফীদের দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ও গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। গৃহত্যাগ ক'রে পরিভ্রমণকালে তিনি তিব্বত গিয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি জৈন ধর্মশাস্ত্রও পাঠ করেন। তিনি ইংরেজী শেখেন এবং মূল বাইবেল পড়ার জন্য গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শেখেন। এই ভাবে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। সব ধর্মের অনুশীলন ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, সব ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ধর্মের

পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি উপনিষদের উপর ভিত্তি ক'রে একেশ্বর-মতবাদ প্রচারে ব্রতী হন। যাগ-যজ্ঞ ও পৌত্তলিকতা ত্যাগের ফলে তিনি হিন্দু-সমাজের বিরাট বিরোধিতার সম্মুখীন হন। নিজের ধর্মমত প্রচার ও আলোচনার জন্য ১৮১৫ খ্রীঃ তিনি "আত্মীয় সভা"র প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'আত্মীয় সভা'ই ১৮২৮ খ্রীঃ 'ব্রাহ্ম-সভায়' রূপান্তরিত হয়। নিজের ধর্মমতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন ও হিন্দু-সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। ১৮১৫ খ্রীঃ থেকে ১৮১৯ খ্রীঃ মধ্যে তিনি বেদান্ত সূত্র ও উপনিষদ সমূহের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ তিনি বেদান্ত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া হত। এখানে ইংরাজীও পড়ানো হত। ১৮২০ খ্রীঃ রামমোহন খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে এক ধর্মীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর লেখা একটি বইতে খ্রীস্টান ধর্মের উদার ব্যাখ্যা ও একেশ্বরবাদ প্রচার করলে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ রামমোহনের প্রতি রুষ্ট হন এবং "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত "সমাচারদর্পণ" পত্রিকায় রামমোহন এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

রামমোহন ছিলেন সমাজসংস্কার-আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তিনি জাতিভেদ-প্রথার কুফলের নিন্দা করেন। রামমোহন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লেখা মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ "বজ্রসূচীর" অনুবাদ প্রকাশ করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা নিবারণ করতে উদ্যোগী হলে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। তখন রামমোহন দৃঢ়ভাবে বেন্টিঙ্কের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। রামমোহনের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে সতীদাহের মত অমানুষিক প্রথা বেন্টিঙ্ক বন্ধ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। যে-যুগে নারী-স্বাধীনতা বা নারী-মুক্তি আন্দোলনের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না, সে-সময় নারীদের প্রতি অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রামমোহন সোচ্চার হয়ে ওঠেন। রামমোহন হিন্দু-সমাজের বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু বিধবারা যাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন, তিনি সেজন্য চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি শাসন-ব্যবস্থায় কতকগুলি সংস্কারের দাবী করেন। তিনি চেয়েছিলেন, আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন হোক, জুরির সাহায্যে বিচার হোক, শাসন-বিভাগ থেকে বিচার-বিভাগ পৃথক্ হোক এবং ফৌজদারী আইনসমূহ বিধিবদ্ধ হোক।

ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে রামমোহন অবিশ্রাম কাজ ক'রে গেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া নুনের ব্যবসার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ১৮৩২ খ্রীঃ পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার সময় তিনি বলেছিলেন, "কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। জমিদারের অর্থলিপ্সা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার তারা"। ভারতের অর্থনীতিতে

যে বৃটিশ শাসক-পরম্পরায় শোষণ চলছে, প্রথম রামমোহনই তার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন একজন পথিকৃৎ। রামমোহনের নেতৃত্বে যে-সব সংস্কার প্রবর্তিত হল—সমাজে, শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে ও ধর্মক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ ক'রে দেশে যে সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গীর জোয়ার এল, সেই মনোভাবের বাহক হিসাবে একটি উদার মনোভাবসম্পন্ন সংবাদপত্রের প্রয়োজন ছিল। বাংলা সপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকরূপে তিনি সে অভাব পূর্ণ করেন। রামমোহন ফারসী ভাষায় মিরাট-উল-আখবর নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের আক্রমণের হাত থেকে হিন্দু একেশ্বরবাদ ও বেদান্তকে বাঁচাবার জন্য রামমোহন দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি', ইংরেজীতে Brahminical Magazine.

রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার নানাদিক্ সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হলেও আমরা এখানে প্রধানতঃ শিক্ষানুরাগী রামমোহনের বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে প্রাচীন সভ্যতার বুকে প্রাণবেগের সঞ্চারের জন্য যারা সচেষ্ট হয়েছিলেন, রামমোহন তার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রচেষ্টার বিশেষ তাৎপর্য এই যে, তিনি ছিলেন সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভারতের প্রাচীন ধর্মদর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। প্রাচীন ভারতের সবকিছুকে যারা অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তিনি তাদের দলে ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, এই প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে, এর বুকে গতির সৃষ্টি করতে হলে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারার সঙ্গে তার যোগসাধন করতে হবে। তাই তিনি একদিকে যেমন বেদান্ত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, আবার অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহন বুঝেছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে শত শত বছরের ঘুম থেকে এ জাতকে জাগাতে পারা যাবে না, সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে, প্রয়োজন যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার। যার ফলে ভারতবর্ষ বিশ্বসভায় তার যোগ্য স্থান নিতে পারবে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যখন প্রচলিত ধারার অনুসরণে হিন্দু পণ্ডিতদের পরিচালনায় সংস্কৃত কলেজ খুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন রামমোহন ১৮২৩ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে এক পত্র লিখে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি চেয়েছিলেন গণিত, রাসায়ণ, পদার্থবিদ্যা ও সামান্য প্রাকৃতিক বিদ্যা পড়ানো হোক। তিনি লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন, "যে জাতীয় শিক্ষা ভারতবর্ষে চলছে, তাই দেবার জন্যই সরকার একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় খুলছেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান (লর্ড বেকনের আগে যে জাতীয় স্কুল ইউরোপে ছিল) তরুণ যুবকদের মন ব্যাকরণের সূক্ষ্ম তত্ত্বে আর দার্শনিক শ্রেণীভেদে বোঝাই ক'রে দেবে—সমাজে তা কোন কাজেই আসবে না। দু' হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে যা শেখানো হত, ছেলেরা তাই শিখবে, উপরন্তু দার্শনিকদের অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য সূক্ষ্মতা-চর্চা চলবে—সারা ভারতে এখনতো তা চলছে। ইংরেজ জাতকে যদি চিরকালের মতো অজ্ঞ ক'রে রাখার মতলব থাকত, তাহলে কি

অজ্ঞতা-প্রসারী স্কুলমেনদের শিক্ষাকে সরিয়ে বেকনের দর্শনকে জায়গা দেওয়া হত। বৃটিশ শাসনের যদি দেশব্যাপী অজ্ঞতা-বিস্তারই নীতি হয়, তাহলে সংস্কৃত পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থাই সে-কাজের সবচেয়ে উপযোগী। জনসাধারণের উন্নতি যখন সরকারের উদ্দেশ্য, তখন আরও উন্নত ও প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচার করা দরকার, যাতে গণিত, প্রাকৃত বিদ্যা, দর্শন, রসায়ন, দেহতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পঠন-পাঠন চলতে পারবে। যে টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব হয়েছে, তা দিয়ে ইউরোপের শিক্ষিত কয়েকজন গুণী ও ক্ষমতাবান ভদ্রলোককে নিয়োগ ক'রে প্রয়োজনীয় বই ও যন্ত্রপাতি সহযোগে একটি কলেজ গড়ে তোলা যেতে পারে। (রাজা রামমোহন রায়—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রামমোহন একান্তভাবে চেয়েছিলেন ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারলাভ করুক। বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারলাভ করলে কুসংস্কার দূর হবে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষও ইউরোপের মত প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। যখন হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়, রামমোহন সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি যুক্ত থাকলে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন হবে। গোঁড়া হিন্দুরা এর বিরোধিতা করবে বুঝতে পেরে তিনি স্বেচ্ছায় সেখান থেকে সরে আসেন। ভারতে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রবর্তনের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অ্যাংলো হিন্দু স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য শিক্ষাদান করা হত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

রামমোহনের কর্মময় জীবনের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, জ্ঞানান্বেষণের স্বাধীনতা, বিজ্ঞানের জন্য আগ্রহ, বিস্তৃত মানবিক সমবেদনার মনোভঙ্গী, তার বিশুদ্ধ ও বিশিষ্ট নীতিবোধ, অতীতের জন্য বিচারশীল শ্রদ্ধা প্রভৃতির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের উপর রামমোহনের প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কোন দেশ যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে আপন মহত্ত্বকে অস্বীকার করে, তখন একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটলে তাকে বুঝতে বা স্বীকৃতি দিতে সময় লাগে। তাঁর কণ্ঠ বেদনাদায়কভাবে বেসুরো শোনায়, কেননা দেশবাসীর বীণার তার ঢিলে হয়ে পড়েছে। প্রকৃতির চরমতম বিকাশের দিনে যে সত্যের সুর উদগীত হয়েছিল, সে সুর আর এ বীণায় বাজেনা।

"এমনি একজন লোক রামমোহন রায় যাঁকে দেশ রূঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে —যে দেশ আপন বিরাট উত্তরাধিকারের দায়িত্বকে অস্বীকার ক'রে মূঢ় আসক্তির সঙ্গে নিজের অধঃপতনের ধারাকে আঁকড়ে ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল মর্মান্তিক, তাই ক্রুদ্ধ বিরক্তির মধ্যেও তাঁর আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘ খরার দৈন্যের পরে যে ঋতু-পরিবর্তন আসতে বাধ্য, প্রবল বর্ষণের দ্বারা যা নিষ্ফলা শুষ্কতার বুকে প্রাণের প্রাচুর্য এনে দেয়, তাই রূপ পেয়েছে রামমোহনের মধ্যে। এই দৃশ্য-পরিবর্তন এক প্রচণ্ড বিস্ময়, এর মর্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে সেই ভবিষ্যতের অপেক্ষা করতে হবে, যখন ফসল ফলানো শেষ হয়েছে এবং সেই ফসল কেটে ঘরে তুলতে মন আর অপেক্ষা করছে না। তাঁর দেশবাসীর নিকট রামমোহন এসেছিলেন এক বাঞ্ছিত দুর্ঘটনার মতোই, পারিপার্শ্বিক

অবস্থার সঙ্গে তাঁর বিরাটত্ব একেবারেই খাপ খায়নি, তবুও তিনিই ছিলেন সেই মানুষ, যাঁর জন্য দীর্ঘ রাত্রি ধরে দেশের ইতিহাস অপেক্ষা করেছে, যে মানুষের নিজের জীবনে আত্মার সম্পূর্ণ মর্ম এবং স্বদেশের বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে। সে জীবন নিঃসঙ্গতার জীবন, তবুও তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী সেই মহান পথস্রষ্টারা প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে যাঁরা সত্যানুসন্ধান করেছেন।

"এ এক অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার তমসাচ্ছন্ন যুগে যখন দেশবাসী তাঁকে চিনতে পারেনি, সেই যুগে রামমোহন এমন এক উন্নত মানের অর্ঘ তাঁর দেশবাসীর জন্য বহন ক'রে আনলেন, যার উদার সহানুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার মিলন ঘটেছিল। বিভিন্ন সংস্কৃতির যে সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার এক-একটি বিরাট তরঙ্গের উদ্ভব হয়েছে, সেই সমন্বয়ের জন্য এই মন সদাই উন্মুক্ত ছিল। বিচিত্র দাবী ও কর্মবহুল বর্তমান যুগের চিত্র তাঁর মনশ্চক্ষে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়েছিল, এবং আপন মানস সম্বন্ধে অবচেতন যুগের কাছে তিনিই সেই চিত্র তুলে ধরেছিলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ, মেকলের মন্তব্য | বেণ্টিঙ্কের সিদ্ধান্ত, সমালোচনা

১৮৩১ খ্রীঃ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। 'শিক্ষা সভা'য় (General Committee of Public Instruction) শুরুতে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থক। 'শিক্ষা-সভা'র অর্থানুকূল্যে দেশের আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসকে কমিটির নতুন সিভিলিয়ান সদস্যগণ মোটেই সুনজরে দেখেন নি। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠন করতে থাকেন। শিক্ষা-সভার মধ্যেও ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষাবাদীদল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। কমিটির হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল, তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কিছু করা সম্ভব বলে বিবেচিত হয় নি। দু'দলই উচ্চ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিল। চুঁইয়ে-নামা নীতি সম্পর্কেও কোন মতভেদ ছিল না। প্রাচ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে নীতিগত বিরোধ সামান্য যেটুকু ছিল, তাও রইল না। এখন সামান্য হ'ল শিক্ষার বাহন নিয়ে—প্রাচ্যবাদীদল সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রাখতে চাইল। পাশ্চাত্য-বাদীদল এই "অকেজো ও অপ্রয়োজনীয়" ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের দাবী করল। ১৮৩১ খ্রীঃ কমিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী দলের সদস্যসংখ্যা সমান সমান হয়। ফলে, বিরোধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে, এবং কাজকর্মে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সভাপতির কাস্টিং ভোটে কাজ কোনক্রমে চালু রাখা হয়। কিন্তু, কোনপক্ষের একজন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে আগের সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, পরের সভায় তা বাতিল হয়ে যেত। এই অস্বাভাবিক অবস্থার কোন রকমেই যখন পরিবর্তন হ'ল না, তখন 'শিক্ষা-সভা' বাধ্য হয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হ'ল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজনীতির ক্ষেত্রে ও এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উদারনৈতিকদলের প্রভাবে পার্লামেণ্ট সংস্কার আইন পাস হয় ও বহু জনহিতকর সংস্কার সাধিত হয়। এই উদারনৈতিক পটভূমিকায় ১৮৩৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইন পাস হয়। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ দশ হাজার পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষ পাউণ্ড করা হয়।

নতুন সনদ আইনের একটি ধারায় বলা হয় যে, জাতি বা ধর্মের কারণে কোন ভারত-বাসী সরকারী যে-কোন পদের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। আর একটি ধারায়

ইউরোপ ও আমেরিকার যে-কোন দেশের মিশনারীদের ভারতে এসে কাজ করবার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই সনদে বড়লাটের পরিষদে একজন আইন-সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৩৪ খ্রীঃ লর্ড মেকলে বড়লাটের পরিষদে আইন-সদস্যরূপে যোগ দেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁকে 'শিক্ষা-সভা'র (G.C P.I.) সভাপতি-পদে নিযুক্ত করেন। 'শিক্ষা-সভা'র সভাপতিরূপে মেকলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। ১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের 'শিক্ষা-ধারা'র ব্যাখ্যা নিয়ে দুইদলই সরকারী মধ্যস্থতা প্রার্থনা জানায়। বিষয়টি বড়লাটের নিকট পাঠানো হয়, বড়লাট আইন-সদস্যরূপে মেকলের অভিমত চেয়ে পাঠান। প্রাচ্যবাদীরা বলেছিলেন, 'শিক্ষা-ধারা'র নির্দেশ মত আইনগতভাবে সরকারী অর্থ শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের জন্যই ব্যয় করা যেতে পারে মেকলে এই 'শিক্ষা-ধারা'র ব্যাখ্যা উপলক্ষ ক'রে ১৮৩৫ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর বিখ্যাত মিনিট বা মন্তব্য পেশ করেন।

।। মেকলের মন্তব্য ।।

১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের শিক্ষা-সম্পর্কিত বিখ্যাত ৪৩ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মেকলে তাঁর মন্তব্যে লিখলেন, 'সাহিত্য' কথাটিতে শুধুমাত্র সংস্কৃত বা আরবী সাহিত্যকে বোঝানো হয়নি, ইংরেজী সাহিত্যকেও বোঝায়। 'শিক্ষিত ভারতীয়' বলতে সংস্কৃত পণ্ডিত ও আরবী-ফার্সীতে পারদর্শী মৌলবীদের বোঝায় না, যাঁরা লকের দর্শন ও মিল্টনের কবিতায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন, তাঁদের বোঝায়। বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কাজে বড়লাট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভাল মনে করেন, তার জন্যই অর্থব্যয় করতে পারেন।

প্রাচ্যবাদীরা বলেছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে কারণ, এই প্রতিষ্ঠাগুলি ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতীক এবং জনসাধারণও এইগুলি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মেকলে বললেন, এগুলি কোন উপকারেই আসছে না তাই এগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া দরকার। জনমতের দাবীকে অযৌক্তিক হলেও মানতে হবে, এমন কোন কথা নেই। জনমতের দাবীকে এভাবে মেনে নিলে কোনদিন কোন সংস্কারই সম্ভব হবে না। একটি স্থানকে স্বাস্থ্যকর মনে ক'রে যদি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা হয়, এবং পরে যদি দেখা যায় স্থানটি স্বাস্থ্যকর নয়, তবু জনমতকে মেনে নিয়ে সেখানে স্বাস্থ্যনিবাস রাখতে হবে, এ দাবীর কোন অর্থ হয় না।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন দলের মতামত বিচার ক'রে তাঁর অভিমত উপস্থাপন করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি মত ছিল—দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষা ও ইংরেজী ভাষা। দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা সম্পর্কে তিনি বললেন—দেশীয় ভাষাসমূহ অত্যন্ত দীন ও ঐশ্বর্যহীন। এ ভাষার শব্দসম্পদ ভাব-প্রকাশের এত অনুপযুক্ত যে, পাশ্চাত্ত্য ভাষার জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ দেশীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। যে ভাষার এত দৈন্য, সে ভাষা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার

বাহন হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরম বিস্ময়কর বিষয় এই যে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য কোন দলই মাতৃভাষাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। এর পর রইল সংস্কৃত ও আরবী এবং ইংরেজী ভাষা। মেকলে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তবু প্রাচ্যবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে বলেন, প্রাচীন প্রাচ্য ভাষা সমূহ ইউরোপীয় ভাষা সমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও প্রমাদপূর্ণ। তিনি দম্ভভরে বলেন, সমস্ত ভারত ও আরবের যে সাহিত্য-সম্পদ আছে, ইউরোপের যে-কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের একটি মাত্র তাকে যে সম্পদ রয়েছে, সেই সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে তাকে তুলনা করা যায় —("A single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India & Arabia.") ইংরেজীর মত সম্পদশালী ভাষায় শিক্ষা দেবার সুযোগ যেখানে রয়েছে, সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ভাষায় যেভাষায় ইংরেজী ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজির সমকক্ষ একখানি গ্রন্থও নেই, সে ভাষায় শিক্ষা দেবার কোন অর্থ হয় না। পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি পড়ানোর সুযোগ থাকতে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যার বিধিবিধান নিকৃষ্টতায় একটা সাধারণ ইংরেজ গোবৈদ্যের জ্ঞানের তুল্য নয়, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা যার কথা শুনলে ইংলণ্ডের একটি সাধারণ স্কুলের মেয়েও হেসে উঠবে, ভারতীয় ইতিহাস যাতে আছে ত্রিশফুট দীর্ঘ রাজার কাহিনী, আর ত্রিশ হাজার বছরব্যাপী রাজত্বকালের নানা বিবরণ, যে দেশের ভূগোলে আছে ক্ষীর-সাগর আর মধু-সমুদ্রের কথা সেই ভারতীয় বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য অর্থব্যয় করা মানে সরকারী অর্থের অপচয় করা।

মেকলে ইংরেজী ভাষার সমর্থনে লিখলেন—ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অমূল্য অফুরন্ত খনি। ইংরেজী ভাষা ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। এক সময় যেমন গ্রীক ও লাটিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে নব জাগরণের সূচনা হয়েছিল, যেমন পশ্চিম ইউরোপ রাশিয়াকে সভ্য করেছিল, তেমনি ইংরেজী ভাষা ভারতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করবে। দেশীয় লোকেরা ইংরেজী শিখতেই চায়। 'শিক্ষা-সভা' সরকারী অর্থে সংস্কৃত ও আরবী যে বই ছেপেছিল, তা গুদামে পচছে, আর স্কুল বুক সোসাইটি হাজার হাজার বই বিক্রি ক'রে মুনাফা করছে। ইংরেজী স্কুলগুলিতে লোকে টাকা খরচ ক'রে শিক্ষা গ্রহণ করছে, আর বৃত্তি দিয়েও আরবী ও সংস্কৃত শেখার জন্য ছাত্র যোগাড় করা কঠিন। বৃত্তিকে তিনি প্রকারান্তরে ঘুষ (Bounty money) আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বললেন, ভারতে ইংরেজী শাসক শ্রেণীর ভাষা, কিছু দিনের মধ্যেই এ ভাষা প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহের বাণিজ্যের ভাষারূপে গৃহীত হবে। ভারতীয়দের সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ক'রে তোলা সম্ভব এবং সরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার সেই লক্ষ্যই থাকবে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্ট হবে, যার বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ—"a class of persons Indian in blood and colour, but

English in taste, in opinions, in morals and in intellect." এদের মধ্যে থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে নেমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

॥ প্রিন্সেপের মতামত ॥

মেকলের মন্তব্য প্রাচ্যবাদী দলের নেতা প্রিন্সেপের নিকট তাঁর অভিমতের জন্য পাঠানো হলে তিনি দৃঢ়রূপে বলেন 'শিক্ষাধারা'য় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বলা হয়েছে এবং শিক্ষিত বলতে শুধু মাত্র প্রাচ্য বিদ্যার পণ্ডিতদের বোঝায়। প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ ক'রে দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। দেশের জনমতের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখানো সরকারের কর্তব্য এবং প্রাচ্যবিদ্যাকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলার পিছনে কোন যুক্তি নেই। এ ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে একটা সামান্য অংশ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী, মুসলিম সম্প্রদায় এর বিরোধিতাই করছে।

॥ বেন্টিঙ্কের সিদ্ধান্ত ॥

লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রথম থেকেই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। মেকলের সুপারিশগুলিকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে ১৮৩৫ খ্রীঃ ৭ই মার্চ কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবই ভারত সরকারের নতুন শিক্ষা-নীতিরূপে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সব রকম ব্যবস্থা করাই সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হবে, এবং শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতীয়দের শান্ত করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এতে বলা হয়, যতদিন এদেশের লোক প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি অনুরক্ত থাকবে, ততদিন প্রাচ্য বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে না। তবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের জন্য আর নতুন কোন অর্থ-সাহায্য দেওয়া হবে না।

তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, 'শিক্ষা-সভা' (G. C. P. I.) প্রাচ্যভাষায় বই ছাপতে যে বিপুল ব্যয় ভার বহন করেছে, তা বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে।

চতুর্থ প্রস্তাবে আছে, এই সংস্কারের ফলে 'শিক্ষা-সভা'র হাতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে, সেই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্যই বিনিয়োগ করা হবে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দলের দ্বন্দ্বের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচল অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল এই প্রস্তাবসমূহ গ্রহণের ফলে সেই অচল অবস্থা বিদূরিত হয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হল। ইংরাজী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই যে সরকারী শিক্ষা-নীতির লক্ষ্য এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সে কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই প্রথম ঘোষণা করা হল।

॥ মেকলের সমালোচনা ॥

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্য মেকলে সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত

হয়েছেন। উচ্ছ্বাসবশে অনেকে তাঁকে নতুন যুগের আলোক-বর্তিকাবাহী বলে অভিনন্দিত করেছেন ; আবার অনেক ভারতীয় ভাষা-সমূহের উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে তাঁকে নিন্দা করেছেন। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সম্পর্কে মেকলে বহু অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য তিনি ভারতীয়দের নিকট চিরদিনই নিন্দনীয় থাকবেন। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের অসন্তোষ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ইংরাজী শিক্ষাকে দায়ী ক'রে অনেকে অন্যায়ভাবে মেকলের নিন্দা করেছেন।

একটু ধীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখলে দেখা যাবে, অতি নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। নতুন যুগের উন্নতির আলোক-বর্তিকাবাহী (Torch bearer in the path of progress) বলে তাঁকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তিই করা হবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানীতি গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর একার নয়—তাই নিন্দা বা প্রশংসাও তাঁর একার প্রাপ্য নয়। মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই এদেশের জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহন রায় বহু পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দাবি জানিয়েছিলেন। অর্থ ও মান এই দুইয়ের জন্যই যে ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতা রয়েছে, একথা দেশের লোক বুঝতে পেরেছিল। 'শিক্ষা-সভা'য় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবার পূর্বেই সৃষ্ট হয়েছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন—বোর্ডের কাছে চিঠিতে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন : বোর্ডও তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল। এসব বিবেচনা ক'রে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মেকলেকে কি ক'রে দায়ী করা যায় ? তারপর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছিল বড়লাটের উপর। বড়লাট পরিষদের আইন-সদস্যরূপে তিনি আইনগত পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র। লর্ড বেন্টিঙ্ক যদি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করতেন, তাহলে তাঁর মতামত সরকারী নীতিরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হবার প্রশ্ন উঠত না। মেকলে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেন্টিঙ্কের কাজের সহায়তা করেছিলেন মাত্র। কালের অনিবার্য গতিতে দেশ যে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের অনুকূলেই যাচ্ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কালচক্রের আবর্তনে যা কিছুদিন পরে সংঘটিত হতে পারত, মেকলের মন্তব্যে তা শুধুমাত্র ত্বরান্বিত হয়েছিল।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজীকে গ্রহণ ক'রে তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতির পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন বলে তাঁকে দায়ী করা হয়। একথা সত্য, তিনি দেশীয় ভাষাগুলিকে 'Poor and rude' বলেছিলেন। কিন্তু, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোন দলই দেশীয় ভাষাগুলি যে শিক্ষার বাহন হতে পারে, একথা মনে করেনি। এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও দেশীয় ভাষাগুলিকে সুনজরে দেখতেন না। আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে, শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সেকথা ভাবতেই পারতেন না। বরং মেকলে আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত পোষণ করতেন বলেই বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। 'শিক্ষা-সভা'র সভাপতিরূপে তিনি মন্তব্য

করেন, দেশীয় ভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহ-দানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে সচেতন আছি। দেশীয় ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য এবং এজন্যই আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করতে হবে—"We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of vernacular languages We conceive the formation of vernacular literature to be ultimate object to which all our efforts must be directed."

ইংরেজীকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করায় মাতৃভাষাসমূহ অবহেলিত হয়েছিল, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। ১৯০৪ খ্রীঃ লর্ড কার্জন বলেন, মেকলের শীতল নিশ্বাস ভারতীয় ভাষা ও পাঠ্য পুস্তকের ওপর প্রবাহিত হবার পর থেকে নিজ নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দিন দিন ক্ষীয়মান হয়ে যাচ্ছিল—"Ever since the cold breath of Macaulay's rhetoric passed over the field of Indian language and Indian text books, the elementary education in their own tongue has shrivelled and pined"

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, মাতৃভাষাকে নিজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার কথা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই দেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের কথা বলেছিলেন। যে সময়ে ভারতীয়রাই দেশীয় ভাষার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, যদি সেই সময়ে মেকলে দেশীয় ভাষা সম্পর্কে 'poor and rude' এই মন্তব্য ক'রে থাকেন, তাহলে তাঁকে দেশীয় ভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথকে তিনি রুদ্ধ করেছেন বলে নিন্দা করা যায় না।

মেকলের সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ হচ্ছে, ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত অশ্রদ্ধেয় উক্তি। যে ভাষা বা সাহিত্যকে তিনি জানেন না, যে ধর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই, সে সম্পর্কে ব্যঙ্গ বা দম্ভোক্তি কোনটাই দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর পক্ষে শোভন বা সঙ্গত নয়। অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তাঁকে ক্ষমা করা যায় না। তিনি প্রাচ্য বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সত্য জেনে নিতে পারতেন। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু জানবার চেষ্টা না ক'রেই তিনি অর্ধ-সত্য বিবরণ দিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করতে চেয়েছেন, এটাই হয়েছে তাঁর ধৃষ্টতা।

দেশের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও আন্দোলনের জন্য অনেকে তাঁকে দায়ী করেন—এ অত্যন্ত অযৌক্তিক। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার না হলে কি দেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হত না? এশিয়ার নবজাগরণ কি শুধু ইংরেজী শিক্ষার ফলেই হয়েছে। আর যদি ভারতের জাতীয় চেতনা ইংরেজী শিক্ষার দানেই হয়ে থাকে, সেজন্য ইংরেজ জাতির গৌরব বোধ করা উচিত।

মেকলে বোধ হয় ভেবেছিলেন, ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়রা তাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ ক'রে ভারতের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতের বুক থেকে মুছে ফেলবে। মেকলের এই

মনোভাব তাঁর পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশে একজনও মূর্তিপূজক থাকবে না, ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে বাঙ্গালীরা স্বাভাবিকভাবেই খ্রীস্টধর্মভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, ধর্ম-প্রচারের আর আবশ্যকই হবে না—"It is my firm belief that if our plans of education are followed up there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years since. And this will be effected without any efforts to proselytize".

মেকলের 'মন্তব্যে'র ফল ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভারতীয় সভ্যতার অসাধারণ সমন্বয়ী শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বলেই এরূপ অসম্ভব আশা পোষণ করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে আমরা উপকৃত হয়েছি, সন্দেহ নেই। কিন্তু মেকলে যদি ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হতেন, তাহলে প্রাচী ও প্রতীচির সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে কি ক'রে জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলা যায়, সে দিকে চিন্তা ক'রে তাঁর নীতি নির্ধারণ করতেন, তাহলে এদেশের অশেষ কল্যাণ হত। এডাম যে সহানুভূতি ও উদার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর শিক্ষা-সৌধ গড়ে তোলবার কথা চিন্তা করেছিলেন। এদেশ ও এদেশবাসী সম্পর্কে মেকলের সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব ছিল না। তিনি গণশিক্ষার কথা চিন্তা করেন নি। তাই অগণিত জনসাধারণকে অশিক্ষিত রেখে দেশের একটা সামান্য অংশের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি দেশের ক্ষতিও ক'রে গেছেন। শতাধিক বছর অতীত হয়েছে মেকলে তাঁর বহু-বিতর্কিত 'মন্তব্য' লিখেছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে দেশে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবু আজও অগণিত ভারতসন্তান শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা এখনও মুষ্টিমেয়ের সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে আছে। মেকলের সততায় সন্দেহ না ক'রেও নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, ইংরেজী শিক্ষার বিষামৃত সমভাবে আমাদের দেশের কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই-ই করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব

(১৮৩৫ খ্রীঃ—১৮৫৪ খ্রীঃ)

লর্ড অকল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি,
মিশনারী প্রচেষ্টা।
বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার প্রসারে সরকারী ও জাতীয় প্রচেষ্টা।
বাঙলা,
বোম্বাই,
মাদ্রাজ,
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—টম্সনের পরিকল্পনা,
পাঞ্জাব, স্ত্রী-শিক্ষা,
ফলশ্রুতি।

লর্ড বেণ্টিকের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হওয়ায় ভারতের শিক্ষানীতি একটা সুনির্দিষ্ট রূপে পেল। কিন্তু এর পরেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধের জের আরও কিছুদি চলেছিল। লর্ড অকল্যাণ্ড বড়লাট থাকাকালীন উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সকলে পক্ষে গ্রহণযোগ্য কতকগুলি প্রস্তাব করেন, যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চা বিরোধের অবসান হয়।

ইংরেজী শিক্ষার জন্য জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখে প্রাচ্যবাদী দ বুঝেছিলেন, দেশে ইংরেজীর গতিরোধ করা যাবে না, তাই তাঁরা পাশ্চাত্ত্য বিদ্ প্রসারের বিরুদ্ধে আর কোন বিরোধিতা করেন নি। তাঁরা বললেন, প্রাচ্যবিদ্যার যে স প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলি বাঁচিয়ে রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ কর উচিত।

সমসাময়িক কালে দেশের শাসন-ব্যবস্থার এমন কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে যার ফ সাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। ১৮৩০ খ্রীঃ ফার্সীর বদ ইংরেজী ভাষা সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গৃহীত হয়। সরকারী চাকরির লো হিন্দুরা দলে দলে ইংরেজী স্কুলে ভীড় করতে শুরু করে।

১৮৪৪ খ্রীঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, সরকারী কর্মচারী নিয়োগক্ষেত্রে ইংরে শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্র জনসাধারণ অধিকতর আকৃষ্ট হয়। জনসাধারণের ইংরেজী প্রীতির পিছনে এই স্বা বুদ্ধিই অধিকতর কার্যকরী হয়েছিল।

১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারত ত্যাগ করেন, লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড অকল্যাণ্ড আসবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচ্যবাদীদল বড়লাটের নিকট তাঁদের দাবী পে করেন। কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাও তাদের বৃত্তি-বন্ধের বিরু প্রতিবাদ জানায়। দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী দলও চুপ ক'রে বসে রইলে

না। এডাম, উইলকিনসন, হজসন প্রভৃতির নেতৃত্বে তাঁদের দাবীও তীব্র হয়ে উঠল। দেশীয় ভাষাকে সম্পূর্ণ অবহেলা ক'রে একমাত্র ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে তাঁরা দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানালেন। সাধারণের মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁরা দাবী করলেন।

লর্ড অকল্যাণ্ড সব দলের বক্তব্যই শুনলেন, কিন্তু চার বছরের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। ১৮৩৯ খ্রীঃ ২৪শে নভেম্বর সব দিক্ বিবেচনা ক'রে 'এক মিনিটে' তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। অকল্যাণ্ড বুঝতে পারেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যদলের বিরোধের পশ্চাতে একটা বড় কারণ জড়িয়ে আছে সরকারী বরাদ্দ অর্থের বণ্টন নিয়ে। তিনি সব দলকেই তুষ্ট ক'রে শিক্ষাক্ষেত্রের অচল অবস্থা দূর করতে চেয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি প্রাচ্যবাদী দলকে খুশী করতে সচেষ্ট হন। প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা, অধ্যাপকদের বেতন এবং ছাত্রদের এক-চতুর্থাংশকে বৃত্তি দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য সম্পর্কে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। প্রাচ্যবিদ্যা-অনুশীলনে প্রয়োজনীয় পুস্তক-প্রকাশের জন্য পরিমিত অর্থব্যয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাকেও তিনি সমর্থন করেন। এই নতুন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করবার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ৩১,০০০ টাকার বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়।

শাসনকর্তারূপে অকল্যাণ্ড স্বভাবতঃই ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষপাতী। শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, আরবী বা সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান-শিক্ষা সফল হ'তে পারে না। শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান যত বেশী লোকের মধ্যে প্রচার হয়, সেই চেষ্টা করা।

অকল্যাণ্ড চুঁইয়ে-নামা নীতির (filtration theory) সমর্থক ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের শুরু থেকেই কর্তৃপক্ষ এই নীতিকে অনুসরণ ক'রে চলেছিলেন, কিন্তু এই নীতি কর্মে অনুসৃত হলেও সরকারীভাবে গৃহীত নীতি বলে স্বীকৃতি পায়নি। মিশনারীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা ও ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ এই নীতিকে গ্রহণ ক'রে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার ও ধর্মপ্রচার সীমাবদ্ধ রাখতে মিশনারীদের অনুপ্রাণিত করেন। সরকারী প্রচেষ্টা উচ্চশিক্ষা-বিস্তারেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে এই শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে নীচের দিকে নেমে অগণিত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, অকল্যাণ্ড এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারী শিক্ষানীতি বলে গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই নীতি সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। চুঁইয়ে-নামা নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য তিনি ঢাকা, পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। যে সব জেলায় জেলাস্কুল স্থাপিত হয়েছিল, সেসব স্কুল এই কলেজগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দেবার প্রস্তাব করা হল।

মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে অকল্যাণ্ড কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি,

বা নিজের মতামতকে তিনি চাপিয়ে দিতে চাননি। এডামের রিপোর্ট ও দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচার-প্রচেষ্টায় সরকার আত্ম-নিয়োগ করলে সত্যিকারের সুফল কিছু হতে পারে, এমন সময় এখনও আসেনি। বাংলা দেশে ইংরেজী ও বম্বে প্রদেশে দেশীয় ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা চলছে, এই দুই পরীক্ষার ফলাফলের উপরই দেশীয় ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কালচক্রের আবর্তনের মধ্য দিয়েই দেশীয় ভাষার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। 'শিক্ষা-সভা'র (G.C.P.I.) কিছু সদস্য এডামের রিপোর্টকে পরিক্ষামূলকভাবে কিছুটা গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন, কিন্তু অকল্যাণ্ডের মন্তব্যের পর তাঁরা নিঃশ্চেষ্ট হলেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার সাধু প্রচেষ্টা এই দুইটি প্রস্তাব সরকারীভাবে গ্রহণ করবার ফলে ব্যর্থ হয়ে গেল। সরকারী শিক্ষা-নীতির ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ক'রে একটি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য সহৃদয় এডাম যে প্রস্তাব করেছিলেন, সরকার তা গ্রহণ করল না। সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও কিছু করা হল না। সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যেতে থাকায় অশিক্ষার অন্ধকার দেশকে গ্রাস করল। সামান্য-সংখ্যক লোকের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যেই সরকারী নীতিকে সীমাবদ্ধ রেখে ভারত সরকার শিক্ষা-সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করা হল-বলে আত্মতুষ্টির ভাব নিয়ে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিলেন।

।। মিশনারী প্রচেষ্টা (১৮৩৫-৫৪) ।।

১৮৩৩ খ্রীঃ নতুন সনদ আইনের বলে পৃথিবীর সব দেশের মিশনারীরাই ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাই দেখা যায়, ১৮৩৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মিশনারীদের কার্যকলাপ অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। এই যুগকে মিশনারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। যে সব মিশনারী সম্প্রদায় ভারতকে কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিল, তার মধ্যে অর্থে ও সংগঠনের শক্তিতে জার্মান ও আমেরিকানরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের কর্মক্ষেত্র সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংরেজী মিশনারীদের পক্ষেও এই যুগ সমৃদ্ধির যুগ। এই সময়েই মিশনারী প্রচেষ্টায় ভারতে কয়েকটি প্রসিদ্ধ কলেজ স্থাপিত হয়—মাদ্রাজ খ্রীস্টান কলেজ (১৮৩৭), নাগপুর হিসলপ কলেজ (১৮৪৪), মসলিপট্টম্ নোবেল কলেজ (১৮৪১), আগ্রা সেন্ট জোসেফ কলেজ (১৮৫২)। এই সব কলেজে অ-খ্রীস্টান ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী ছিল। কলেজ ছাড়াও সারা দেশব্যাপী মিশনারীরা বহু ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনারীদের বিশ্বাস ছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে ভারতীয়দের মধ্যে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে যাবে এবং দলে দলে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবে। ভারতীয়রা মিশন স্কুলে যোগ দিল, ইংরেজীও শিখল, কিন্তু খ্রীস্টান হল না।

এই যুগের ইংরেজ মিশনারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ডাফ। তিনি অকল্যাণ্ডের ধর্ম-সম্পর্কীয় নিরপেক্ষতাকে মোটেই সুনজরে দেখেন নি। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপে ইংল্যাণ্ডের মিশনারিগণও মোটেই তুষ্ট ছিলেন না। এদেশে ডাফ চাইছিলেন, শিক্ষার জন্য সরকার থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব করবে না। সেই ভার ছেড়ে দেওয়া হবে মিশনারীদের ওপর। তিনি আরও চাইলেন, সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে বাইবেল অবশ্যপাঠ্য হবে। প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য তিনি অকল্যাণ্ডকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। লর্ড হাডিঞ্জের প্রস্তাবও মিশনারীরা মোটেই সুনজরে দেখেননি। Bengal Council of Education সরকারী পরীক্ষা ও কলেজের পাঠ্য তালিকা থেকে মিশনারীদের প্রকাশিত কিছু বই বাদ দিয়ে দেওয়ায় ডাফ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, লৌকিক শিক্ষার চেয়ে সরকারী চাকরির জন্য খ্রীস্টান-শিক্ষাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। শিক্ষানীতির দু'একটি ক্ষেত্রে সামান্য মতবিরোধ থাকলেও এই যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৮১৩ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানী ও মিশনারীদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক থাকলেও এর পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। সরকারী কর্মচারিগণ মিশনারীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ডাফ ও কেরীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। টমাসন, আউটরাম, এডওয়ার্ড লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে মিশনারীদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে মিশনারীদের সাহায্য করা 'খ্রীস্টান কর্তব্য পালন করা' বলেই মনে করতেন।

সরকারী কর্মচারীদের এই অতিরিক্ত মিশনারী প্রীতির ফলে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশনারীদের বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের বিরুদ্ধে মিশনারীদের প্রচার ও অযৌক্তিক আক্রমণে উভয় সম্প্রদায়ই সরকারী মনোভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতির কার্যকারিতার উপর দেশের লোক আস্থাহীন হয়ে উঠে। দেশীয় পত্রিকাগুলি তীব্র ভাষায় মিশনারীদের কার্যের সমালোচনা শুরু করে। মিশনারীদের সম্পর্কে দেশবাসীর অবিশ্বাস ও সরকারী নীতিতে সন্দেহ আংশিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করেছিল। সরকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই ধর্মান্তরিত করতে চাইছে, এই ধারণা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এই ধারণার পশ্চাতে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের অতিরিক্ত আগ্রহ ও সরকারী কর্মীদের মিশনারী-প্রীতিই পরোক্ষভাবে দায়ী।

বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার প্রসার ॥

॥ **বাংলা** ॥ বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ঘোষিত হবার পর 'শিক্ষা-সভা' (G.C.P.I.) বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠল। ১৮৩৫ খ্রীঃ সভার নিয়ন্ত্রণে ৬টি ইংরেজী স্কুল ছিল। এই বছরই পুরী, গৌহাটি, ঢাকা, পাটনা, গাজিপুর ও

মিরাটে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বছরের জুন মাসে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান শেখাবার জন্য বেন্টিঙ্ক সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্লাস তুলে দিয়ে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। পরের বছর রাজসাহী, জব্বলপুর, হোসেঙ্গাবাদ, ফারাক্কাবাদ, বেরীলি ও আজমীরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৭ খ্রী: 'শিক্ষা-সভা'র পরিচালনায় ৪৮টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫,১৯৬ জন। এর মধ্যে ৩,৭২৯ জন শিক্ষার্থী ইংরেজী শিক্ষালাভ করত। অকল্যাণ্ডের পরিকল্পনা ছিল প্রতি জেলায় একটি ক'রে জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঢাকা, হুগলী, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর জেলায় ইংরেজী স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৮৩৬ খ্রী: দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীনের দানে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনদিনের মধ্যে এখানে ১,২০০ ছাত্র ভর্তি হয়। যখন প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৃত্তি দিয়েও ছাত্র যোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না, সেই সময়ে ইংরেজী স্কুলগুলিতে বেতন দিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছাত্ররা স্থান সংগ্রহ করতে পারছিল না। শিক্ষা-ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 'শিক্ষা-সভা'র কাজও বেড়ে যায়। শিক্ষার জন্য ব্যয় ১৮৪০ খ্রী: বেড়ে গিয়ে ৫,৫০,০০০ টাকা হয়। এই সব টাকাই 'শিক্ষা-সভা'র হাত দিয়ে খরচ হত। ১৮৪১ খ্রী: সরকার নিজস্ব স্কুলগুলির জন্য জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তির ব্যবস্থা করে। হিন্দু কলেজকে এই সময়েই প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। ১৮৩৭ খ্রী: 'শিক্ষা-সভা' শুধু বাংলা দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কত ব্যয় করেছিল, তার একটা হিসাব পাওয়া গিয়েছে। এতে স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা কত ছিল তাও জানা যায়।

প্রতিষ্ঠান	ছাত্র সংখ্যা	বার্ষিক ব্যয়
হিন্দু কলেজ	৪৫১	৪০৫৯ টাকা
মহসীন কলেজ (হুগলী)	৭৫০	৩০০০ টাকা
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	২২৭	২২৫ টাকা
মাদ্রাসা ইংরেজী স্কুল	১৫১	৬৫০ টাকা
ঢাকা স্কুল	৩১৪	৫৩৬ টাকা
গৌহাটি স্কুল	১৫৪	২৭৯ টাকা
চট্টগ্রাম স্কুল	৮০	১৫০ টাকা
মেদিনীপুর স্কুল	৭৯	৩০৫ টাকা
নিজামৎ কলেজ, ইং বিদ্যালয়	১০৯	৫০০ টাকা
বোয়ালিয়া স্কুল (রাজসাহী)	৮০	১৭৭ টাকা
কুমিল্লা স্কুল	৮৮	৩ ০ টাকা

এর পর যশোহর ও দিনাজপুরে একটি ক'রে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বরিশালে একটি স্কুল ছিল এই স্কুলকে প্রবেশনারি স্কুল বলা হত। ১৮৩০ খ্রী: ফরিদপুরে স্থানীয়

দাকদের প্রচেষ্টায় একটি ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ সরকার এই লের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষার জন্য 'শিক্ষা-সভা'র হাত দিয়ে সাড়ে পাঁচ লক্ষ কা খরচ হত। এর মধ্যে দেড় লক্ষ প্রাচ্য বিদ্যার জন্য, বাকী চার লক্ষ ব্যয় হত ংরেজী শিক্ষার জন্য। বাংলা শিক্ষা বা গণ-শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে কটি পয়সাও খরচ হত না।

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি ও সুষ্ঠু পরিচালনা-ব্যবস্থার জন্য একটি রকারী শিক্ষা-বিভাগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৮৪২ খ্রীঃ 'শিক্ষা-সভা' G. C. P. I.) ভেঙ্গে দিয়ে Council of Education স্থাপিত হল। দেশীয় শক্ষা ছাড়া এই কাউন্সিল সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত সব স্কুল কলেজের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ ক'রে সরকারী শিক্ষা-বিভাগরূপে কাজ শুরু করল। উঃ পঃ প্রদেশ ঠিত হবার পর এই প্রদেশের জন্য পৃথক্ কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা াউন্সিলের এলাকা ছোট হওয়ায় কার্য-পরিচালনার সুবিধা হল। ১৮৪৩ খ্রীঃ কাউন্সিল াঠ্য পুস্তকের মান-উন্নয়ন ও শিক্ষকদের শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হন। দ্যালয়-পরিদর্শনের জন্য ৩ জন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ কাউন্সিল াথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। ১৮৫৪ খ্রীঃ কাউন্সিলের পরিচালনায় ১৫১টি ল ছিল। এই স্কুলগুলিতে ছাত্র ছিল ১৩,১৬৩ জন, আর এই স্কুলগুলির জন্য বার্ষিক ্যয় ছিল ৫,৯৪,৪২৮ টাকা।

বেসরকারী শিক্ষা-প্রসার প্রচেষ্টা ॥

দেশীয় জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষায় আগ্রহশীল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী চেষ্টায় ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হচ্ছিল। বিগত শতকের শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ধীরে ধীরে শিক্ষাব্রতী ভারতীয়গণ শিক্ষা-প্রসারের কাজে অধিকতর উৎসাহে গিয়ে আসেন। ১৮৪০ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেন। খানে বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত। পল্লীবাসীদের মধ্যে নতুন আদর্শে শিক্ষা-প্রচারের উদ্দেশ্যে এটি হুগলীর বংশবাটী গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ রাধাকান্ত দেব এবং দেবেন্দ্রনাথ 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। এখানে বিনা বেতনে উচ্চ-ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। খ্রীস্টান প্রভাব থেকে হিন্দু ছাত্রদের দূরে রাখবার মানসে এই দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একই উদ্দেশ্যে পানিহাটিতেও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হল।

'হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ' বেসরকারী প্রচেষ্টার অপর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। হিন্দু কলেজ' সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পর থেকেই জনমতকে উপেক্ষা ক'রে ত। হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানুরাগী হয়ে উঠলেও প্রাচীন রক্ষণশীল দল খনও সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ হীরা বুল নামে এক গণিকার পুত্রকে কলেজে ভর্তি করায় হিন্দু সমাজ তীব্রভাবে তিবাদ জানায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবাদে কর্ণপাত না করায় হিন্দু নেতৃবর্গ

এর জবাবে ১৮৫৩ খ্রীঃ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়েলিংটনের দত্ত পরিবারের রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। গুরুচরণ দত্তো ডেভিড হেয়ার একাডেমি ও মতিলাল শীলের 'শীলস ফ্রি কলেজ' এর সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রতিবাদের তীব্রতায় হিন্দু কলেজ হীরা বুলবুলকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

এর পূর্বে ১৮৪৩ খ্রীঃ দুইটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা বর্তমান যুগে কলেজ বলতে যা বুঝি, তখনকার দিনে কলেজ বলতে তা বোঝাত না। সেই সময়ে কলেজে নিম্ন, মধ্য, উচ্চ সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 'ডাফ জেনারেল এসেম্বিলিজ' কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি 'ফ্রি বডি ইন্সটিটিউসন' নামে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই কলেজের নাম হয় 'ডাফ কলেজ'। এই বছরই কলকাতার ধনিশ্রেষ্ঠ মতিলাল শীল 'শীল্‌স্ কলেজ' নামে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের বই কেনবার জন্য মাসে মাত্র এক টাকা ক'রে দিতে হত।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

এডামের রিপোর্টে বাংলা ও বিহারের প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্রটি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায়, সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে জাতীয় শিক্ষার ধারাটি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল, মৌখিক সহানুভূতিও প্রকাশ করেছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কিছু করা কর্তব্য বোধ করেনি। শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখবার মত কর্মচারী সৃষ্টির জন্য শাসক সম্প্রদায় উচ্চ শিক্ষার সামান্য ব্যবস্থা ক'রেই মনে করেছিল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষিত হলেই ধীরে ধীরে সেই শিক্ষা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। মিশনারীরা সাধারণের জন্য নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা-প্রচারের আয়োজন করেছিল সত্য, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধা না থাকায় জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে বা জাতীয় প্রয়োজন মেটাতে তাঁরা সমর্থ হননি।

বাংলাদেশে সরকার পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টা করেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৮৪৪ খ্রীঃ তাঁর এক প্রস্তাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ বেড়ে যায়। এই প্রস্তাবে বলা হয়, সরকারী চাকরিতে নিয়োগকালে যারা কাউন্সিল অব এডুকেশন দ্বারা স্থাপিত বা অনুমোদিত স্কুল থেকে শিক্ষা লাভ করেছে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নিম্নতন কর্মচারী নিয়োগকালে যারা লিখতে-পড়তে জানে, তাদের কথাই আগে বিবেচনা করা হবে। প্রস্তাবের শেষ অংশে সরকার কর্তৃক দেশীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে বলা হয়েছে, কাউন্সিল অব এডুকেশনের মুখাপেক্ষী না থেকে সরকার নিজ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। হার্ডিঞ্জ বাংলা ও বিহারে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অর্থ-সংস্থানের অবস্থানুযায়ী প্রথমে ১০১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। এই সব স্কুলে মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল,

তিহাস পড়াবার উপযোগী শিক্ষক নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্থির করা হয়, যে সব গ্রাম থেকে বিদ্যালয়-গৃহের সংস্থান ক'রে দেওয়া হবে, সেই সব গ্রামেই প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষকদের বেতন দেবার ভার সরকার গ্রহণ করবে। শিক্ষকদের উৎসাহ দেবার জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ শিক্ষকদের দেওয়া হবে। প্রাপ্ত অর্থের বাকি অংশ দিয়ে স্কুলের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হবে। ১৮৪৪ খ্রীঃ এই স্কুলগুলি পরিদর্শনের জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।

হার্ডিঞ্জের ঘোষণার ফলে সরকারী চাকরির লোভে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি সাধারণের আগ্রহ বেড়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য ব্যবহারিক শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি অবহেলিত হতে থাকে। চাকরিলাভই শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়াতে শিক্ষার মানের অবনতি হয়। সরকারী চাকরির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে অতি সামান্যভাবে হলেও শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি হয়। অল্প খরচে সরকারী চাকরিজীবীর কারখানা অনেক তৈরি হল, কিন্তু দেশের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার এতে বিশেষ হল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল, ১৮৫২ খ্রীঃ মাত্র ২৬টি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রইল। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কাউন্সিল অব এডুকেশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাধারণ পল্লীবাসীরা গ্রাম্য পাঠশালাগুলিই বেশী পছন্দ করত। এ ছাড়া, সরকারী পাঠশালাগুলিতে এক আনা বেতন দেওয়া গ্রামের লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা মাতৃভাষায় শিক্ষা অপেক্ষা ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য অধিক আগ্রহশীল ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য লর্ড ডালহৌসিও চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ৮৫৩ খ্রীঃ এডামের পরিকল্পনাকে কিছুটা পরিবর্তন করে উঃ পঃ প্রদেশের অনুকরণে পাঠশালা স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। দেশীয় স্কুলগুলির জন্য সরকারী সাহায্যের (grant-in-aid) ব্যবস্থা হয়। এত ক'রেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ১৮৫৪ খ্রীঃ বম্বে প্রদেশে সরকার-অনুমোদিত দেশীয় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২,০০০ জন, আর বাংলা দেশে ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল ১,৪০০ জন।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্কে ১৮৫৪ খ্রীঃ ৩রা জুন Calcutta Review পত্রিকায় লেখা হয়—

In Bengal, with its thirty seven million, the Government bestows 8,000 Rupees annually on vernacular education, one third the salary of a Collector of Revenue, as much is expended on 2000 prisoners in Jails.

॥ বম্বে ॥ এই প্রদেশের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা-প্রসারের দায়িত্ব Bombay Native Education Societyর উপর ন্যস্ত ছিল। এই সোসাইটির প্রচেষ্টায় ১৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত ৪টি ইংরেজী স্কুল ও ১১৫টি জিলা প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়।

বম্বে প্রদেশে প্রাইমারী স্কুল বলতে বর্তমানের মত প্রাইমারী স্কুল বোঝাত না। এসব প্রাইমারী স্কুলে মাধ্যমিক স্কুলের মত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্য-তালিকায় লিখন, পঠন, অঙ্ক শেখাবার সঙ্গে দর্শন, বীজগণিত, জ্যামিতি শেখাবার ব্যবস্থাও ছিল। মাতৃভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাদানই এই বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য ছিল। এই স্কুলগুলি ছাড়া সরকার থেকে পুণা সংস্কৃত কলেজ, এলফিনস্টোন কলেজ ও পুণা জেলায় পুরন্দর তালুকে ৬৩টি প্রাইমারী স্কুলের পরিচালনা করা হত। ১৮৪০ খ্রীঃ সোসাইটি ভেঙ্গে দিয়ে "বোর্ড অব এডুকেশন" স্থাপিত হয়। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার দায়িত্ব এই বোর্ড গ্রহণ করে। একজন সভাপতি ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়। এই সদস্যদের মধ্যে তিনজন ছিলেন নেটিভ সোসাইটির মনোনীত ভারতীয় সদস্য, অপর তিনজন সরকার-মনোনীত সদস্য। বোর্ড প্রথমেই নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করে। সমগ্র প্রদেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ ক'রে তিনজন ইউরোপীয় পরিদর্শক ও তিনজন ভারতীয় পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। বোর্ড এডামের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সম্ভব কিনা দেখবার জন্য একটি কার্যক্রম রচনা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪২ খ্রীঃ দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের একটি পরিসংখ্যা নেওয়া হয়। এই পরিসংখ্যায় দেখা যায়, দেশে ১৪২০টি দেশীয় স্কুলে ৩০,০০০ জন ছাত্র আছে। অর্থের অভাবে দেশীয় পাঠশালার উন্নতি ও এই পাঠশালার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কার্যক্রম বাতিল ক'রে দেওয়া হয়।

বাংলায় যখন শিক্ষার বাহন নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দলের বিরোধ চলছিল, সেই সময়ে বম্বে প্রদেশে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হয়েছিল। এই প্রদেশে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষাপ্রচারের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার বাহনরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজীর কোন স্থান ছিল না। সংস্কৃত শেখানো হত প্রাচীন ভাষারূপে, আধুনিক ভাষারূপে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তিনটি ভাষাকেই যথোচিত মর্যাদা দেওয়ায় বিরোধের পথ রুদ্ধ হয়। তিনটি ভাষা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব পুণা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও দেশীয় শিক্ষার প্রধান কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ক্যাণ্ডী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন,—সাধারণের শিক্ষার বাহন ইংরেজী বা সংস্কৃত হবে না, হবে তাদের মাতৃভাষা। ইংরেজী ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করা হবে, আর মাতৃভাষাকে এই জ্ঞান-বিস্তারের বাহনরূপে ব্যবহার করা হবে। মাতৃভাষাকে সম্পদশালী ক'রে তুলতে সংস্কৃতের সাহায্য নেওয়া হবে।

বোর্ড পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বিরোধী ছিল না—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান স্থান লাভ করেছিল। বোর্ড চুঁইয়ে-নামা নীতিতে মোটেই আস্থাবান ছিল না। উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে শিক্ষা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে বাংলার এই ভ্রমাত্মক নীতি বোর্ড কোন দিনই গ্রহণ করেনি। এই প্রদেশে নীচু থেকেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা শুরু হয়। ১৮৪৫ খ্রীঃ বাংলা ও

…ম্বের তুলনামূলক পরিসংখ্যান-তালিকা থেকেই এই প্রদেশের বোর্ডের গৃহীত নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা করা যায় :—

১৮৪৫ খ্রীঃ বাংলা ও বম্বের শিক্ষার প্রকার :—

	বাংলা	বম্বে
জনসংখ্যা—	৩ কোটি ৭০ লক্ষ	১ কোটি ৫০ লক্ষ
শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ—	৫৭৭,০৯৩ টাকা	১,৬৮,২৬৬ টাকা
সরকারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা—	৫৫৭০ জন	১০,৬১৬ জন
ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্তর সংখ্যা—	৩৯৫৩ জন	৭৬১ জন

১৮৭৩ খ্রীঃ বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার পেরী এডুকেশন বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর এই প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। স্যার পেরী ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা ও চুঁইয়ে-নামা নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি তাঁর মতবাদ বোর্ডের সামনে উপস্থিত করায় বাংলার মত এখানেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের সৃষ্টি হয়। পেরী ও বোর্ডের দুইজন সদস্য ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর দলে ছিলেন বম্বে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল জারভিস এবং তিনজন ভারতীয় সদস্য। পাশ্চাত্যবাদী দল ইংরেজীকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ভারতীয়গণ ইংরেজী শিখতে আগ্রহশীল, ইংরেজী বইয়ের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ সম্ভব নয়, তাছাড়া এ চেষ্টা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। রাজনৈতিক কারণেও ভারতীয়দের ইংরেজী শিখতে উৎসাহিত করা দরকার। প্রাচ্য দলের নেতা ছিলেন কর্ণেল জারভিস। তাঁর যুক্তি তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থিত করেন। তিনি বলেন—General instruction can not be afforded except through the medium of a language with which the mind is familiar. I conceive it a paramount duty, on our part to foster the vernacular dialects. If the people are to have a literature it must be their own. The subject may be, in a great degree European but it must be freely interwoven with home-spun materials and the fashion must be Asiatic. (*Richie, ed Minute by Colonel Jervis*)

১৮৪৮ খ্রীঃ এই বিরোধ এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, মীমাংসার জন্য উচ্চতম কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করতে হয়। প্রাদেশিক সরকার এমনভাবে নির্দেশ দিল যে, তার দুই রকম ব্যাখ্যাই হতে পারে। এতে বিরোধের অবসান হল না। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ইংরেজী শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করবার নির্দেশ দেওয়ায় বম্বে প্রদেশেও বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতিই জয়যুক্ত হল। প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীই হল একমাত্র বাহন। দেশীয় ভাষা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত রইল। পেরীর আধিপত্য যতদিন বোর্ডে ছিল, ততদিন প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত রয়েছে। ১৮৪৩-৫২ খ্রীঃ মধ্যে মাত্র ৪৩টি দেশীয় স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। দেশের

প্রধান প্রধান কেন্দ্রে, যথা—সুরাট (১৮৪৪), রত্নগিরি (১৮৪৫), আহমেদাবাদ (১৮৪৬), রেওয়ার (১৮৪৮), ব্রোচ (১৮৪৯), কোলাপুর (১৮৫১), সাতারা (১৮৫২), রাজকোট (১৮৫৩), কোলাপুরে (১৮৫৪)—ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।

স্যার পেরীর অবসর-গ্রহণের পর বোর্ড তাঁর প্রভাবমুক্ত হওয়ায় দেশীয় শিক্ষা-প্রচারের দিকে আবার মনোযোগ দেওয়া হয়। দেশীয় স্কুলগুলির সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ এই প্রদেশে সর্বপ্রথম Grant-in-aid প্রথার প্রবর্তন হয়। দেশীয় স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৫ খ্রীঃ যে সব গ্রাম সরকারী সাহায্যে উচ্চমানের স্কুল স্থাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। গ্রামগুলি স্কুলের শিক্ষকের বেতনের জন্য কত টাকা পর্যন্ত দিতে পারবে, তাও জানাতে বলা হয়। পঁয়ত্রিশটি গ্রাম থেকে সরকারী সাহায্যের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে পঁচিশটি গ্রাম যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তাদের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। পরের বছর এক ডিভিশনের ৮৪টি গ্রাম থেকে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে দরখাস্ত পাওয়া যায়। বম্বে প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সরকারী উদ্যোগ প্রশংসনীয়। উডের ডেসপ্যাচে এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে :—It appears that 216 vernacular schools are under the management of the Board of Education and that the number of pupils attending then is more than 12,000. There are three inspectors of the district school The schools are reported to be improving and the masters trained in Government colleges have been recently appointed to some of them with happiest effect." (*Wood's Despatch*)

।। **মাদ্রাজ** ।। দক্ষিণ ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে মিশনারী প্রচেষ্টা একটি স্থান গ্রহণ করেছিল। মাদ্রাজ সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছিল প্রধানতঃ দুইটি কারণে,—প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সরকারী উৎসাহ ও বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী সাহায্য দান। ১৮৩০ খ্রীঃ কোর্ট অব ডাইরেক্টরস মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষকে বেসরকারী সাহায্য দান করতে নিষেধ ক'রে এক নির্দেশ দেয়। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ খরচ হোক, এই ছিল বিলাতের কর্তাদের ইচ্ছা। বেসরকারী শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া ও আর্থিক সাহায্য করা যে সরকারের নৈতিক কর্তব্য, একথা বিস্মৃত হয়ে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস মাদ্রাজের গণশিক্ষা-বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

মেকলের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র বাংলা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও বম্বে কি মাদ্রাজ কোন প্রদেশই বাংলায় অনুসৃত শিক্ষানীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস-এর নির্দেশে মাদ্রাজের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এবার কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিল, ইংরেজী শিক্ষা বিশেষ ক'রে উচ্চ শিক্ষার জন্যই সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে। তহশীল ও কলেক্টরেট

স্কুলগুলিতে এতদিন যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল, এই নির্দেশের ফলে সেই সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হল—১৮৩৬ খ্রীঃ পর মাদ্রাজ প্রদেশের তহশীল ও কলেক্টরেট স্কুলের অস্তিত্ব আর রইল না। এসব স্কুলের পরিবর্তে ইংরেজী স্কুল খোলবার সিদ্ধান্ত করা হল।

ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য লর্ড এলফিনস্টোন ১৮৩৯ খ্রীঃ কলেজ ও স্কুল এই দুটি বিভাগ নিয়ে মাদ্রাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার প্রস্তাব করেন। প্রদেশের বিভিন্ন শহরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খোলবার পরামর্শও তিনি দেন, তিনি বলেন, দরকার হলে এই স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করা হবে। Committee of Native Education বিলোপ ক'রে University Board-এর উপর শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করবার প্রস্তাবও এই সঙ্গে করা হয়।

কোর্ট অব ডাইরেক্টরস সম্পূর্ণভাবে দেশীয় শিক্ষাকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেননি। ১৮৪১ খ্রীঃ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল বিভাগ খোলা হয় এবং ইউনিভারসিটি বোর্ডের স্থলে কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীঃ কাউন্সিলের স্থানে বোর্ড অব এডুকেশন গঠন করা হয়। নতুন বোর্ডের হাতে শিক্ষার জন্য ১০০,০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকায় দু'টি স্কুল খোলা হয় এবং অবশিষ্ট ২০,০০০ টাকা প্রাথমিক স্কুলের সাহায্য বাবদ রেখে দেওয়া হয়।

সরকারী সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হলেও মিশনারিগণ নিরুদ্যম হননি। মিশনারীরা বিভিন্ন স্থানে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এই প্রদেশে মিশনারী অবদান বিশেষ প্রশংসনীয়। ১৮৫২ খ্রীঃ এঁদের পরিচালনায় মাদ্রাজ প্রদেশে ১১৮৫টি স্কুল ছিল, এই স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৮,১০৫ জন। ভারতের অন্য সব প্রদেশ মিলিয়ে এই সময়ে মোট মিশনারী স্কুল ছিল ৫৭২টি ও ছাত্র ছিল ২৬,৭৯১ জন।

॥ **উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ** ॥ ১৮৪২ খ্রীঃ এই প্রদেশটি গঠিত হয়। প্রাদেশিক সরকারের হাতে আগ্রা, দিল্লী ও বেনারসের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই প্রদেশটি জন্মক্ষণ থেকেই বাংলা থেকে পৃথক্ এক নতুন শিক্ষা-নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। কর্তৃপক্ষ চুঁইয়ে-নামা নীতির কার্যকারিতায় আস্থাবান ছিলেন না। শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করাই যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে করেন। এই প্রদেশটি ছিল শিক্ষায় অত্যন্ত অনগ্রসর। তাই জন-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সরকারকে প্রথম থেকেই তৎপর হতে হল, এবং সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অগ্রাধিকার তাঁরা মেনে নিলেন। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি, পরিদর্শন ও পরামর্শ দিয়ে শিক্ষার মান-উন্নয়নের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় পাঠ্য বইয়ের চাহিদা মেটাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল।

॥ **টমাসনের পরিকল্পনা** ॥ উঃ পঃ প্রদেশে গণশিক্ষা-বিস্তারে প্রথম উদ্যোগী হন প্রাদেশিক গভর্ণর মিঃ জেমস্ টমাসন। গণশিক্ষা-বিস্তারে তাঁর অবদান উঃ পঃ

প্রদেশের শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। টমাসনের চেষ্টায় এই সর্বপ্রথম একটি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে দেশীয় ভাষায় দেশীয় জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রদেশের শিক্ষার সঠিক অবস্থা জানবার জন্য প্রথমেই তিনি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হন। তদন্তে জানা যায়, উঃ পঃ প্রদেশে ৭৯৬৬টি গ্রামীণ স্কুল আছে। দেশের শিক্ষাগ্রহণযোগ্য বয়সের ১৯,৩৩,১৩৮টি ছেলের মধ্যে মাত্র ৭০,৮২৬ জন ছেলে স্কুলে শিক্ষা পাচ্ছে। শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দূর করবার জন্য তিনি একটি ব্যাপক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে গণশিক্ষা-প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবার প্রস্তাব করা হয়। টমাসন বলেন, এডামের পরিকল্পনা এই প্রদেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দেশীয় স্কুলগুলির অবস্থা, সংগঠন বা শিক্ষার মান কোন দিক্ থেকেই আশাপ্রদ নয়। তবু এই স্কুলগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ক'রে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন পর্যন্ত চুঁইয়ে-নামা নীতিতে আস্থাবান ছিলেন, তাই গণশিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই সরকার থেকে করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। টমাসনের প্রচেষ্টায় কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নীতি আংশিকভাবে পরিবর্তন ক'রে টমাসনের গণশিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে। গণশিক্ষা-বিস্তারের নীতিকে সরকারীভাবে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের হলেও এই প্রথম এ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পেল।

টমাসনের দ্বিতীয় কীর্তি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শিক্ষা-করের প্রবর্তন। তাঁর চেষ্টায় ভূমিরাজস্বের উপর শতকরা এক টাকা হিসেবে শিক্ষা-কর ধার্য করা হয়। শিক্ষার জন্য করধার্যের ব্যবস্থা ইংলণ্ডে ১৮৭০ খ্রীঃ পূর্বে সম্ভব হয়নি। ১৮৫১ খ্রীঃ উঃ পঃ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্থানীয় কর ধার্য হয়। প্রতি গ্রামে স্কুল খোলা সম্ভব নয় বলে টমাসন কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে একটি 'হল্কা' নির্দিষ্ট ক'রে প্রতি 'হল্কা'য় একটি ক'রে স্কুল স্থাপন করেন। এই 'হল্কাবন্দী' প্রথায় স্কুল-স্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব মথুরার কলেক্টর আলজেণ্ডারের প্রাপ্য। উঃ পঃ প্রদেশের প্রতি তহশীলে একটি ক'রে আদর্শ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা হয়। তহশীল স্কুলের পাঠক্রম বেশ ব্যাপকভাবে তৈরি করা হয়। লেখা-পড়া, অঙ্কের সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, হিসাব প্রভৃতি মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকদের বেতন মাসে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হয়। এছাড়া, ছাত্রদের কাছ থেকেও কিছু বেতন পাওয়া যেত। দেশীয় স্কুলগুলি পরিদর্শনের জন্য প্রতি জেলায় একজন জেলা পরিদর্শক ও তাঁর অধীনে তিনজন ক'রে মহকুমা পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। পরিদর্শন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চে একজন Visitor General নিযুক্ত করা হয়। এই সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থাকেই পরবর্তী কালের শিক্ষা-বিভাগ স্থাপনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এটি টমাসনের তৃতীয় কৃতিত্ব।

টমাসনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৯ খ্রীঃ বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ দেখা যায়, উঃ পঃ প্রদেশের মোট স্কুলের সংখ্যা ৩৯২০টি ও ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫৩,০০০ জন।

॥ **উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা** ॥ উঃ পঃ প্রদেশ গঠিত হবার সময় বেনারস, আগ্রা ও দিল্লীতে সরকারী পরিচালনায় তিনটি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠান-গুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮৫৪ খ্রীঃ ৯৭৬ জন। আগ্রায় ১৮৫২ খ্রীঃ সেন্ট জন কলেজ স্থাপিত হয়। বেরীলি হাই স্কুল ও বেনারসের জয়নারায়ণ স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়। আগ্রায় শিক্ষক-শিক্ষণের একটি নর্মাল স্কুল খোলা হয়। উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার থেকে বার্ষিক ১,৮০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৮৫৪ খ্রীঃ উঃ পঃ প্রদেশে মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩,৯২০টি এবং এখানে ৫৩০০০ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করত।

॥ **পাঞ্জাব** ॥ ১৮৪৯ খ্রীঃ পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হয়। এই প্রদেশে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হবার পর থেকেই অমৃতসর ও লাহোরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। অমৃতসর শহরে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আশাতীতরূপে সাড়া পাওয়া যায়। সমগ্র প্রদেশে শিক্ষা-প্রসারের জন্য উঃ পঃ প্রদেশের অনুরূপ একটি পরিকল্পনা করা হয়। পাঞ্জাব প্রদেশের জন্য চারটি নর্মাল স্কুল, পঞ্চাশটি তহশীল স্কুল, লাহোরে একটি কেন্দ্রীয় কলেজ, একজন ভিজিটর জেনারেল, বারোজন জেলা পরিদর্শক, পঞ্চাশজন পরগণা পরিদর্শক নিযুক্ত করবার প্রস্তাব এই পরিকল্পনায় গৃহীত হয়।

॥ **স্ত্রীশিক্ষা** ॥ স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব আছে, উডের ডেসপ্যাচের আগে তার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। সরকারী তহবিল থেকে তার পূর্বে একটি কপর্দকও এজন্য ব্যয় করা হয়নি। দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সামান্য যেটুকু অগ্রগতি হয়েছিল, তা মিশনারী ও বেসরকারী শিক্ষাব্রতীদের দান। বাংলা দেশের মত মাদ্রাজ ও বম্বে প্রদেশে মিশনারী মহিলাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে কিছু কিছু মেয়ে-স্কুল ও বোর্ডিং-এর প্রতিষ্ঠা হয়। মাদ্রাজে 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' ১৮২১ খ্রীঃ প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে। ১৮৫০ খ্রীঃ মধ্যে বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের নানা স্থানে মেয়েদের জন্য ৭টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেরিকান মিশনারী সম্প্রদায় বম্বে প্রদেশে ১৮২৪ খ্রীঃ প্রথম মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। দশ বছরের মধ্যে এই প্রদেশে আরও দশটি স্কুল খোলা হয়। ডাঃ ও মিসেস উইলসনের (পূর্ববর্তী জীবনে মিস কুক) প্রচেষ্টায় স্কট মিশনারী সোসাইটির পক্ষ থেকে ৬টি মেয়েশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ পুণায় উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য ৫টি স্কুল খোলা হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ আমেদাবাদের রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদ মেয়েদের জন্য ২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। পুণায় মহাত্মা ফুলে একটি মেয়ে-স্কুল পরিচালনা করতেন। এছাড়া, Bombay Students'

Library and Scientific Societyর পরিচালনায় ৯টি মেয়ে-স্কুলে ৬৫০ জন ছাত্রী ছিল।

বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারে মিশনারীরাই পথ প্রদর্শন করেন। এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে মিস কুকের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে শিক্ষাব্রতী বাঙ্গালী সমাজও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। উত্তরপাড়া, বারাসত, যশোহর, সুখসাগর, নেবাদিয়া প্রভৃতি স্থানে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮৪৮ খ্রীঃ বেথুন সাহেব বড়লাটের পরিষদের আইন-সদস্য হয়ে এদেশে আসেন, এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হয়। ১৮৪৫ খ্রীঃ ৭ই মে তাঁর প্রচেষ্টায় ২১ জন ছাত্রী নিয়ে Calcutta Female School বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই স্কুল-প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলায় স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। এই স্কুলের বাড়ী করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দশ হাজার টাকা ও পাঁচ বিঘে জমি দান করেন। বেথুন সাহেব এই স্কুলের জন্য ১০ হাজার পাউণ্ড দান করেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির সম্মানে এই স্কুলের নাম হয় 'বেথুন নারী বিদ্যালয়'। ১৮৮৭ খ্রীঃ এই স্কুল বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়। বেথুন কলেজই মেয়েদের প্রথম কলেজ। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন বাদে রাজা রাধাকান্তদেব শোভাবাজারে একটি মেয়ে-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কলিকাতায় নিকটবর্তী অঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহিত দেশীয় সমাজ-হিতৈষীদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেও দেশের লোকের অর্থসাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

॥ **ফলশ্রুতি** ॥ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে ১৭৩৩ খ্রীঃ সনদ আইনের সময় থেকে উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত যে যুগ-বিভাগ, তাকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে "পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ" (Age of Experiment) বলা যায়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Syed Nurulla এবং J. P. Naik এই যুগকে বলেছেন—'a period of controversis rather than of achievements." শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষা-পরিচালনার কর্তৃত্ব, শিক্ষার জন্য আর্থিক দায়িত্ব প্রভৃতি নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক এই যুগে হয়েছে। প্রাচ্য বিদ্যা, কি পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা, শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবী বা ইংরাজী ভাষা পরিচালনার দায়িত্ব সরকার, মিশনারী বা দেশীয় জনসাধারণের হাতে থাকবে। এ নিয়ে এ যুগে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার প্রসার কিছুটা ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু এর কোন মূল্য নেই, একথাও বলা যায় না। দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠবে, সেই সম্পর্কে পরবর্তী পরিকল্পনা রচনায় এ যুগের ভুল-ভ্রান্তি ও সাফল্য যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এযুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দানই হচ্ছে ভবিষ্যতের চলার পথকে সুগম করা। প্রজার শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, একথা এই যুগে শুধু স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। এ যুগেই সর্বপ্রথম সরকারীভাবে একটা সর্ব-

ভারতীয় সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। চুঁইয়ে-নামা শিক্ষানীতির পরীক্ষা ও তার ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা-প্রসারের নীতি নির্ধারিত হয়। ধর্ম সম্পর্কে সরকারী মনোভাব যাই থাকুক না কেন, শিক্ষা যে ধর্মনিরপেক্ষ হবে, একথা এ সময়েই সরকারী-ভাবে ঘোষিত হয়। এই বিরাট দেশের শিক্ষা-বিস্তার যে শুধুমাত্র সরকারী চেষ্টায় সম্ভব নয়, দেশীয় ও বেসরকারী প্রচেষ্টারও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে সম্পর্কেও সরকার সচেতন হন। কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স যখন ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচ-রচনায় উদ্যোগী হন, তখন অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই পিছনে-ফেলে-আসা যুগের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ক'রে এই বিরাট দেশের উপযোগী শিক্ষানীতি নির্ধারণে সরকার সক্ষম হয়েছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)

ও

স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ (১৮৫৯)

আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম আয়োজন হয়েছিল বেসরকারী প্রচেষ্টায়। সাধারণের শিক্ষায় রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে, ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তা অষ্টাদশ শতকে স্বীকার করেনি। মিশনারী শিক্ষা-বিস্তার প্রয়াস কোথাও কোম্পানীর সহায়তা লাভ করেছেন, কোথাও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইনে শিক্ষা-সম্পর্কিত ধারাটি (Education clause) গৃহীত হবার পর কোর্ট অব ডাইরেক্টরস অতি অনিচ্ছার সঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্বের কথা মেনে নেয়। শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর দশ বছর পর্যন্ত কোম্পানী বা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কিছু করা হয়নি। এ সময়কে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিষ্ক্রিয়তার যুগ বলা হয়। ১৮২৩ খ্রীঃ সরকারী নিষ্ক্রিয়তার অবসান হয়, এই সময় থেকেই শুরু হয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের যুগ। এই বিরোধের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি সরকারীভাবে গৃহীত হয়নি। মেকলের মন্তব্য ও বেণ্টিঙ্কের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতির ইংগিত পাওয়া যায়। এর পর থেকে কুড়ি বছর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বাগ্-বিতর্ক, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। সরকারী ও বেসরকারীভাবে এই যুগে বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ স্বাধীনভাবে এক-একটি নীতির অনুসরণ করেছে। চুঁইয়ে-নামা নীতির (Downward filtration) ব্যর্থতা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ অবহিত হয়েছেন। জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সরকার দিন দিন বুঝতে পেরেছে। ঠিক এই পটভূমিকায় ১৮৫৩ খ্রীঃ নতুন ক'রে কোম্পানীর সনদ নেওয়ার সময় আসে। এই উপলক্ষে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা হয়। বিভিন্ন নীতির পরিবর্তে সমগ্র বৃটিশ ভারতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। হাউস অব কমন্সের একটি নির্বাচিত কমিটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধান করেন। এই কমিটির সামনে ডাঃ ডাফ স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন, মিঃ উইলসন তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এতদিন কর্তৃপক্ষের মনে ভারতে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটা সংশয়ের ভাব ছিল। এঁরা সবাই এক বাক্যে বলেন, ভারতে শিক্ষা-বিস্তার হলে সরকারের আশঙ্কার কোন কারণ নেই ; বরং শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বের সহায়ক হবে। এই তদন্তের উপর ভিত্তি ক'রে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের

সভাপতি স্যার চার্লস উডের নির্দেশে এক মূল্যবান শিক্ষা-দলিল রচিত হয়। উডের নির্দেশে রচিত হয়েছিল বলে একে 'উডের ডেসপ্যাচ' বলা হয়। অনেকের ধারণা, এই দলিলটি বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক স্টুয়ার্ট মিল রচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এটি লর্ড নর্থব্রুকের রচনা। রচনা যেই করুন, দলিলটিতে মিশনারী ডাফের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়।

॥ শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য ॥

উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ খ্রীঃ রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথমেই কোম্পানী কি উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেই সম্পর্কে মুখবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতে শিক্ষা-বিস্তার আমাদের পবিত্রতম কর্তব্য। এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবাসীরা যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কার্যকরী শিক্ষার নিপুণ নৈতিক ও পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। "It is one of our sacred duties to be the means, as far as in us lies of conferring upon the natives of India those vast moral and material blessings which flow from the general diffusion of useful knowledge and which India may, under providence, derive from her connection with England. (*Wood's Despatch*)

এই শিক্ষায় শুধুমাত্র উন্নততর বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশ হবে না, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন, বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারীর সৃষ্টি হবে। "Not only produce a higher degree of intellectual fitness but to raise moral character of those who partake of its advances and supply you with servants to whose probity you may with increased cofidence commit offices of trust". (*Wood's Despatch*)

এর পর বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সচেতন ক'রে তুলে ইংলণ্ডের কারখানাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় কাঁচা মালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যের যাতে ভারতের বাজারে অফুরন্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়, সেই ব্যবস্থা করা—"At the same time, secure to us large and more certain supply of many articles necessary for our manufactures and extensively consume by all classes of our population as well as an almost inexhaustible demand for the produce of British labour."

ডেসপ্যাচে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মেকলের মত নিন্দনীয় ভাষায় প্রাচ্য বিদ্যার নিন্দা নেই। প্রাচ্য বিদ্যার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও হিন্দু-মুসলিম আইনের ব্যাখ্যায় প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে মেকলের মন্তব্যের মতই ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে প্রাচ্য বিজ্ঞান ও দর্শন অজস্র ভুলে

পরিপূর্ণ—"the system of science and philosophy which forms the learning of the East abounds with grave errors."

(*Wood's Despatch*)

এই ত্রুটিপূর্ণ ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিবর্তে উন্নততর পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য—এককথায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারই সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। এই কথাই ডেসপ্যাচে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে—"The education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved art, science, philosophy, literature of Europe, in short European knowledge."

(*Wood's Despatch*)

॥ শিক্ষার মাধ্যম ॥

শিক্ষার মাধ্যম কি ভাষা হবে, সে সম্পর্কে ডেসপ্যাচে মন্তব্য করা হয়েছে, এতদিন ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দেশীয় ভাষায় ইউরোপীয় গ্রন্থসমূহের ভাল অনুবাদ নেই। ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে, এর কুফলস্বরূপ মাতৃভাষা অবহেলিত হয়েছে। সরকার মাতৃভাষাকে অবহেলা ক'রে ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করতে চায়, একথা অস্বীকার করা হয়েছে। দেশীয় ভাষা ও ইংরেজীকে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রচারের বাহনরূপে গ্রহণ করবার জন্য ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—"We look, therefore, to the English language and to the vernacular 'languages of India together as the media for the diffusion of European knowledge, and it is our desire to see them cultivated together in all schools in India of a sufficiently high class to maintain a school master possessing the requisite qualifications'." (*Wood's Despatch*)

প্রধান তিনটি বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে সমগ্র দেশের শিক্ষার আয়োজনকে সুষ্ঠু রূপ দেবার জন্য ডেসপ্যাচে একটি সুচিন্তিত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।

॥ শিক্ষাবিভাগ ॥ ডেসপ্যাচে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত বাংলা, বম্বে, মাদ্রাজ, উঃ পঃ প্রদেশ, পাঞ্জাব এই পাঁচটি প্রদেশে একটি ক'রে শিক্ষা-বিভাগ স্থাপন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিভাগের প্রধান হবেন ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্স্ট্রাকসন (Director of Public Instruction)। তাঁর অধীনে থাকবে একদল পরিদর্শক (Inspecting officers)। এই বিভাগ প্রতি প্রদেশের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করবে ও প্রতি প্রাদেশিক সরকারের কাছে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী পেশ করবে।

।। বিশ্ববিদ্যালয় ।।

দ্বিতীয় সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৪৫ খ্রীঃ কাউন্সিল অব এডুকেশন কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত সময় হয়নি বলে এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা হয়। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহের কথা বিবেচনা ক'রে কলকাতা ও বম্বে শহরে একটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। মাদ্রাজ বা ভারতের অপর যে কোন অংশে যদি উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা ডিগ্রীলাভের উপযুক্ত ছাত্র থাকে, তাহলে সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে স্থির হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে, এবং এই বিদ্যালয়ের মতই পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি সিনেট থাকবে, এতে একজন চান্সেলর, একজন ভাইস-চান্সেলর ও কয়জন সরকার-মনোনীত সদস্য থাকবেন। যদিও পরীক্ষা-গ্রহণই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, তবু অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে যে সব বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, সেই সব বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করবার সুপারিশ করা হয়।

।। জনশিক্ষা-ব্যবস্থা ।।

ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে, দেশের 'জনশিক্ষা' এতকাল সরকার অবহেলা করেছে। চুঁইয়ে-নামা নীতির নিন্দা ক'রে বলা হয়েছে, মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য এতদিন সরকার সর্বশক্তি ও অর্থ নিয়োগ করায় দেশের শিক্ষার উন্নতির ব্যাহত হয়েছে। এই বিশাল দেশের গণশিক্ষার ব্যবস্থা সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত শুধুমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। দেশের জনশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রতি জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। উঃ পঃ প্রদেশের মিঃ টমাসনের অনুসৃত পন্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবার নির্দেশ ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়। আরও বলা হয়, ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ও দেশীয় স্কুলগুলির শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষা-মানের পার্থক্য ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে।

।। গ্রাণ্ট-ইন্-এড (Grant-in-aid) প্রথা ।।

ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এককভাবে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষাবিস্তারের বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবে, যাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগী হয়ে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে শিক্ষার দ্রুত প্রসারে সাহায্য করতে পারে। এজন্য সরকার থেকে সাহায্য পাবার কতকগুলি শর্ত আরোপ করা হয়—(১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে; (২) স্থানীয় পরিচালনায় সুব্যবস্থা থাকবে; (৩) সরকারী

পরিদর্শনের অধিকার স্বীকার করতে হবে ও পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে; (৪) ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য বেতন নেওয়া হবে।

আশা করা গিয়েছিল যে, সরকার এই সাহায্যদান ব্যবস্থা চালু ক'রে ধীরে ধীরে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে জনসাধারণের হাতে এর দায়িত্ব ন্যস্ত করবে। ইংলণ্ডের সাহায্যদান-রীতির অনুকরণে শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রবৃত্তি, বিদ্যালয়গৃহনির্মাণ প্রভৃতি খাতে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথায় দেশের সর্বশ্রেণীর স্কুলই কমবেশী উপকৃত হয়েছিল, তবে মিশনারী স্কুলগুলিই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়। সাহায্য পাবার একটি শর্ত ধর্মনিরপেক্ষতা হলেও মিশনারী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের চোখ বুঁজে থাকার পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

॥ শিক্ষক-শিক্ষণ ॥

শিক্ষকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরনের নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বৃত্তির ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষকতাকে সরকারী অন্যান্য চাকরির মত আকর্ষণযোগ্য ক'রে তোলবার সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

॥ বৃত্তিশিক্ষা ॥

শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে ডেসপ্যাচে বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করবার সুপারিশ করা হয়েছে।

ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দেশ আছে। সরকারী শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ হবে, একথা নতুন ক'রে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মিশনারীদের প্রভাবে প্রতি স্কুলের গ্রন্থাগারে এক খানা ক'রে বাইবেল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উচ্চতর চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার ও নিম্নতন চাকরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিয়োগ করবার পূর্ব-ঘোষিত সরকারী নীতিকে ডেসপ্যাচে সমর্থন জানানো হয়।

॥ সমালোচনা ॥

উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একখানি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এরূপ সামগ্রিকভাবে বিচার ক'রে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা এর আগে আর কখনও হয়নি। লর্ড ডালহৌসি বলেছেন, ভারতে শিক্ষার জন্য এরূপ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক জেম্‌স বলেছেন, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে, উডের ডেসপ্যাচে তা পরিণতি লাভ করেছে, পরে যা হয়েছে তার উৎসও এখানে: "What goes before leads upto it, what follows flows from it."

শিক্ষার সর্বনিম্ন ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা-পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। ভারতীয় শিক্ষার বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে এই দলিলেই মীমাংসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ডেসপ্যাচেই প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষণ-শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব ত্যাগ ক'রে সহযোগিতামূলক নীতি অনুসরণের নির্দেশ, এই ডেসপ্যাচের উল্লেখযোগ্য অবদান। ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করায় গণশিক্ষা-প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। গ্রাণ্টের আন্দোলনের সময় থেকে ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, উডের ডেসপ্যাচে তার সমন্বয় ক'রে সর্বদলের গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়েছে।

উডের নির্দেশ যদি যথাযথরূপে পালন করা হত, তাহলে ভারতে শিক্ষার বিস্তার আরও দ্রুততর হ'ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উডের অনেক মূল্যবান নির্দেশই বহুদিন পর্যন্ত কার্যকর করা প্রয়োজন বোধ করেনি। মাতৃভাষার মর্যাদা দীর্ঘ দিন উপেক্ষিত হয়। ডেসপ্যাচে গণশিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হলেও উচ্চশিক্ষার স্বার্থে বহুদিন পর্যন্ত ভারত সরকার গণশিক্ষার বিষয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ, অনার্স কোর্সের প্রবর্তন, বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্দেশসমূহ বহুদিন অবহেলিত ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে বাহনরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কার্যকর করা হয়নি। সাহায্যদান-নীতি গ্রহণ করবার পর সরকার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবে, এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীতই হয়েছিল। শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীন হওয়ায় বহু প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরের অধীন হবার ফলে শিক্ষা-বিভাগের লাল ফিতার (Red tapism) দৌরাত্ম্যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নমনীয়তা (Flexibility) লুপ্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ডেসপ্যাচ-রচয়িতারা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে যে দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখা হত এবং ভারতীয়দের জীবনে শিক্ষার কি স্থান, সে সম্পর্কে ডেসপ্যাচে কোন বিচার করা হয়নি। প্রাচ্য ভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তাকে দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখায় আদিপর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় চিন্তা-ধারা ও অগ্রগতির ধারক ও বাহক হতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় কোন বেসরকারী সদস্যই স্থান পায় নি। উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থায় ভারতীয় মনোভাব প্রতিফলিত হবার প্রয়োজনকে এভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয়দের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে স্থান দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা

করাই কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। প্রাচী ও প্রতীচির মিলনের পথকে শিক্ষার মাধ্যমে সহজ করবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বিলাতের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করেনি।

ভারতের শিক্ষা-সম্পর্কিত একখানা মূল্যবান দলিল রচনা করতে বসে ডেসপ্যাচ-রচয়িতারা এমন বণিক্‌সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, যা অতি নিন্দনীয়। ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্ররূপে কল্পনা ক'রে ও ভারতীয়দের সরকারী দপ্তরের সুলভ কর্মচারী সৃষ্টি করবার প্রয়াসকে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারতবাসী সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এই বণিক্‌-মনোবৃত্তির জন্যই এই মূল্যবান দলিলটির সততা সম্পর্কে তৎকালীন ভারতীয়দের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঐতিহাসিক জেম্‌স এই ডেসপ্যাচকে Magna Charta of English Education in India বলে অভিনন্দিত করেছেন। ভারতের শিক্ষার অগ্রগতিতে উডের ডেসপ্যাচের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিক শিক্ষার যে রূপটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই শিক্ষাধারা ও শিক্ষাধারা-পরিচালনার কাঠামো এই ডেসপ্যাচেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' বলা বাড়াবাড়ি। ডেসপ্যাচ-রচয়িতাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা ক'রেও আমরা বলতে পারি ডেসপ্যাচ এতখানি প্রশংসার যোগ্য নয়। ডেসপ্যাচে শিক্ষানীতি সম্পর্কে নির্দেশ আছে, কিন্তু Education Charter বললে জনসাধারণের কতকগুলি অধিকারের সরকারী স্বীকৃতি বোঝায়। উডের ডেসপ্যাচে তা পাই না। ডেসপ্যাচে শিক্ষা-প্রসারের সদিচ্ছা আছে, কিন্তু সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। Mr. M. R Parnjpc বলেছেন, "But inspite of all these good features it would be incorrect to describe the Educational Despatch of 1854 as an Edcuational Charter, *i. e.* an offical paper bestowing or guaranteeing certain rights and privileges.' (*Progress of Education*, *Poona*, *July 1941*, *pp. 51-52*)

॥ স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ ॥

১৮৫৭ খ্রীঃ ভারতের তিনটি প্রদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করবার প্রথম যুদ্ধ এই সময়েই শুরু হয়। বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করবার সিপাহীদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সঙ্গে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান হয়। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভায় একটি নতুন মন্ত্রিপদের সৃষ্টি হয়। বোর্ড অব কণ্ট্রোলারের স্থানে Secretary of State for India মন্ত্রিসভার পক্ষে ভারতের শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সিপাহী যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৫৮ খ্রীঃ ২৮শে এপ্রিল বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি এলেন ব্রুক শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত এক ডেসপ্যাচে উডের নীতিকে বাতিল ক'রে দিয়ে শিক্ষা-ব্যাপারে পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বলা হয় উডের ডেসপ্যাচেই সিপাহী যুদ্ধের কারণ নিহিত ছিল। সৌভাগ্যের বিষয় ব্রিটিশ সরকার এই যুক্তি গ্রহণ করেন নি। দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে কোন্ নীতি অবলম্বন করা হবে, সে সম্পর্কে প্রথম ভারত সচিব লর্ড স্ট্যানলি একটি ডেসপ্যাচ রচনা করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ থেকে শিক্ষার কতটুকু প্রসার হয়েছে, এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী অভ্যুত্থানের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে কিনা, প্রধানতঃ এসম্পর্কেই ডেসপ্যাচে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্ট্যানলী ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতি অনুসরণ করবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা ক'রে বলেন শাসক পরিবর্তন হলেও দেশে নব-প্রবর্তিত এই শিক্ষাধারার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। স্ট্যানলির ডেসপ্যাচে শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন নতুন নীতি ঘোষিত হয়নি, শিক্ষা-সংস্কারের জন্য কোন বিশেষ প্রস্তাবও তিনি উপস্থিত করেননি। অতীতে যা ঘটেছে, তার পর্যালোচনা ক'রে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন প্রস্তাব করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু করা হয়নি, একথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। স্ট্যানলী বলেন, গ্রাণ্ট ইন-এড প্রথা ইংরেজী ও ইঙ্গ-বঙ্গ মিশ্র স্কুলগুলির উন্নতির সহায়ক হলেও এ দেশে গণশিক্ষা-প্রসারের পক্ষে এই নীতি সহায়ক নয়। তাই সরকারকে এই নীতি পরিহার ক'রে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি বাধ্যতা-মূলক শিক্ষাকর ধার্যের নির্দেশ দেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে ভারত সরকারকে নিষেধ করা হয়।

। সমালোচনা ॥

স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে শিক্ষানীতি বিষয়ক কোন নতুন প্রস্তাব নেই, তবুও উডের নীতিকে সমর্থন জানিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করবার সহায়তা করেছিল। স্ট্যানলীর সমর্থন না থাকলে উডের নীতিকে বাতিল করার প্রস্তাবই হয়ত কার্যকর হত। প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক স্ট্যানলীর প্রস্তাব তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় বিতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ চলছিল স্ট্যানলী বেসরকারী পরিচালনার আস্থাবান ছিলেন না বলেই বোধ হয় উডের নির্দেশিত গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সরকারী পরিচালনার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, এই প্রথায় স্থানীয় জনসাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহী হবে না। মিঃ টমাসন উঃ পঃ প্রদেশে গণশিক্ষা-বিস্তারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেই নীতি অনুসরণ ক'রেই তিনি সর্বত্র শিক্ষাকর ধার্যের নির্দেশ দেন। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার সবে-মাত্র চালু হয়েছিল, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই সাহায্যদান-নীতি কতটা শিক্ষা-বিস্তারের

সহায়ক হবে বা কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করবে, তার বিচারের সময় তখনও আসেনি। উপযুক্ত সময় না দিয়ে হঠাৎ এই প্রথাকে বাতিল ক'রে দেওয়া খুব যুক্তিসঙ্গত হয় নি। উডের ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল, এত বড় দেশের শিক্ষার সকল দায়িত্ব একা সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষা-প্রসার দ্রুততর করবার জন্যই বেসরকারী প্রচেষ্টাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই নীতির সারবত্তা স্ট্যানলী উপলব্ধি করতে পারেন নি। শিক্ষা-বিস্তারে বেসরকারী প্রচেষ্টার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে—ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রথম সম্ভব হয়েছিল। সরকারী ও বেসরকারী এই দুই প্রচেষ্টার মধ্যে কোন বিরোধ না রেখে এই দুয়ের সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। যে সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগী বিত্তবান ব্যক্তি গণশিক্ষার প্রসারে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের উৎসাহ দিয়ে গণশিক্ষার ব্যাপক আয়োজনকে সার্থক ক'রে তোলবার মধ্যেই সরকারী নীতির সার্থকতা, একথা স্ট্যানলী বুঝতে পারেন নি। ভারতে একটা নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ দুয়েরই প্রয়োজন ছিল। ইংলণ্ডের অবস্থার সঙ্গে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রেই প্রাথমিক শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা স্ট্যানলীর উচিত ছিল। গ্রান্ট-ইন-এড প্রথা বন্ধ ক'রে দেবার নির্দেশ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তির ও বিতর্কের সৃষ্টি করে, তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়, এবং নতুন ক'রে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথা ও প্রাথমিক শিক্ষানীতি নিয়ে বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সপ্তম অধ্যায়

উডের ডেসপ্যাচ থেকে হাণ্টার কমিশন (১৮৫৪-১৮৮২)

উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। পরবর্তী প্রায় ৭০ বছর কাল ভারতের সরকারী শিক্ষানীতি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে এই ডেসপ্যাচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতে যে শিক্ষার কাঠামো উডের নির্দেশ অনুসারে গড়ে ওঠে, শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত আমরা তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। ১৮৫৪ খ্রী: থেকে ১৯০৪ খ্রী: লর্ড কার্জনের সময় পর্যন্ত ভারতের শিক্ষানীতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। ১৮৮২ খ্রী: শিক্ষা-কমিশন প্রধানত: উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশসমূহ কার্যকর করতে গিয়ে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেই সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবার জন্য গঠিত হয়েছিল। উডের নির্দেশ ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে কার্যকর করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় দেশের শিক্ষার বিভিন্ন দিকে প্রসারলাভ ঘটে। একটি সর্ব-ভারতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হবার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষানীতির মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে একটা সর্বভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

॥ শিক্ষা-বিভাগ ॥

উডের নির্দেশ অনুসারে প্রতি প্রদেশে একটি ক'রে শিক্ষা-বিভাগ (Education Department) সৃষ্ট হয়। শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর দেওয়া হয়। শিক্ষানীতি সম্পর্কে উপদেশ, শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অর্থব্যয়, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুলগুলির পরিচালনা, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলসমূহের পরিদর্শন, প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কীয় যাবতীয় বিবরণী প্রকাশ ও শিক্ষার উন্নতির জন্য পরামর্শ দেবার দায়িত্ব এই বিভাগ গ্রহণ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত এই দপ্তরের উচ্চ পদগুলিতে নিয়োগ ইউরোপীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা-দপ্তরের ভারতীয়করণের কোন দাবীই সরকার গ্রাহ্য করেনি। শিক্ষাদপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের হার খুব কম ছিল না, তাহ সত্ত্বেও থেকে কোন উপযুক্ত লোক এই বিভাগে চাকরি নিয়ে আসত না। অতি সাধারণ পর্যায়ের লোক দিয়ে এই বিভাগটি পরিচালিত হত। এর কুফল দেশের

সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্ট হবার পর থেকেই ভারতীয়দের শিক্ষা বিভাগে নিয়োগের দাবী তীব্রতর হয়ে ওঠে। ভারতীয় মনোভাব শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হবার সুযোগদান ও জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সংরক্ষণের উপযোগী উদার মনোভাব ইউরোপীয় কর্মচারীদের কাছে প্রত্যাশা করবার উপায় ছিল না। ১৮৯৬ খ্রীঃ 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে'র সৃষ্টি হয়। সর্বভারতীয়ভাবে শিক্ষা-বিভাগে উপযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মী-নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করার দায়িত্ব বিলেতে ভারত সচিবের দপ্তর গ্রহণ করে। এই সময়ে শিক্ষা-বিভাগে উচ্চতম পদের জন্য বেতনের উচ্চ হার নির্ধারিত হয়। ভারতীয়দের এই পদে নিয়োগের আইনগত কোন বাধা ছিল না, কিন্তু বিলেতে গিয়ে শিক্ষা-বিভাগের জন্য চাকরির উমেদারী করবার লোক তখন এদেশে কমই ছিল। শিক্ষা-বিভাগের বড় চাকরিগুলি এর ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। সরকারের এই নীতি ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। সরকারকে এজন্য ভারতীয়দের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

॥ শিক্ষার প্রসার ॥

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবার পূর্ব পর্যন্ত প্রধানতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশের শিক্ষা-বিস্তারের কাজ এগিয়ে চলছিল। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রাধান্যই দেখা যায়। এই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তখন থেকেই তাঁরা এগিয়ে আসেন দেশের শিক্ষা-প্রসারের কাজে। ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত দেশীয় প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য না হলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশের শিক্ষা-মানচিত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় মিশনারীরা ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হতে থাকে এবং সেই স্থান পূর্ণ করে দেশীয় শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টা। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এদেশে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এঁদের উৎসাহ ও উপদেশ দেশীয় শিক্ষানুরাগীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পক্ষে বহুক্ষেত্রে সহায়ক হয়। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এই সময়ে বেশী ছিল না। দেশের জনশিক্ষার প্রধান দায়িত্ব তখন পর্যন্ত দেশীয় পাঠশালাগুলির উপরই ন্যস্ত ছিল। যদিও এই পাঠশালার শিক্ষা-ব্যবস্থা বহু ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তবুও জনশিক্ষা-বিস্তারের জন্য পল্লী বাংলার এই পাঠশালাগুলিই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোম্পানীর শাসন লোপ পাওয়ায় সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা-প্রসারের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। নতুন শাসন-ব্যবস্থায় কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পথে আইনগত অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪-১৯০২ খ্রীঃ মধ্যে জনশিক্ষা-বিস্তারের প্রধান বাহন দেশীয় পাঠশালাগুলিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উডের ডেসপ্যাচে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সংস্কার ক'রে বাঁচিয়ে রাখবার সুপারিশ থাকলেও কেন্দ্রীয়

সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহের অভাবে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ একটি সুপ্রাচীন শিক্ষাধারা দেশের বুক থেকে মুছে যাবার উপক্রম হয়।

।। মিশনারী প্রচেষ্টা ।।

১৮৫৪ খ্রীঃ শিক্ষা ডেসপ্যাচে মিশনারীদের প্রভাব সুস্পষ্ট। সরকার শিক্ষা-পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াবে এবং বেসরকারী পরিচালনায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে, এতে মিশনারী নীতিরই জয় ঘোষিত হয়েছিল। এই সময়ে দেশে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। মিশনারীরা ভাবল গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথায় তারা সবচেয়ে লাভবান হবে। সরকার শিক্ষা-পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মিশনারীরাই হবে একচ্ছত্র অধিনায়ক—এতে তাদের উল্লসিত হবারই কথা। কয়েক বছর মিশনারীরা পূর্ণোদ্যমে শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হল— শিক্ষা-বিভাগ মিশনারীদের মধ্য থেকে স্কুল পরিদর্শক পর্যন্ত নিযুক্ত করলেন, সবদিক থেকেই অবস্থা মিশনারীদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী-যুদ্ধের ফলে মিশনারীদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, মিশনারীদের আর উৎসাহ দেওয়া হবে না। ভারত সরকার কঠোরভাবে ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতিকে মেনে চলবে। মিশনারীরা এই নীতির বিরোধিতা করতে ত্রুটি করেনি। রাজনৈতিক দিক্ থেকে বাস্তব অবস্থার বিচার ক'রে মহারাণীর ঘোষণায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কথাই ঘোষণা করা হয়।

আলোচ্য যুগে এরপর মিশনারীরা তাদের কাজে সরকার থেকে আর তেমন কোন উৎসাহ পায় নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী যে চিরদিনই মিশনারী প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের বিরূপ মনোভাব মিশনারীদের সামনে এক কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করল। সরকারী সাহায্য পেতে হলে শিক্ষা-বিভাগের অধীনে থাকতে হবে, অথচ শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শকদের সম্পর্কে মিশনারীদের অভিযোগ ছিল হয় এরা ধর্মনিরপেক্ষ ইংরেজ, না হয় অখ্রীস্টান ব্রাহ্মণ। এদের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের আশা করা বাতুলতা। এছাড়া, শিক্ষাবিভাগ থেকে যে সব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছিল, তা খ্রীস্টান আদর্শ-প্রচারের পক্ষে সহায়ক নয়। এইসব বই পাঠ্য করলে বহু শ্রমে ও অর্থব্যয়ে মিশনারীরা যে সব বই প্রকাশ করেছিল, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সরকারী পরিদর্শক পরিচালিত পরীক্ষা ও সরকারী পরিদর্শন এ দুই'ই মিশনারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কিন্তু সরকারী অর্থসাহায্য পেতে হলে এ সবই মেনে নিতে হয়, না হয় শিক্ষা-বিভাগ থেকে সব সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে স্বাধীন প্রচেষ্টায় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ বেসেল মিশনারী সোসাইটি শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজে নামল। কানাড়া ও মালাবার অঞ্চলে এই সোসাইটির ব্যাপক প্রভাব ছিল। মিশনারীরা ভেবেছিল, তারাই ধীরে ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করবে। শিক্ষা-বিভাগ মিশনারী

প্রতিষ্ঠানের নিকটে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করায় বেসেল সোসাইটির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। এই অসম প্রতিযোগিতার বিষম ফল বুঝতে পেরে এরা ইংলণ্ডে আন্দোলন শুরু করল যে, ১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ ভারত সরকার যথাযথরূপে পালন করছে না। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারি অপসারণ-নীতিকে বর্জন করা হয়েছে। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিশনারীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সরকারী পরিচালনায় ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থায় ভগবান নির্বাসিত হয়েছে। এই বিরোধ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, ভারত সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির পর্যালোচনার জন্য ১৮৮২ খ্রীঃ ভারতীয় শিক্ষাকমিশন নিয়োগ করতে হয়।

শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে বিরোধের মাঝেও মিশনারীগণ ভারতে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কলিকাতা ও বম্বের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৬০ ও ১৮৬৯), লাহোরে ফোরম্যান কলেজ (১৮৬৫), লক্ষ্ণৌ-এ রীড কলেজ (১৮৭৭), দিল্লীতে সেণ্ট স্টিভেন্‌স কলেজ (১৮৮২) এই সময়ে স্থাপিত হয়। মিশনারীরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাদের প্রচেষ্টাকে কিছুটা অপসারিত ক'রে স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষা বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করেন। পল্লীর নিম্নবর্ণের স্ত্রীপুরুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সরকারী ঔদাসীন্যের জন্য কিছুই করা হয় নি। মিশনারীরা শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্য এই অবহেলিত ক্ষেত্রই বেছে নিল। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে মিশনারীদের প্রভাবের ফলে দেশীয় খ্রীস্টানের সংখ্যা আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১-৭৪ খ্রীঃ মধ্যে ধর্মান্তরিতদের হার ২২% বেড়ে যায়। এই সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার জন্য বহু প্রাথমিক স্কুল মিশনারীরা স্থাপন করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ মিশনারী পরিচালিত স্কুলে ১০,০০০ ছাত্র শিক্ষা পেত, এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিল মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। ১৮৮২ খ্রীঃ এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দ্বিগুণ হয়। এই সময়ে মিশনারী স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যার অর্ধেকই ছিল প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র।

।। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ।।

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে ভারত সরকার কলকাতা, মাদ্রাজ ও বম্বে শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। কলকাতা ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এর পূর্বেও চেষ্টা হয়েছিল। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত সময় হয়নি বলে সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশনের ভূতপূর্ব সভাপতি মিঃ ক্যামেরন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ও আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী উত্থাপন করেন। অবশেষে উডের নির্দেশের ফলে ১৮৫৭ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বম্বে শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র প্রায় একই রকম ছিল। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা

অর্জন করেছে, পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মান নির্ণয় এবং তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ডিগ্রি দিয়ে পুরস্কৃত করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ হবে। "Ascertaining by means of examination, the persons who have acquired proficiency……rewarding them by Academic Degrees, as evidence of their respective attainments."

বিশ্ববিদ্যালয় গঠন আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল সিনেটের উপর। সিনেট একজন চ্যান্সেলর, একজন ভাইস চ্যান্সেলর ও ফেলোদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রাদেশিক গভর্ণরগণই চান্সেলর হতেন, তিনি দুই বছরের জন্য বেতনভুক ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত করতেন। ফেলোরা সকলেই হতেন সরকার-মনোনীত। ফেলোদের মধ্যে কেহ কেহ পদাধিকার বলে (ex-officio) সিনেটের সভায় আসতেন। যেমন, বিভিন্ন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ইত্যাদি, বাকী সদস্য গভর্ণর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করতেন। এঁরা ছিলেন আজীবন সদস্য (life member)। গভর্ণর বিভিন্ন সময় এরূপ সদস্য মনোনীত করতেন বলে ফেলোর সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। প্রথমতঃ আইন, চিকিৎসা, কলা, এঞ্জিনীয়ারিং এই চারটি ফ্যাকলটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়, পরে বিজ্ঞান সংযোজিত হয়। মাদ্রাজ ও বম্বে এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা নিজ নিজ প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার লাভ করতে হলে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষায় পাশ করতে হত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই বি. এ. পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। কিছুদিন বাদে এফ. এ. (First Arts) পরীক্ষা চালু হয়। বি. এ.-তে অনার্স পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। একসঙ্গে এক, দুই, এমনকি, তিনটি বিষয়ে পর্যন্ত অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যেত।

উচ্চশিক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমেই দেওয়া হত। পরীক্ষাও ইংরেজীতেই হত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষা চিরদিনিই অবহেলিত ছিল। প্রথম কিছুকাল মাতৃভাষার পরীক্ষা নেওয়া হত, কিন্তু পরে তাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। মাতৃভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করার ফলে যে-কোন বিষয় শেখার বাধা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিল। খুব কম শিক্ষার্থীর পক্ষেই ইংরেজী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত ক'রে অন্য বিষয় শেখা সম্ভব হত। পরীক্ষা-পাশই যেখানে বিদ্যার মাপকাঠি, সেখানে যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষায় পাশই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। জ্ঞান কতটা হল, সেদিকের থেকে মুখস্থ ক'রে পরীক্ষায় পাশ করাটাই মুখ্য হল। পাশের সহজতম পন্থা হিসাবে নোট বইয়ে বাজার ছেয়ে গেল। লর্ড কার্জন এক সময়ে বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন, "আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনই যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা বুদ্ধির চর্চা না ক'রে স্মৃতির চর্চা করাটাই বেশী পছন্দ করে।" এটা যে মাতৃভাষা অবহেলারই ফল, কার্জন সাহেব তা বিচার ক'রে দেখা দরকার বোধ করেন নি।

প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-আইনের অনেক ত্রুটি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সিনেটের উপর, কিন্তু সিনেটের সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট না হওয়ায় সদস্যসংখ্যা এত বেড়ে যায়, যার ফলে কাজ চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, শিক্ষার সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্কই নেই, শিক্ষা-সমস্যা যারা বুঝত না, বা এ নিয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন বোধ করত না, এসব লোকই সিনেটের সভায় ভীড় বাড়াত। কাজকর্মের সুবিধার জন্য সিনেটের এক প্রস্তাবের বলে সিণ্ডিকেট নামে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির আইনের চোখে কোন স্বীকৃতি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত হওয়ায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। পরীক্ষা-গ্রহণ আর ডিগ্রী দেওয়া—এ ছাড়া শিক্ষার উন্নতি বা শিক্ষা-প্রসারের কোন দায়িত্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের রইল না। উডের ডেসপ্যাচে পরীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হলেও যে সব বিষয়ে অন্যত্র উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির নির্দেশ ছিল।

ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ আংশিক-ভাবে পালন করেছিল মাত্র। শিক্ষাদানই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একথা বিবেচনা করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সামনে থাকতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনুমোদন-ধর্মী (Affiliating University) বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন যে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা বোঝা দুষ্কর। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, যে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলাম, সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনকারী রূপ ১৮৫৮ খ্রীঃ "অকেজো" বলে পরিত্যাগ করা হয়। আর এক বছর বাদে যদি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সু-সংস্কৃত রূপটিকেই আমরা আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গঠনে, ইংরেজ যাকে অনুপযুক্ত বলে ত্যাগ করল, আমাদেরকে তাই গ্রহণ করতে হ'ল আমাদের আদর্শরূপে।

সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় এই সময়ে উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষায় ২৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬২ জন পাশ করে। ১৮৫৮ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দু'জন পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান খুব উঁচু ছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ ব্রিটিশ ভারতে ৭৪২৯ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, তার মধ্যে মাত্র ২,৭৭৮ জন পাশ করে। স্যার জর্জ ট্রেভেলিয়ান এদেশের উচ্চ শিক্ষিতদের সম্পর্কে বলেছেন, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা গ্রীসের এথেন্স বা আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীদের মত অদম্য জ্ঞানপিপাসু ছিল। তরুণ বালকেরা এডিসনের মত লিখতে পারত, আর জনসনের মত বাক্পটু ছিল—The upper classes

sought after wisdom as eagerly and insatiably as the Greeks of Athens or Alexandria. Young Brahmins wrote like Addison and talked like Samuel Johnson."

১৮৬৫ খ্রীঃ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার Indian Society for the Cultivation of Science-এর (১৮৭২) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে বহু নতুন সরকারী ও বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় সরকারী পরিচালনায় প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। মাদ্রাজ হাই স্কুল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ লাহোর ইউনিভার্সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষার উৎসাহদান এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল। উঃ পঃ প্রদেশের গভর্নর স্যার উইলিয়ম মুর ১৮৭২ খ্রীঃ এলাহাবাদে সেণ্ট্রাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টায় এতদিন মিশনারীদেরই প্রাধান্য ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ নাগাদ অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন হয়। ভারতীয় বিত্তশালীদের প্রচেষ্টায় দেশের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার কথা এখানে বলা হল। ১৮৬৪ খ্রীঃ লর্ড ক্যানিং-এর স্মৃতিরক্ষার্থে অযোধ্যার তালুকদারগণ ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁয়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারের জন্য আলিগড়ে ১৮৭৫ খ্রীঃ মোহামেডান-অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজকে কেন্দ্র ক'রেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। মাদ্রাজে পচায়াপ্পা কলেজ, ভিজাগাপট্টম কলেজ, টিনাভেলি কলেজ ভারতীয় প্রচেষ্টার নিদর্শন। কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন স্কুল ১৮৭৯ খ্রীঃ কলেজে পরিণত হয়। এই বছরই সিটি স্কুল স্থাপিত হয়ে পরে কলেজে রূপায়িত হয়। আলবার্ট স্কুলও কলেজে উন্নীত হয়েছিল, কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। দেশীয় রাজন্যবর্গের পরিবারস্থ ছেলেদের শিক্ষার জন্য রাজকোট কলেজ (১৮৭০), আজমীর মেয়ো কলেজ, ইন্দোর ডালিকলেজ এবং লাহোরে একটি কলেজ স্থাপিত হয়।

১৮৫৭ খ্রীঃ থেকে ১৮৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত কলেজীয় শিক্ষার কিরূপ প্রসার হয়েছিল, নিম্ন পরিসংখ্যান থেকে সে সম্পর্কে একটা ধারণা হবে :—

১৮৫৭ খ্রীঃ কলেজের সংখ্যা

প্রদেশ	কলেজ ১৮৫৭
বাংলা	১৫
বম্বে	৩
উঃ পঃ প্রদেশ	৫
মাদ্রাজ	৪
	২৭

কলেজীয় শিক্ষার প্রসার

১৮৫৭—১৮৭১-৭২ খ্রীঃ

প্রদেশ	ইংরেজী আর্টস কলেজ	পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা :—		
		এফ. এ.	বি. এ.	এম. এ.
মাদ্রাজ	১২	৭৮৪	১৫২	৬
বম্বে	৪	২৪৪	১৬৬	২৮
বাংলা	১৭	১৪৯৫	৫৪৮	১১২
উঃ পঃ প্রদেশ	৯	৯৬	২৬	৫
পাঞ্জাব	৪	৪৭	৮	×
মোট	৪৬	২৬৬৬	৮৫০	১৫১

১৮৭১-৭২ খ্রীঃ—১৮৮১-৮২ খ্রীঃ

প্রদেশ	ইংরেজী আর্টস কলেজ	পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা		
		এফ. এ.	বি. এ.	এম. এ.
মাদ্রাজ	২৫	২০৩২	৮৯০	২১
বম্বে	৬	৭০৯	৩৭০	৩৪
বাংলা	২২	২৬৬৬	১০৩৭	২৮৪
পাঞ্জাব	৯	৩৬৫	১৩০	৩৩
উঃ পঃ প্রদেশ	২	১০৭	৩৭	১১
মধ্য প্রদেশ	১	৯০	×	×
মোট	৬৫	৫৯৬৯	২৪৩৪	৩৮৫

*Report of the Indian Education Commission, 1882-83.

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচের পর থেকে দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সং আশাতীত রূপে বেড়ে যায়। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য নব-সৃষ্ট শিক্ষা-বিভ দেশের সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়-স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত শিক্ষা-বিভা শক্তি ও অর্থ প্রধানতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা-বিস্তারেই নিবদ্ধ থাকে। পরবর্তী কালে সরকা নীতির কিছু পরিবর্তন হয়ে ছিটে-ফোঁটা কৃপা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বর্ষিত হয়। ত মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার নীতি সরকার ত্যাগ করেনি। ১৮৫৫ যেখানে সরকারের পরিচালনায় ১৬৯টি মাধ্যমিক স্কুলে ১৮,৩৩৫ জন শিক্ষার্থী ছি সেখানে ১৮৮২ খ্রীঃ সরকার-পরিচালিত ১৩৬৩টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ৪৪,৬০৫ জন হ

প্রত্যক্ষ সরকারী পরিচালনা ছাড়াও সরকারী সাহায্যে বেসরকারী উদ্যমে

স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুগে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় পরিচালনার প্রাধান্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতদিন পর্যন্ত বেসরকারী ক্ষেত্রে মিশনারী প্রাধান্তই বজায় ছিল, ১৮৫৪ খ্রীঃ পর থেকে পট পরিবর্তিত হয়, এবং ভারতীয়রাই অধিক সংখ্যায় মাধ্যমিক স্কুল-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। ভারতীয় প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। ১৮৮২ খ্রীঃ ভারতীয় পরিচালনাধীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩৪১টি। এই বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,৩৬,৮৩৭ জন। এই সময়ে অভারতীয়দের পবিচালনাধীনে বিদ্যালয় ছিল ৭৫৭টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,৮৬,৮৭৭ জন।

।। মাধ্যমিক শিক্ষার কয়েকটি সমস্যা ।।

বেসরকারী ভারতীয় পবিচালনায় অত্যল্পকালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রশংসনীয়রূপে বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর ফল সর্বত্র শুভ হয়নি। বেসরকারী পরিচালনায় যে সব স্কুল সবকাবী সাহায্য গ্রহণ করত না, সেই সব স্কুল সবকারী নিয়ন্ত্রণের বাইবে ছিল। কোনরূপ পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকায় সর্বত্র শিক্ষাব মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা, তা দেখবাব কোন ব্যবস্থাই ছিল না, এতে 'শিক্ষামানে'র কিছুটা অবনতি ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৃষ্ট হবার পব থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা, পাঠক্রম নির্ধারণ, শিক্ষার মাধ্যম স্থির কবা প্রভৃতি সবকিছুই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করত। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা বিদ্যালয়েব শিক্ষাব মুখাপেক্ষী হয়ে উঠল। প্রবেশিকা পরীক্ষা বিদ্যার্থীকে কলেজে প্রবেশের ছাড়পত্র দিত; কিন্তু জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, তা বিচাব ক'বে শিক্ষা দেওয়া হত না। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন বৃত্তিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকায় পুঁথিগত বিদ্যানির্ভর বিদ্যালয়গুলি কেরানি-তৈরিব কারখানায় পরিণত হল। সরকারী গোলামখানায় শিক্ষিত বেকারদের ভীড় বাড়তে লাগল, এদিকে সরকারী চাকরির সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। সমাজ-জীবনে দেখা দিল শিক্ষিত বেকার-সমস্যা বলে এক নতুন সমস্যা। এই শিক্ষিত বেকাব-সমস্যার অভিশাপ থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারি নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর থেকে মাতৃভাষার নির্বাসনের পর ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্র থেকেও মাতৃভাষা নির্বাসিত হয়। ইংরেজীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় ছাত্রদেব সবটুকু শক্তিই ইংরেজী শিখতে ব্যয় হয়ে যেত। এরপর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার মত শক্তি আব অবশিষ্ট থাকত না। পাশ্চাত্ত্য ভাষা আমরা শিখলাম, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের নাগালের বাইবেই রয়ে গেল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ব্যতীত সকল বিষয়ে মাতৃভাষায় উত্তর দেওয়া যেত। এর পর বছর থেকে মাতৃভাষা ব্যতীত সব বিষয়ের উত্তরই ইংরেজীতে দিতে হত। ১৮৮২ খ্রীঃ সব প্রদেশেই ইংরেজী ভাষা মাধ্যমিক

শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে বহু গলদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার সূচনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই ভ্রান্ত নীতির গ্রহণের ফলেই হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি ছিল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলেও প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত শিক্ষকদের শিক্ষার কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে মাদ্রাজ (১৮৫৬) ও লাহোরে (১৮৮০) মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এদের শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practice Teaching) সম্পর্কে হাতে-কলমে কাজ শেখানোর কোন বন্দোবস্ত ছিল না। শিক্ষানীতি সম্পর্কীয় পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে এদের ট্রেনিং সীমাবদ্ধ ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার মান যে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, তার অন্যতম কারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী অবহেলায় প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এডামের পরিকল্পনা অবাস্তব বলে পরিত্যক্ত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর মিঃ টমাসনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেখানে একটা প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মিঃ টমাসন এখানে এডামের পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সরকারী নীতি ছিল উচ্চ শিক্ষাকে উৎসাহিত করা, আর এই জন্যই সরকারী অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হচ্ছিল। ১৮৫৪ খ্রীঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৩৬,০০০ জন ছাত্র শিক্ষার সুবিধা লাভ করেছিল। মিশনারীদের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-সংখ্যা ছিল এই সংখ্যার দ্বিগুণ। উডের ডেসপ্যাচে গণশিক্ষার জন্য ভারত সরকারকে অধিকতর তৎপর হতে বলা হয়। সরকারের পক্ষে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে যথাসম্ভব বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকার হতে অর্থসাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার নির্দেশ ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়। এই নির্দেশ অনুসারে সব প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু কিছু কাজ শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় সাহায্যদানের মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার নীতি গ্রহণ ক'রে কাজ শুরু হবার কিছুদিন বাদেই লর্ড স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে পূর্বনীতি পরিহারের নির্দেশ এল। সাহায্যদান প্রথা পরিত্যাগ ক'রে স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার সব দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে বলা হল। এই নির্দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কোন কোন প্রদেশে উডের নীতি অনুসরণ ক'রে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা উডের নির্দেশ মতই কাজ চালিয়ে যেতে চাইল। কোন কোন প্রদেশে বিশেষ ক'রে বম্বে প্রদেশে স্ট্যানলীর নির্দেশ কার্যকর করা হল। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটিও একটি

বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্ট্যানলী প্রাথমিক শিক্ষাব ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর ধার্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মিঃ টমাসন এর পূর্বেই সেখানে এডুকেশন সেস্ ধার্য করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অজুহাতে এই নির্দেশ গ্রহণ করতে রাজী হল না। উডের নির্দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল। স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচের ফলে এই সম্ভাবনাকে আর কার্যকরী করা সম্ভব হল না। প্রদেশগুলি নিজ নিজ নির্বাচিত নীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রসর হল।

॥ মাদ্রাজ ॥

মাদ্রাজ সরকার গণশিক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে কোন দিনই বিশেষ সচেতন ছিল না। দক্ষিণ ভারতে মিশনারীদের সঙ্গে সরকারী সহযোগিতায় প্রথম যুগে শিক্ষা-বিস্তারে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, তার ফলে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব মিশনারীদের হাতেই ছিল। স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হলেও মাদ্রাজ সরকার বেসরকারী শিক্ষাপ্রচার-প্রচেষ্টাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ও উৎসাহিত করবার নীতিই গ্রহণ করে। ১৮৬৮ খ্রীঃ পরীক্ষার ফল বিচার ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কিছু সাহায্য করবার (Payment by result) ব্যবস্থা করা হয়। যদিও মাদ্রাজ সরকার প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগেই নির্ভরশীল ছিল, তবুও যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের অভাব ছিল, সেখানেই সরকারের তরফ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনাধীনে ১,২৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৬,৯৭৫ জন ছাত্র ছিল। সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩,২২৩টি, এতে ছাত্র ছিল ৩,১৩,৬৬৮ জন। এই দুই শ্রেণীর বিদ্যালয় ছাড়াও সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে দেশীয় পাঠশালার সংখ্যা ছিল ২,৮২৮টি, আর এখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৫৪,০৬৪ জন।

॥ বম্বে ॥

বম্বে প্রদেশে প্রথম থেকেই সরকারী পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। সরকার শিক্ষা-বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের পক্ষপাতী ছিল। এই নীতি অনুসৃত হবার ফলে এই প্রদেশের দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সরকার থেকে কোন সাহায্য বা উৎসাহ পায়নি। যদিও দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলি সরকারী সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিল, তবুও দেখা যায় ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ দেশীয় ৩,৯৫৪টি বিদ্যালয়ে ৭৮,২০৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা পেত। দেশীয় বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাত্র ৭৩টি বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য দেওয়া হত। বম্বে প্রাদেশিক সরকারের এই বিরূপ মনোভাবের জন্য এডুকেশন কমিশন মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে সাহায্য করা সম্পর্কে বম্বে শিক্ষা-বিভাগ স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রিয় নীতির অনুসরণ করছে।

॥ বাংলা ॥

এডামের বিবরণীতে ও তৎকালীন সরকারী কর্মচারীদের মন্তব্য থেকে জানা যায়, বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে গ্রাম্য পাঠশালাগুলি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ খুব বেশী না থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই দেশীয় পাঠশালাগুলি সংস্কার ক'রে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আয়োজন চলছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর মিঃ টমাসনের নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৮৪৩ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসি বাংলার শিক্ষা-বিভাগকে মিঃ টমাসনের পরিকল্পনার অনুরূপ এক শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করবার নির্দেশ দেন। এই সময়ে বাংলার ছোটলাট ছিলেন ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটি পরিকল্পনা-রচনার জন্য অনুরোধ করেন। হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা শিক্ষা-প্রচারের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করেন। ছোটলাট বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত একটি 'মিনিটে' ব্যক্ত করেন। তিনি এই মিনিটের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিকল্পনা পাঠিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত পরিকল্পনার সরমর্ম এখানে দেওয়া হল।

॥ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনা ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, ... না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না"।

"কেবল লিখন-পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে। এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ-বিদ্যা, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

"একজন শিক্ষক হলে চলবে না, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দু'জন ক'রে শিক্ষক দরকার। স্কুলগুলিতে সম্ভব হলে তিনটি থেকে পাঁচটি ক'রে শ্রেণী থাকবে। কাজেই একজন শিক্ষক দ্বারা কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে চলবে না।

"গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে পণ্ডিতদের বেতন কমপক্ষে তিরিশ অথবা কুড়ি টাকা হওয়া দরকার।......প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা বেতনে একজন ক'রে হেড পণ্ডিত নিযুক্ত করতে হবে।

"হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারটি জেলা বর্তমানে আমাদের কাজের জন্য নির্বাচিত করতে হবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত বলে মনে হয়। চারটি জেলার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয়গুলি ভাগ ক'রে দিতে হবে। নগর ও গ্রামে বিদ্যালয়গুলি যেখানেই স্থাপিত হবে, দেখতে হবে তার কাছাকাছি যেন কোন ইংরেজী স্কুল বা কলেজ না থাকে। ইংরেজী স্কুল বা কলেজের আশে পাশে বাংলা শিক্ষাযোগ্য সমাদর পাবে বলে মনে হয় না।

"কেবল বিষয়ের জন্যই বিদ্যা অর্জন করার মত মনোভাব সাধারণ দেশবাসীর

খনও হয়নি। এইজন্য ছোটলাট হাডিঞ্জের প্রস্তাব, যা এতদিন চাপা ছিল, বিশেষ ভাবে কাজে লাগানো দরকার।

"যাতায়াতের ব্যয় সমেত মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে দু'জন বাঙ্গালী পরিদর্শক রাখা প্রয়োজন। একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর একজন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য। তাঁদের কাজ হবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজন-মত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করা।

"সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন, এজন্য তাঁকে কোন পারিশ্রমিক দিতে হবে না......কর্তৃপক্ষের উপরেই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার নস্ত থাকবে।

"সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্র হয়েও বাংলা শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য নর্মাল স্কুল রূপে কাজ করবে।"

(বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—বিনয় ঘোষ)

দেশীয় পাঠশালাগুলিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন্তব্যে 'অকেজো' বলা হয়েছে। এই দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে যাতে সংস্কার ক'রে আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে। দেশীয় ও মিশনারী প্রচেষ্টায় যে সব ভাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দেবার সুপারিশও করা হয়েছে।

হ্যালিডে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি তা মোটামুটিভাবে অনুমোদন করি। আমার ইচ্ছা, তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হউক।" বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিকল্পনা পুরোপুরি গৃহীত হয়নি।

বাংলা সরকার গণ-শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চারটি জেলায় circle school system-এর প্রবর্তন করেন। এই প্রথায় একজন প্রধান গুরু কাছাকাছি কয়েকটি স্কুলের কাজ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করতেন। যথার্থ পরিদর্শক বলতে যা বুঝায়, প্রধান গুরুর কাজ ঠিক তাই ছিল না। তিনি তাঁর অধীন স্কুলগুলির উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষাও দিতেন। স্থানীয় গুরুকে যথাসাধ্য সাহায্য করাও তাঁর কাজ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় দক্ষিণ বাংলার সার্কেল স্কুলগুলির সহকারী পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর সুপারিশ-মত সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে 'পাঠশালা' নামে যে বাংলা স্কুল ছিল, সেখানে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হয়।

১৮৫৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি ক'রে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। এই বিদ্যালয়সমূহে প্রথম ছয় মাস ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হত না, পরে সম্ভব হলে বেতন নেওয়া হত। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় দক্ষিণ বাংলার বিশেষ পরিদর্শক (Special Inspector) পদে নিযুক্ত হন।

১৮৬২ খ্রীঃ স্যার পিটার গ্রাণ্ট দেশীয় গুরু মহাশয়গণ যাতে নর্মাল স্কুলে শিক্ষা নিতে উৎসাহী হয়, সেজন্য মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। গ্রাম্য পাঠশালায়

গুরু মহাশয়দের নর্মাল স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। এখান থেকে এক বছর শিক্ষা নিয়ে বের হলে মাসিক কমপক্ষে পাঁচ টাকা বেতনে তাঁদের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা হত। নর্মাল স্কুলে দেশীয় পাঠশালার লেখা-পড়ার রীতি, অঙ্ক, হিসাব, জরীপ প্রভৃতি শেখানো হত।

১৮৬১ খ্রীঃ মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হ্যারিসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়দের উৎসাহিত করবার জন্য পরীক্ষার ফলের উপর অর্থসাহায্যের প্রথা প্রবর্তন করেন। ভারতে এই বোধ হয় প্রথম 'Payment by results' প্রথার প্রবর্তন হয়। মিঃ হ্যারিসন দেশীয় স্কুলসমূহে সাহায্যদানের এই নীতি প্রবর্তনে ইংলণ্ডের নিউ ক্যাসেল কমিশনের রিপোর্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই প্রথার সাফল্যে ছোটলাট স্যার জন ক্যাম্পবেল ১৮৬৩ খ্রীঃ বাংলার শিক্ষা-অধিকর্তাকে (D. P. I.) অন্যান্য জেলায় এই প্রথা-প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। এই প্রথায় বাংলা দেশে বছরে দু'টি পরীক্ষা নেওয়া হত। প্রথমতঃ সাব সেণ্টার পরীক্ষা—এতে লিখন, পঠন, গণিত, জমিদারি ও মহাজনী হিসেবে শ্রুতিলিখন ও ব্যাখ্যার পরীক্ষা হত। পরীক্ষার ফল উচ্চ ও নিম্ন এই দু'টি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে বের করা হত। গুরু মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রতিটি ছাত্রের জন্য এক টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রতিটি ছাত্রের জন্য আট আনা ক'রে বৃত্তি পেতেন। প্রথম তিন বিষয়ে পাশ-করা প্রতিটি ছাত্রের জন্যে শিক্ষক দ্বিগুণ পুরস্কার পেতেন। যে ছাত্র হিসেবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত, তার জন্য এক টাকা ক'রে ও শ্রুতলিপি এবং ব্যাখ্যার পরীক্ষায় পরীক্ষক তুষ্ট হলে প্রতি ছাত্রের জন্য দু'টাকা ক'রে গুরু মহাশয় পেতেন। এছাড়া, স্কুলের সুপরিচালনার জন্যও সামান্য কিছু অর্থ পুরস্কারস্বরূপে দেওয়া হত।

দ্বিতীয় পরীক্ষাকে সেণ্ট্রাল পরীক্ষা বলা হ'ত, এই পরীক্ষা ছিল উচ্চতর জ্ঞানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফল বিচার ক'রে উপযুক্ত প্রার্থীকে বৃত্তি ও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হত। ১৮৭৬-৭৭ খ্রীঃ ৩,১১০টি স্কুল থেকে ১১,৪৬২ জন ছাত্র সেণ্ট্রাল পরীক্ষা দিয়েছিল। ১৮৮০-৮১ খ্রীঃ এই সংখ্যা বেড়ে ৭,৮৮৭টি স্কুল থেকে ২৬,২৯৩ জন পরীক্ষার্থী হয়। পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্যদানের প্রথা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, বাংলার অধিকাংশ স্কুলই এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। সরকারের পক্ষে সব স্কুলের দাবী পূরণ করা সম্ভব ছিল না বলে ধীরে ধীরে এই প্রথা প্রত্যাহারের নীতি গৃহীত হয়। প্রত্যাহার শুরু হবার পরও বহুদিন এই প্রথা বাংলা দেশে চালু ছিল।

বাংলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে গ্রাণ্ট-ইন এড্ (Grant-in-aid) প্রথাকে গ্রহণ করায় শিক্ষা-বিভাগের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে, বাংলার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্ব প্রধানতঃ জনসাধারণই বহন করেছে। সরকার সামান্য অর্থ সাহায্য দিয়ে জনসাধারণের এই সাধু প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছে মাত্র।

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান

(১৮৮১—৮২ খ্রীঃ)

বিভাগীয় স্কুল	২৮টি
বিভাগীয় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা	৯১৬ জন
সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল	৪৭,৩৭৪টি
ঐ ছাত্রসংখ্যা	৮,৩৫,৪৩৫ জন
সাহায্যহীন দেশীয় স্কুল	৩,২৬৫টি
ঐ ছাত্রসংখ্যা	৪৯,২৩৮ জন
সাহায্যহীন কিন্তু পরিদর্শিত স্কুল	৪,৩৭৬টি
ঐ ছাত্রসংখ্যা	৬২,০৩৮ জন

গ্রাণ্ট-ইন-এড্ প্রথায় প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সাহায্যদানের প্রথা প্রবর্তিত হলেও এই সাহায্যের হার অতি নগণ্য ছিল। প্রতি স্কুলে বার্ষিক মাত্র এগারো টাকা ক'রে সাহায্য দেওয়া হত।

প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের পথে অর্থনৈতিক প্রশ্নই প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্ট্যানলীর ডেস্প্যাচে শিক্ষাকর ধার্যের সুপারিশ করা হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর মিঃ টমাসনের শিক্ষাকর ধার্যের নীতির সাফল্যে স্ট্যানলী শিক্ষাকর ধার্যের নির্দেশ দিতে উৎসাহী হয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভূমিরাজস্বের প্রতি একশ টাকায় আট আনা হারে শিক্ষাকর ধার্য হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় কর ধার্য করা হয়। কিন্তু বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য ভূমি-রাজস্বের উপর নতুন কোন কর ধার্য করা এক সমস্যারূপে দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ পাঞ্জাবে শিক্ষাকর ধার্য হয়। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি জেলায় এই কর বসানো হয়, পরে সমগ্র প্রদেশে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। মধ্য প্রদেশে ১৮৬২-৬৩ খ্রীঃ প্রথমে শতকরা এক টাকা হারে এই কর ধার্য হয়। পরে এই হার বাড়িয়ে শতকরা দু'টাকা করা হয়। বম্বে প্রদেশে শতকরা সোয়া ছয় টাকা স্থানীয় কর ধার্য হয়, এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার জন্য পৃথক্ করে রাখা হয়। বলা বাহুল্য, স্থানীয় কর শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হত না। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার অন্যান্য ব্যয়ও এই কর থেকে করা হত। বেরারে শতকরা সাড়ে সাত টাকা ক'রে স্থানীয় কর ধার্য হয়। মাদ্রাজে টাকায় এক আনা ক'রে কর নেওয়া হত। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের এক হিসাবে দেখা যায়, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় হচ্ছিল ৭৯,০৯,৯৪০ টাকা। এর মধ্যে ১৭,২১,৬৬৮ টাকা, আসত সরকারী তহবিল থেকে। স্থানীয় কর থেকে পাওয়া যেত ২৫,৪১,৪০২ টাকা, ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে হিসেবে আসত ২০,৬৪,৭৭১ টাকা এবং অবশিষ্ট ১৫,১৮,০০৯

টাকা অন্যান্য স্থান থেকে পাওয়া যেত। এই সময়ে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় ছিল ১২,৬৭,০০০ টাকা। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বম্বে সরকার সর্বাধিক ব্যয় করত। কিন্তু এই ব্যয়ের অনুপাতে শিক্ষার প্রসার ততটা হয়নি। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাধান্য থাকায় এই প্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় একটু বেশীই ছিল। এই সময়ে বাংলা বাদে অন্যান্য প্রদেশে স্থানীয় কর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ হত।

বাংলা দেশে শিক্ষার জন্য ভূমি-রাজস্বের উপর কর ধার্য করা খুব সহজে সম্ভব হয়নি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধূয়া তুলে জমিদারেরা আপত্তি তুলল। এছাড়া দেখা গেল, পাঠশালার পড়ুয়াদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কৃষিজীবী, অবশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্র, তাই শুধুমাত্র জমির উপর শিক্ষাকর ধার্যে আপত্তি দেখা দিল। মিঃ জেম্‌স উইলসন এসময়ে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হয়ে ভারতে আসেন। তিনি বললেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাতীয় প্রয়োজনে অন্য কোন দায়ের হাত থেকে জমিদারদের অব্যাহতি দেয় না। তাই শিক্ষাকর ধার্য করার পথে বাংলায় আইনগত কোন বাধা নেই। বাংলা সরকার এ পরামর্শ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল না। ডিউক অব আর্গাইল এই বিতর্কের মীমাংসা করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় ব্যয়নির্বাহের জন্য স্থানীয় করের সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলা সরকার স্থানীয় কর ধার্য করলে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে না। কিন্তু তৎকালীন দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে তিনি খুব সাবধানতা সহকারে অগ্রসর হতে উপদেশ দিলেন। বাংলা ও বিহারে ক্রমাগত অন্নকষ্ট দেখা দেওয়ায় ১৮৭৫ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ-কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যে-কোন রূপ করের বোঝা চাপানোর বিরোধিতা করা হয়। ফলে নীতিগত বাধা অপসারিত হলেও বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় কর বা শিক্ষাকর ধার্য হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী সাহায্য-নীতির (Grant-in-aid) উপর নির্ভর ক'রেই অগ্রসর হয়।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হবার আগে শিক্ষার যে রূপটি কমিশন তুলে ধরেছেন, তা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকালে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার শোচনীয় চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। কমিশন বলেছেন :—

"The area to which our enquiries are confined, containing 8,59,814 square miles with 5,52,379 villages and towns, inhabitated by 20,26,04,080 persons, there were only 1,12,218 schools and 2,64,397 Indian children or adults at schools in 1881-82. The percentage of the boys and girls at school calculated at the rate of 15 P. C. of the population was 16·28 and 0·84 respectively".

॥ স্ত্রী-শিক্ষা ॥

স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে সরকার ছিল চিরদিনই উদাসীন। স্ত্রী-শিক্ষাপ্রসারের জন্য ১৮৫৪ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত কোন সাহায্যের ব্যবস্থাই ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টাই তারা সুনজরে দেখবে না। এই কারণে সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে সরকারের নিরপেক্ষতা-নীতির অজুহাতে সরকার স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কোন সাহায্য দেওয়া থেকে বিরত ছিল। মিশনারীদের ও কিছু সহৃদয় ইংরেজ ও ভারতীয়দের উদ্যোগে দেশে নারী-শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সরকার থেকে কোন সাহায্য বা উৎসাহ না পেলেও স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা মোটামুটি উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছিল। সমাজের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা ক'রে নারী-শিক্ষাপ্রসারের এই উদ্যোগ অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। তবুও ১৮৫৪ খ্রীঃ দেখা যায়, মাদ্রাজে ২৫৬টি নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮০০০ জন ছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে ১,১১০জন রয়েছে আবাসিক বিদ্যালয়ে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল মিশনারীদের শ্রমে ও অর্থে। বম্বে প্রদেশে এসময় ৬৫টি মেয়ে-স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৬,৫০০জন। বাংলাদেশে মেয়ে-স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৮৮টি এবং এতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৬,৮৬৯ জন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মিশনারী-পরিচালিত ১৭টি স্কুলে ৩৮৬জন ছাত্রী ছিল। সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করলে এই চিত্রটি খুব উজ্জ্বল বলে মনে হবে না। কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে মাদ্রাজ, বম্বে ও বাংলার নারীশিক্ষার যে চিত্র আমরা পেয়েছি, সেই তুলনায় এই প্রারম্ভিক সাফল্য খুব হতাশাব্যঞ্জক নয়।

১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচের পর ভারতের স্ত্রী-শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। সরকারী নিষ্ক্রিয়তার অবসানে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য ও সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় স্ত্রী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা দুইই উডের নির্দেশের পর শুরু হয়। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, নারী-শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের অর্ধাংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে শিক্ষার কোন আয়োজনই যে সার্থক হতে পারে না, উডের ডেসপ্যাচই প্রথম ভারত সরকারের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করল। ভারতীয়রা নারী-শিক্ষায় উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছে, এজন্য ডেসপ্যাচে তাঁদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা হয়েছে। নারী-শিক্ষার বেসরকারী সকল আয়োজনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে ডেসপ্যাচে রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদ আহমেদাবাদে দু'টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশহাজার টাকা দিয়েছিলেন, সে কথা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করা হয়।

সিপাহী-যুদ্ধের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষিত নিরপেক্ষ নীতি সরকারী কর্মচারীরা সামাজিক রীতিনীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত ক'রে নারী-শিক্ষা প্রচেষ্টাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। তবুও উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে সব প্রদেশেই কম-বেশী কাজ শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম থেকেই নারী-শিক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি সম্পাদক ছিলেন।

ছোটলাট হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৫-৫৮ খ্রীঃ মধ্যে তিনি ৪০টি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার থেকে এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার গ্রহণ না করায় তিনি বহুদিন চাঁদা তুলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন।

বেথুন-প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের ব্যয় ও পরিচালনার ভার ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে শিক্ষাবিভাগ গ্রহণ করে। এই সময়ে বাংলার ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-শিক্ষাপ্রসারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে এঁদের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারাই সামাজিক বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা ক'রে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে প্রথম উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশে যেরূপ ব্রাহ্মসমাজ, বম্বে প্রদেশে সেরূপ পার্শী সমাজ স্ত্রী-শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ পূর্বেই আগ্রা, মথুরা, মৈনপুরী প্রভৃতি অঞ্চলে স্কুল-পরিদর্শকদের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ বেথুন স্কুলে মেয়েদের কলেজের কাজ প্রথম শুরু হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পেতে আরও তিন বছর লেগেছিল। ১৮৭৯ খ্রীঃ পালামকোটায় সারাটুকার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণায় ১৮৮২ খ্রীঃ মহারাষ্ট্র ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি গড়ে ওঠে।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে সমাজে বিরূপ মনোভাব থাকলেও উৎসাহী সমাজহিতৈষী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় দেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকার অভাব মেটানোর জন্য কোন ট্রেনিং স্কুলের বন্দোবস্ত করা হল না। মিশনারীদের পরিচালিত ট্রেনিং স্কুল ছিল। কিন্তু হিন্দু কি মুসলিম শিক্ষিকারা সেখানে যেতে চাইত না। নারী-শিক্ষার এই ত্রুটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ব্রিস্টলের বিখ্যাত সমাজ-সেবিকা মিস মেরী কার্পেন্টার। এই মহিলা ইংলণ্ডে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হন। রামমোহন মিস কার্পেন্টারকে এই দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহী ক'রে তোলেন। তিনি এদেশে এসে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। শিক্ষিকাদের উপযুক্ত ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করবার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। এদেশের স্ত্রী-শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে হলে উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার প্রয়োজন, একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর উদ্যোগে ১৮৭০ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের জন্য ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। মিস কার্পেন্টারের চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের একটি প্রধান বাধাই যে অপসারিত হয়েছিল তাই নয়, এর সঙ্গে মেয়েদের জীবিকা-অর্জনেরও একটি দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। মিস কার্পেন্টার ভারতে স্ত্রী-শিক্ষাপ্রসারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন, তার ফলেই পরবর্তী কালে সরকার শিক্ষিকা-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে এই অভাব-মোচনে সচেষ্ট হয়। মিস কার্পেন্টারকে আমরা শিক্ষিকা-শিক্ষণ ব্যবস্থার অগ্রদূতী বলতে পারি।

সরকার যখন স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব উদাসীনতা ত্যাগ ক'রে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের উৎসাহদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ঠিক সেই সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্ত্রী-

শিক্ষা সম্পর্কীয় মনোভাব কৌতূহল-উদ্দীপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের ধারণা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার দ্বার শুধুমাত্র পুরুষ-শিক্ষার্থীদের জন্যই মুক্ত, এখানে নারীর প্রবেশাধিকার নেই। ১৮৫৭ খ্রীঃ বেলগাঁওয়ের পোস্টমাস্টার তাঁর মেয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট দরখাস্ত করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় কোডে প্রার্থীদের সম্পর্কে হী, হিস, হিম (He, His, Him) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—অর্থাৎ স্ত্রী-বাচক কোন শব্দ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি—তাই সিণ্ডিকেট জবাব দিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে মেয়েদের পরীক্ষার অনুমতি দেবার ক্ষমতা তাদেব দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, তখন কলকাতাব সিণ্ডিকেট বলল, মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের অধিকার দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে দরখাস্ত করেনি, আর অদূর ভবিষ্যতে এরূপ কোন দরখাস্ত কেউ করবে, সে সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই চন্দ্রমুখী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি চেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিপদে ফেলল। বলা বাহুল্য, চন্দ্রমুখীর দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা হয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম মেয়েদের প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি দেয়। এক বছর বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাক্ষেত্র থেকেও মেয়েদের পরীক্ষা দেবার বাধা তুলে দেওয়া হয়। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮৩ খ্রীঃ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বাধা প্রত্যাহার করে। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

উডের ডেসপ্যাচেব পর থেকে ভাবতীয় শিক্ষা-কমিশনের তদন্ত শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত দেশের নারীশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে যে তথ্য আমরা পেয়েছি, সেই তালিকা দেখলেই উনবিংশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা হবে। সবচেয়ে আশ্চযেব কথা, ১৮৫৭ খ্রীঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০।২৫ বছর সময় লেগেছিল মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার লাভ করতে।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা

(৩১ শে মার্চ ১৮৮২ খ্রীঃ)

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
কলেজ	১	৬
মাধ্যমিক স্কুল	৮১	২,০৫৪
প্রাথমিক স্কুল (শুধুমাত্র মেয়েদের)	২,৬০০	৮২,৪২০
মিশ্র প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা	×	৪২,০৭১
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৫	৫১৫
মোট	২,৬৯৭	১,২৭,০৬৬

(Report of the National Committee of Women's Education)

বেথুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি কলেজে পরিণত হয়েছিল, সেখানে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৬ জন। মধ্যশিক্ষার ৮১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারী পরিচালনাধীনে ছিল ৬টি মাত্র স্কুল। মাদ্রাজে ৪৬টি স্কুলে ৩৮৯ জন ছাত্রী, বাংলায় ২২টি স্কুলে ১,০৫১ জন ছাত্রী ও বম্বে প্রদেশে ৯টি স্কুলে ৫৩৮জন ছাত্রী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৩টি স্কুলে ৬৮ জন ছাত্রী ও পাঞ্জাবে ১টি স্কুলে ৮জন ছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য ছিল ২৬০০টি, এর মধ্যে ৬০৫টি ছিল শিক্ষাবিভাগের পরিচালনাধীন, ১,৫৯১টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও বাদবাকী ৪০৪টি কোন সাহায্য পেত না। ছাত্রীসংখ্যা বম্বে প্রদেশে ২১,৮৫৯ জন, মদ্রাজে ২০,৩৬৫ জন, বাংলাদেশে ৭,৪৬২ জন। এছাড়া, মিশ্র বিদ্যালয়ে ৪২,০৭১জন ছাত্রী শিক্ষা পেত। উপরের তালিকা থেকে দেখা যায়, স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই বহন করছিল। যেখানে মোট ৬১৬টি সরকার-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ১৪,২৯১ জন ছাত্রী ছিল, সেখানে ২,০৮১টি বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ১,১২,৭৭৫জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করছিল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মিশ্র বিদ্যালয়ে ৪২ হাজার ছাত্রীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। পল্লীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় মিশ্র বিদ্যালয়গুলি স্ত্রী-শিক্ষাপ্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

শিক্ষা-পরিসংখ্যান (পুরুষ) ১৮৮১ খ্রীঃ

প্রদেশ Province	মোট পুরুষ সংখ্যা Total Male Population	শিক্ষার্থীর সংখ্যা Under instruction	শিক্ষিতের সংখ্যা Able to read and write but not under instruction	পুরুষ শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার Proportion of males under instruction	পুরুষ শিক্ষিতের আনুপাতিক হার Proportion of males under instruction who can read and write but not under instruction
মাদ্রাজ	১৫,৪২১,০৪৩	৫১৯,৮২৩	১,৫৩৫,৭৯০	৩০ জনে ১ জন	১০ জনে ১ জন
বম্বে (ব্রিটিশ)	৮,৪৯৭,৭১৮	২৭১,৪৬৯	৬৭২,৮৯৫	৩১ জনে ১ জন	১২ জনে ১ জন
বম্বে (করদ রাজ্য)	৩,৫৭২,৫৫৫	৮২,০২১	২৬৬,৫৯৯	৪৩ জনে ১ জন	১৩ জনে ১ জন
বাংলা	৩২,৬২৫,৫৯১	১,০০৯,৯৯৯	১,৯৯১,৫৮৩	৩৪ জনে ১ জন	১৭ জনে ১ জন
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (ব্রিটিশ)	২২,৯১২,৫৫৬	২৯৯,২২৫	১,০৬৩,৪৫৮	৭৬ জনে ১ জন	২২ জনে ১ জন
পাঞ্জাব (ব্রিটিশ)	১০,২১০,০৫৩	১৫৭,৬২৩	৪৮২ ১২৯	৬৫ জনে . জন	২১ জনে ১ জন
মধ্য প্রদেশ (ব্রিটিশ)	৪,৯৫৯,৪৩৫	৭৬,৮৪৯	১৫৭,৯২৩	৬৩ জনে ১ জন	২৫ জনে ১ জন
আসাম	২,৫০৩,৭০৩	৩৩,৩৭৬	৭৯,৬৩৪	৭৫ জনে ১ জন	৩১ জনে ১ জন
কুর্গ	১০০,৪৩৯	৪,২৬৮	৮,৮৩৯	২৪ জনে ১ জন	১১ জনে ১ জন
হায়দ্রাবাদ	১,৩৮০,৪৯২	২৭,৩৪৭	৫৭,৮২৭	৫০ জনে ১ জন	২৪ জনে ১ জন
আজমীর	২৪৮,৮৪৪	৫,৬৯৭	২৪,৪৮৬	৪৪ জনে ১ জন	১০ জনে ১ জন
মোট	১০৪,৪৩২,২২৯	২,৪৮৭,৬:৭	৬,৩১০,২০৩	৪২ জনে ১ জন	১৬ জনে ১ জন

Report of the National Committee on Women's Education

শিক্ষা-পরিসংখ্যান (নারী) ১৮৮১ খ্রীঃ

প্রদেশ	মোট নারীর সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা	মোট নারী-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার	নারী-শিক্ষিতের আনুপাতিক হার
মাদ্রাজ	১৫,৭৪৯,৫৮৮	৩৯,১০৪	৯৪,৫৭১	৪০৩ জনে ১ জন	১৬৬ জনে ১ জন
বম্বে (ব্রিটিশ)	৭,৯৫৬,৬৯৬	১৮,৪৬০	৩২,৬৪৮	৪৩১ জনে ১ জন	২৪৪ জনে ১ জন
বম্বে (করদ) রাজ্য	৩,৩৬৮,৮৯৪	২,৭৩৩	৫,১৪৫	১২০২ জনে ১ জন	৬৫৫ জনে ১ জন
বাংলা	৩৪,৯১১,২৭০	৩৫,৭৬০	৬১,৭৪৯	৯৭৬ জনে ১ জন	৫৬৮ জনে ১ জন
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (ব্রিটিশ)	২১,১৯৫,৩১৩	৯,৭৭১	২১,৫৯০	২১৬৯ জনে ১ জন	৯৮১ জনে ১ জন
পাঞ্জাব (ব্রিটিশ)	৮,৬৪০,৩৮৪	৬,১০১	৮,৪০৭	১৪১৬ জনে ১ জন	১০২৮ জনে ১ জন
মধ্যপ্রদেশ (ব্রিটিশ)	৪,৮৭৯,৩৫৬	৩,১৭১	৪,১৮৭	১৫৩৯ জনে ১ জন	১১০৫ জনে ১ জন
আসাম	২,৩৭৭,৭২৩	১,০৬৮	১,৭৮৬	২২২৬ জনে ১ জন	১৩৩১ জনে ১ জন
কুর্গ	৭৭,৮৬৩	৪৩১	৩৫৬	১৮০ জনে ১ জন	২১৯ জনে ১ জন
হায়দ্রাবাদ	১,২৯২,১৮১	৩৫৬	৭৮৯	৩৬৩০ জনে ১ জন	১৬৩৮ জনে ১ জন
আজমীর	২১১,৮৭৮	২৪৫	৯৬৩	৮৬৫ জনে ১ জন	২২০ জনে ১ জন
মোট	১০০,৬৬১,১৪৬	১১৭,২০০	২৩১,৮৯১	৮৫৮ জনে ১ জন	৪৩৪ জনে ১ জন

Report of the National Committee on Women's Education

অষ্টম অধ্যায়

হাণ্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩)
ও
শিক্ষার প্রসার (১৮৮২-১৯০২)

হাণ্টার কমিশন বা প্রথম
ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের পটভূমি

হাণ্টার কমিশন গঠন
কমিশনের রিপোর্ট
সমালোচনা

শিক্ষার প্রসার :—(১৮৮৭—১৯০২)
প্রাথমিক শিক্ষা
মাধ্যমিক শিক্ষা
কলেজীয় শিক্ষা
স্ত্রী-শিক্ষা
মিশনারী প্রচেষ্টা
সাধারণ শিক্ষা-পরিস্থিতি (১৮৫৪—১৯০২)

।হাণ্টার কমিশনের পটভূমিকা।।

১৮৫৪ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরকারী উদাসীনতায় দেশের জনশিক্ষার প্রসার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশীয় শিক্ষাধারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এই মৃত্যুপথযাত্রী শিক্ষাধারাকে বাঁচিয়ে রাখা, বা তার জায়গায় নতুন কোন জনশিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা, এই দুই প্রশ্নেই সরকার সমান উদাসীন। প্রাথমিক শিক্ষা যেরূপ উপেক্ষিত হয়েছিল, সেরূপ বেসরকারী শিক্ষা-প্রসার প্রচেষ্টা ও সরকারী অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত ছিল। দেশের শিক্ষা-প্রসারে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার গুরুত্ব সম্পর্কে ভারত সরকার মোটেই সচেতন ছিল না। উডের ডেসপ্যাচে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একটি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ, দ্বিতীয়টি বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্যদান-নীতি গ্রহণ ও ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার।

সরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রথম যুগে উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্যই সরকারী অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হচ্ছিল। চুঁইয়ে-নামা নীতি (Downward Filtration Theory) ছিল সরকারী নীতি। এডাম প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ এই নীতির তীব্র সমালোচনা করলেও ভারত সরকার এই নীতিকে ত্যাগ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। উডের ডেসপ্যাচে এই চুঁইয়ে-নামা শিক্ষানীতিকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়, এবং দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ডেসপ্যাচে স্পষ্টভাবে বলা হয়—সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে যাদের পক্ষে নিজেদের চেষ্টায় প্রয়োজনীয় শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য সরকার

শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ এজন্য অধিক অর্থব্যয় করতেও প্রস্তুত—"Who are utterly incapable of obtaining any education worthy of the name by their own unaided efforts, and we desire to see the active measures of Government more especially directed, for the future, to this object, for the attainment of which we are ready to sanction a considerable increase of expenditure."

(*Wood's Despatch, 1854*)

আশা করা গিয়েছিল, উডের নির্দেশে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু চুঁইয়ে-নামা নীতির মোহ ভারত সরকার সহজে ত্যাগ করতে পারেনি। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের নেশায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনকে পূর্বের মত অবহেলা না করলেও যে ছিটে-ফোঁটা কৃপা বর্ষণ করছিল, তা জনশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়নি। ১৮৭০—৭১ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯,০০,০০০। এই সংখ্যা ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ বেড়ে হয় ২৬,৫০,০০০, অর্থাৎ বছরে ৭০,০০০ ক'রে বেড়েছিল। শিক্ষার খাতে মোট যে অর্থ ব্যয় হত, সেই তুলনায় এই বৃদ্ধি আনুপাতিক দিক্ থেকে বিচার করলে খুবই কম। বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল। অর্থাৎ উডের ডেসপ্যাচের পঁচিশ বছর পার হয়ে যাবার পরেও সরকারী উপেক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেলাম।

সাহায্যদান (Grant-in-aid) নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারী শিক্ষা-প্রসার-প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ক'রে শিক্ষা-বিস্তার ত্বরান্বিত করা। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে "সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার" এই নীতির চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তৎকালীন মিশনারীরা শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন, এই নীতিতে তাঁদের দাবীই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতিকে অনুসরণ ক'রে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের কোন মনোভাবই ভারত সরকারের দেখা যায়নি। সাহায্যদান-নীতি প্রবর্তিত হবার পরও সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছিল। এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বেশী ছিল। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের বেশীর ভাগই সরকার-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিপোষণে ব্যয় হয়ে যাবার পর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্য করবার মত অর্থ সরকারী তহবিলে সামান্যই অবশিষ্ট থাকত। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য যে অর্থ ব্যয় হত, সেই তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়গুলি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষাক্ষেত্র হতে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার-নীতি ঘোষিত হবার পরও শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিরূপ বেড়ে যাচ্ছিল, নীচের তালিকা দেখলেই তা বোঝা যাবে:—

সরকার পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান	১৮৫৫ খ্রীঃ		১৮৮২ খ্রীঃ	
	প্রতিষ্ঠান-সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	প্রতিষ্ঠান-সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
আর্টস্ কলেজ	১৫	৩২৪৬	৩৮	৪২৫২
বৃত্তি-শিক্ষার কলেজ	১৩	৯১২	৯৬	৩,৬৭০
মাধ্যমিক স্কুল	১৬৯	১৮,৩৩৫	১,৩৬৩	৪৪,৬০৫
প্রাথমিক স্কুল	১,২০২	৪০,০৪১	১৩,৮০২	৬,৮১,৮৩৫
নর্মাল স্কুল	৭	১৯৭	৮৩	২,৮১৪
মোট	১,৪০৬	৬২,৭৩১	১৫,৪৬২	৭,৩৭,১৭৬

যে-সব জায়গায় অল্প ব্যয়ে সরকারী সাহায্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারার সম্ভাবনা ছিল, সে জায়গাতে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় সাধারণের মধ্যে সরকারী নীতি সমালোচনা শুরু হল। সাধারণের মনে ধারণা হল, সরকার যেন বেসরকারী উদ্যমকে ধ্বংস করতেই চায়। এছাড়া, বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারী চাকরিতেও সুবিচার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে। মিশনারী অথবা বেসরকারী বিদ্যালয়ের, ছাত্রদের চাইতে সরকারী বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সরকারী চাকরিতে নিয়োগ-ক্ষেত্রে অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখানো হচ্ছিল বলে দেশবাসীর মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

মিশনারীরা আশা করেছিল, উডের নির্দেশ কার্যকর হলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পথে আর কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু সরকারী মতিগতি তাদের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক হল না। সিপাহী-যুদ্ধের পর সরকারী শিক্ষানীতি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ রূপ গ্রহণ করায় পাদ্রীরা ধর্মহীন লৌকিক শিক্ষাকে "Godless and irreligious" আখ্যা দিতে শুরু করল। শিক্ষাবিভাগের বিমাতৃসুলভ আচরণে মিশনারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। এদেশের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখন কোন সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রইল না, তখন মিশনারী সম্প্রদায় বিলাতে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলল। এই উদ্দেশ্যে 'General Council of Education in India (1878)' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হল। আর্ল অব সাফটেসবেরী, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচে খ্যাত পূর্বতন স্যার চার্লস উড), লর্ড লরেন্স প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যভুক্ত হলেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি-দল ভারত-সচিব লর্ড হার্টিংটনের সঙ্গে ও ভারতযাত্রার প্রাক্কালে ভারতের ভাবী বড়লাট লর্ড রিপণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি-দল ভারতের বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে ভারত সরকারকে অধিকতর শক্তি ও অর্থ নিয়োগের অনুরোধ জানায়। লর্ড রিপণ প্রতিশ্রুতি দেন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে

১৮৫৪ খ্রীঃ নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে তদন্ত করবেন।

।। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) বা হাণ্টার কমিশন ।।

ভারতে এসেই লর্ড রিপণ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি প্রথম ভারতীয় কমিশন নিয়োগ করেন। বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়ম হাণ্টার এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কুড়িজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জাস্টিস তেলাং, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয়গণ সদস্যরূপে গৃহীত হন। সভাপতি হাণ্টারের নামে এই কমিশন সাধারণের নিকট 'হাণ্টার কমিশন' নামেই সমধিক পরিচিত।

১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতিকে যথার্থরূপে কার্যকরী করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য এবং উড-নির্দেশিত নীতির ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য কমিশনকে বলা হল—"………to enquire particularly into the manner in which effect had been given to the principles of Despatch of 1854 and to suggest such measures as it might think desirable with a view to further carrying out of the policy therein laid down."

কমিশনকে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল। এসময়ে গণশিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল, কমিশনকে এই দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া, মাত্র দু'বছর আগে বিলাতে প্রাথমিক শিক্ষা-আইন পাশ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিলাতের কর্তৃপক্ষের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যকলাপ, কারিগরী শিক্ষা ও ইউরোপীয়দের শিক্ষা-কমিশনের তদন্তের আওতার বাইরে রাখা হল। কমিশনকে Grant-in-aid প্রথার সম্প্রসারণের উপায় নির্ধারণ ও প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কেও অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কমিশনের সামনে যে সব বিষয় প্রধান বিচার্য হয়ে দাঁড়াল, তা হচ্ছে সরকার কি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা ক'রে উচ্চশিক্ষার জন্য অত্যধিক শক্তি ও অর্থ ব্যয় করছে? জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ কি স্থান গ্রহণ করবে? বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে? সরকার কি ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার-নীতিকে গ্রহণ করবে? ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে?

কমিশনের সভ্যগণ তাঁদের যথাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলকাতায় সাত সপ্তাহ ধরে প্রাথমিক আলোচনা করেন। তারপর সভ্যগণ আটমাস কাল দেশের সর্বত্র সফর ক'রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে দেশের শিক্ষাবিদ্ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। কমিশনের বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যদের নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। প্রতি প্রাদেশিক কমিটি নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট এই সব আঞ্চলিক কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি ক'রে লিখিত হয়। ১৮৮৩ খ্রীঃ কমিশন ২২২টি প্রস্তাব সহ ৬০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ রিপোর্ট পেশ করেন। দেশের অতীত শিক্ষা-ব্যবস্থা, কোম্পানী ও ইংরেজী শাসনে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রে শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেন।

।। কমিশনের রিপোর্ট ।।

সরকারী শিক্ষানীতির সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা ক'রে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতির বিপরীত কাজই করেছে। বম্বে, কুর্গ, পাঞ্জাব এবং বেরারে এই নীতিকে কার্যকর করবার কোন আন্তরিক চেষ্টাই হয়নি। বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে এই নীতিকে কার্যকরী করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয়নি। স্থানীয় সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্যদানেব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কমিশন ১৮৫৪ খ্রীঃ শিক্ষানীতি অনুসরণের উপযোগিতাকে স্বীকাব ক'রে নিয়ে বলেন, উন্নত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে রাখা প্রয়োজন, সেগুলিকে রেখে বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে উন্নতিলাভ করতে পারে ও বেসরকারী উদ্যোগে যাতে আরও বেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সেদিকে সরকারী মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া দরকার। নতুন নীতিকে কার্যকরী ক'রে তুলবার জন্য কমিশন প্রস্তাব করেন যে, সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিরত থাকবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যাতে বিস্তারলাভ করতে পারে, grant-in-aid প্রথাকে সেজন্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ক'রে বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে দিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় তার দায়িত্বশীল পরিচালকমণ্ডলীর হাতে তুলে দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সংকোচিত ক'রে আনবে। ভবিষ্যতে কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উদারভাবে সরকারী সাহায্য বিতরণ করা হবে। বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় সমান মর্যাদা ও সুবিধাব অধিকারী থাকবে।

এই সময় সরকারী সাহায্যদানের কোন সর্ব-ভারতীয় নীতি ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশ সাহায্যদান সম্পর্কে বিভিন্ন রীতি অনুসরণ ক'রত। মাদ্রাজে Salary grant, মধ্যপ্রদেশে Fixed period system, বম্বে ও বাংলায় payment by result system অনুসারে সরকারী সাহায্য বিতরণ করা হত। কমিশন বিভিন্ন প্রকার grant-in-aid প্রথা সম্পর্কে বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত করেন যে, স্থানীয় অবস্থার উপযোগী যে রীতি শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার উন্নতির সর্বাধিক সহায়ক বলে বিবেচিত হবে, প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ নিজ নিজ প্রদেশে সেই ভাবেই সাহায্য বণ্টন করবেন।

॥ দেশীয় শিক্ষা ॥

কমিশন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা ক'রে এই শিক্ষাধারাকে উৎসাহিত করবার সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে, যদিও এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে, তবুও এর জীবনীশক্তি ও জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করা যায় না—"Admitting however the comparative inferiority of indigenous institutions we consider the efforts should now be made to encourage them. They have survived competition, and thus have proved that they possess both vitality and popularity" কোন্ শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দেশীয় বিদ্যালয়ের পর্যায়ভুক্ত করা হবে, যে-সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য দেশীয় লোকদের দ্বারা স্থাপিত বা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হবে—"as one established or conducted by natives of India on native method." কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, এদেশের শিক্ষা প্রসার করতে হলে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিকে উপেক্ষা না ক'রে যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধন ক'রে শিক্ষা-প্রসারের কাজে লাগাতে হবে। কমিশন এই বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা-গ্রহণের সুপারিশ করেন।

যে-সব বিদ্যালয় ধর্মনিরপেক্ষভাবে জাতিধর্মনির্বিশেষে শিক্ষা দেয়, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্যদান-রীতির (Payment by result system) প্রবর্তন ক'রে দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং-গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

পরিদর্শন-ব্যবস্থা, পরীক্ষার মান, সাহায্যদানের নিয়মকানুন প্রভৃতি স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হবে।

সাহায্যপ্রাপ্ত দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সবারই শিক্ষা পাবার অধিকার থাকবে। অনুন্নত সম্প্রদায়কে শিক্ষা-গ্রহণে উৎসাহ দেবার জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

যে-সব জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি বা লোকাল বোর্ড আছে, সেখানে দেশীয় বিদ্যালয়-সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই বোর্ডই দেশীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবে। দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ যত্ন নেবার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষা-বিভাগ এই দেশীয় বিদ্যালয়গুলির একটি তালিকা রক্ষা করবে, এবং বোর্ডগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান করবে বলে স্থির হয়।

কমিশন একটি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই মৃতপ্রায় দেশীয় শিক্ষায়তন-গুলির উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই এই বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে তুলে গণশিক্ষার ভিত্তি-স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শিক্ষা-বিভাগ যদি কমিশনের সুপারিশ

নহ্ কার্যে পরিণত ক'রত, তাহলে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে অজ্ঞানতার অন্ধকার এরূপভাবে পরিব্যাপ্ত হত না।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

কমিশন বুঝতে পেরেছিলেন, দেশীয় বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের সর্বাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রেও দেশের গণশিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই বিদ্যালয়গুলিই যথেষ্ট নয়। দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে হলে সর্বশ্রেণীর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ৩৬টি সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনসাধারণের মাতৃভাষায় শিক্ষা। জীবনের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সেই সব বিষয়ই শেখানো হবে। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি-পর্ব বলে বিবেচ্য হবে না—"Primary education be regarded as the instruction of the masses through the vernacular in such subjects as will best fit them for their position in life, and be not necessarily regarded as a portion of instruction leading upto university." কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient) শিক্ষারূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কমিশনের দৃঢ় অভিমত ছিল যে, সব রকম শিক্ষারই রাষ্ট্রের সহায়তা-দাবীর অধিকার রয়েছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নই সর্বাগ্রাধিকার দাবী করতে পারে। জনসাধারণ যাতে প্রাথমিক শিক্ষা-গ্রহণে উৎসাহী হয়, সেজন্য হার্ডিঞ্জের ঘোষিত নীতি অনুসারে সরকারী নিম্নতন কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর অপেক্ষা সামান্য শিক্ষিতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অনগ্রসর জেলাগুলিতে প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮৭০ খ্রী: ইংলণ্ডের শিক্ষা-আইনে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে দেওয়া হয়। কমিশন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতির অনুকরণে এই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেন। সুপারিশ করা হয় যে, এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ এলাকার জন্য একটি শিক্ষাবোর্ড (Education Board) গঠন করবে। এই শিক্ষা-বোর্ড নিজ এলাকার প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে নতুন স্কুল স্থাপন করবে। যেখানে সম্ভব, পুরাতন স্কুলগুলিকে সাহায্য ক'রে সর্বশ্রেণীর শিক্ষার দ্বার মুক্ত ক'রে দেবে। শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। দেশের লোকের উপর প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কমিশন সদিচ্ছার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। কিন্তু কমিশন যে আশা নিয়ে এই সুপারিশ করেছিলেন, তা সফল হয়নি। স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির এমন অভিজ্ঞতা বা শক্তি ছিল না, যা দিয়ে এই বিরাট দায়িত্বের বোঝা বহন করতে পারে। শিক্ষাবোর্ডগুলির ব্যর্থতার জন্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অর্থের অভাব। প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক সংস্থানের জন্য কমিশন কতগুলি সুপারিশ করেন :

প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট তহবিল থাকবে।

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রাদেশিক রাজস্ব থেকেও একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যয় ও নর্মাল স্কুল পরিচালনার ব্যয় প্রাদেশিক সরকার বহন করবে।

প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তবে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক সরকার বহন করবে, এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এই টাকাটা কোথা থেকে কি ভাবে আসবে, সে সম্পর্কে কমিশন নীরব। দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, প্রাদেশিক সরকার সে অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করবে, সে সম্পর্কে কমিশন কোনরূপ নির্দেশ দিতে না পারায় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলির কার্যকারিতা অনেকটা কমে গিয়েছিল। তারপর পরীক্ষা-ফলের উপর ভিত্তি ক'রে সাহায্যদানের নির্দেশ দেওয়াও কমিশনের পক্ষে ভুল হয়েছিল। এতে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। শিক্ষকের লক্ষ্যই থাকত, যে-কোন প্রকারে পাশের সংখ্যা বাড়িয়ে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা। এর অশুভ ফল সমগ্র শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর জেলাগুলিকে পরীক্ষানির্ভর সাহায্যদানের রীতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কমিশন স্কুল-পরিচালনা সম্পর্কে যেমন ইংলণ্ডের অনুসরণ করেছিল, তেমনি পরীক্ষা-ফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান-ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের Lowe's code থেকে গ্রহণ করেছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কিছু সংখ্যক দরিদ্র ছাত্রের জন্য বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা রেখে বাদবাকীর জন্য বেতন গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়েছিল।

তৎকালীন সমাজে জাতিভেদের প্রভাব ও শিক্ষকতার কুফল দেখে কমিশন শিক্ষা-বোর্ড পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার সর্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশ ছিল, পাঠক্রম যথাসম্ভব সহজ ও স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করতে হবে। দেশীয় গণিত, হিসাব, জমির জরীপ, প্রাথমিক জড়-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও কৃষিতে তার প্রয়োগ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং শিল্পকলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়রূপে গৃহীত হবে। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনে স্থানীয় পরিচালকদের স্বাধীনতা থাকবে।

দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ছাত্রদের ব্যায়াম, স্কুলড্রিল ও দেশীয় খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষা যাতে শৃঙ্খলা-রক্ষা ও চরিত্রগঠনেসহায়তা করে,

পরিদর্শকগণ সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। স্কুল বসবার ও ছুটির কোন সাধারণ নিয়ম থাকবে না। স্থানীয় প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী এগুলি স্থির করা হবে।

পরিদর্শকগণ যতদূর সম্ভব নিজেরা পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। দেশীয় শিক্ষারীতির দিকে দৃষ্টি রেখেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চ বা নিম্ন প্রাইমারী শিক্ষা কোন প্রদেশেই বাধ্যতামূলক হবে না।

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য প্রতি মহকুমা পরিদর্শকের এলাকায় একটি ক'রে নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হবে সেই অঞ্চলের মাতৃভাষা। কোন অঞ্চলে ভিন্ন ভাষা-ভাষী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যথেষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা দাবী করলে শিক্ষা-বোর্ড তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করবে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী আয়োজন ব্যাপকভাবে থাকায় কমিশন মধ্যশিক্ষা থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসারের নীতি অনুসরণ করবার সুপারিশ করেন। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, স্থায়িত্বের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে বেসরকারী পরিচালনায় স্কুলগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অনগ্রসর ও দরিদ্র অঞ্চলে সরকারী স্কুলগুলিকে বিভাগীয় পরিচালনাধীনেই রাখা হবে। এছাড়া প্রতি জেলায় একটি উন্নত মানের আদর্শ স্কুল বিভাগীয় পরিচালনায় রাখবার সুপারিশ করা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার জন্য স্থানীয় পরিচালক-সভাকে নিজ নিজ স্কুলের বেতনের হার নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল নিতান্তই পুঁথিগত শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি-ক্ষেত্র রূপেই এ শিক্ষার পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়েছিল। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থানই ছিল না। এর কুফল সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনাথনাথ বসু বলেছেন—

"বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আরম্ভ হইতেই ইহাতে আর একটি ত্রুটি ছিল, এই শিক্ষা নেহাতই পুঁথিগত শিক্ষা; তাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না।...... উডের ডেসপ্যাচে বৃত্তিশিক্ষা-ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল; কিন্তু সে বৃত্তি উচ্চ বর্ণের—আইন, চিকিৎসা এবং এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি ভদ্রলোকের বৃত্তি।........১৮৩৫ খ্রীঃ কলকাতায় মেডিকেল কলেজ খোলা হইয়াছিল। আইন-শিক্ষার ব্যবস্থাও ক্রমে হইল। গভর্ণমেণ্টের পূর্ত বিভাগের জন্য এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু একে তো ইহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তাহা ছাড়া, আইন ছাড়া অন্য আর দুই রকমের বৃত্তিশিক্ষা লোকে চাকরির জন্যই গ্রহণ করিল। অল্প কয়েকজন স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে গেল বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রই মেডিকেল ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকরির সন্ধান করিতে লাগিল এবং প্রথম প্রথম কাহারও চাকরির অভাব

ঘটিল না। এদেশে তখনও স্বাধীনভাবে এঞ্জিনিয়ারের ব্যবসা চালাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই।

"সুতরাং আমাদের প্রায় সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য হইল চাকরি। স্বাধীনভাবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পথ তখন আমাদের পক্ষে রুদ্ধ, দেশের বাণিজ্য বিদেশীর করতলগত, পুরাতন শিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নূতন কোন শিল্পেরও সৃষ্টি হইল না। আমাদের শোনানো হইল শিল্পচর্চা আমাদের জন্য নয়, চিরকাল ধরিয়া আমরা নাকি ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই আছি, সেই ভূমিলক্ষ্মীর সেবা আমাদের জাতীয় জীবনের সাধনা। সুতরাং যখন ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন আমরা হয় সরকারী চাকরি করিবার, না হয় বিলাতের মালের কাঁচামাল জোগাইবার ও এদেশে বিলাতী মাল কাটাইবার জন্য যে বড় বড় হৌস ছিল, তাহাতে কেরানীগিরি করিবার চেষ্টায় ফিরিলাম; বড়জোর এই সব হৌসে দালালি করিয়া "ব্যবসায় করিতেছি" এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। উচ্চশিক্ষা-লাভের সাক্ষাৎ ফল ইহার চেয়ে আর বেশী হইল না।"

(আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা—**অনাথনাথ বসু**)

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বার মুক্ত করবার জন্য কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা 'এ' কোর্স, আর একটি ছেলেদের বাণিজ্য ও সাহিত্য বহির্ভূত প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য 'বি' কোর্স। ["We theretore recommend that in the upper classes of high schools there be two divisions. One leading to Entrance Examination of the Universities, the other of a more practical character, intended to fit youths for commercial or non-literary pursuits." (*Report of the Indian Education Commission*)। স্থির হল যে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভের পর নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ছাত্ররা 'এ' অথবা 'বি' কোর্স বেছে নেবে। কমিশন আশা করেছিল, কলেজের পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্ররা বৃত্তিশিক্ষাই বেশী পছন্দ করবে।

"'বি' কোর্সের ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনদিনই বেশী ছাত্র জুটিল না। তাহার কারণ, লোকের মনে এণ্ট্রান্সের তুলনায় 'বি' কোর্স জাত্যংশে ছোট ছিল। সেখানে ছুতোর-কামারের কাজ শিখিবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে তাই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যবহারিক করিয়া তোলার একটা চেষ্টা বিফল হইল।

"কিন্তু এই সময়েই ড্রয়িং, বিজ্ঞান প্রভৃতি নূতন কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে স্থান পাইল। তাহাতে পাঠক্রমের ভার বাড়িল বটে, কিন্তু তাহার মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিল না।

"বর্তমান সমস্যাটা কমিশন এড়াইয়া গেলেন। ব্যবহারিক শিক্ষাই যথেষ্ট, যান্ত্রিক

শিক্ষার এখনও অবশ্যকতা নাই, কমিশন কতকটা এই ভাবের মত দিলেন।"
(আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা—অনাথনাথ বসু)

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশক্রমে বহুমুখী পাঠক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আজ থেকে ৮০ বছর আগে হাণ্টার কমিশন ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং 'এ' ও 'বি' কোর্সের প্রবর্তন করেছিলেন এবং সেই দিক্ থেকে কমিশনের দূরদর্শিতাকে প্রশংসা করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সম্পর্কে কমিশন কোন আলোচনা করেননি। তাই ধরে নিতে হবে, কমিশন ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার বাহন সম্পর্কীয় এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া কমিশনের পক্ষে মোটেই সঙ্গত হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্ন স্তরে শিক্ষার বাহন বেছে নেওয়া সম্পর্কে প্রদেশগুলিকে নিজ নিজ অবস্থা বিচার ক'রে প্রয়োজন-উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উচ্চ শিক্ষা ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনকে কোন অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবু কমিশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন। কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করবার উপদেশ দেওয়া হয়। দেশের শিক্ষার উন্নত মান বজায় রাখবার প্রয়োজনে যে সব কলেজ সরকারী পরিচালনায় রাখা প্রয়োজন, সেখানেই বিভাগীয় পরিচালনাকে রাখতে বলা হয়েছে। বে-সরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে আরও উদারভাবে আর্থিক সাহায্য করতে বলা হয়। কলেজগুলির অধ্যাপক, পরিচালনার ব্যয়, কলেজের শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার প্রভৃতির জন্য ব্যয়, এই সব দিক্ বিচার ক'রে সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে বলা হয়। সরকারী কলেজের বেতনের হারের চেয়ে নিম্ন হারে বেতন স্থির করবার স্বাধীনতা বে-সরকারী কলেজগুলিকে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট-সংখ্যক দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রের জন্য অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার সুপারিশ করা হয়। মেধাবী ছাত্ররা যাতে বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে, সেই সুযোগের ব্যবস্থার কথা কমিশন বলেন। এছাড়া বড় কলেজে ছাত্রদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয় প্রবর্তন ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষণ ॥

উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হলেও প্রায় ত্রিশ বছর কাল ধরে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তনই হয়নি। শিক্ষা-কমিশন গঠনের পূর্বে দেশে মাত্র দু'টি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিং-এর কোন প্রয়োজন আছে কিনা, এ বিতর্কের অবসান হয়নি।

তাই কমিশন বিতর্কমূলক বিষয়টি সম্পর্কে অতি সাধারণভাবে দু' একটি সুপারি করেন। শিক্ষকদের শিক্ষানীতি জানার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে শিক্ষানীতির ব্যবহা প্রয়োগ শেখাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ট্রেনিং সমাপ্ত ক'রে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের মধ্যে থেকে সরকারী স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে বলা হয়। প্রাথমি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ-কাল সংক্ষিপ্ততর ক'রবার সুপারিশ করা হয়।

।। বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা ।।

কমিশন দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতি সুপারিশ করেন। মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর ছিল, এজন্য তাদের শিক্ষ উৎসাহিত করতে বিশেষ সুবিধা দেবার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, সরক থেকে মুসলিম স্কুলগুলিকে সাহায্য, ছাত্রদের বৃত্তি ও বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযে দিতে হবে। যে সব জায়গায় মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, সেখানে তাদের জ নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান পরিদর্শক নিযুক্ত করবার সুপারিশও ক হয়। মুসলমান বা অন্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার ক'রে একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধার ব্য পরবর্তী কালে আরও ব্যাপকভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে জাতীয় জীবন অভিশাপগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল।

কমিশনের বিশেষ শিক্ষা-প্রস্তাবসমূহের মধ্যে বয়স্কদের জন্য 'নাইট স্কুল' স্থাপন সুপারিশ আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারে।

।। ধর্মীয় শিক্ষা ।।

মিশনারীগণ ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করবার দাবী করেছিলেন। কমিশন সম্পর্কে নিরপেক্ষতা-নীতির সারবত্তাকে মেনে নিয়ে যে-কোন বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূ ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। কোন বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ধর্মশিক্ষার ক্লাসে যোগদান হবে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। নীতিশিক্ষামূলক পুস্তক প্রণয়নে ব্যবস্থা থাকবে। এই জাতীয় পুস্তকে সকল ধর্মের মূল নীতি নিয়েই আলোচনা হবে প্রতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা একজন অধ্যাপক প্রতি বছর মানবিক কর্তব্য নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন। কমিশনের এই সুপারিশ কার্যকর করা হয়নি

।। স্ত্রী-শিক্ষা ।।

কমিশন দেশের নারী-শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান ক'রে দেখ পান যে, স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের মেয়েদের মধ্যে ৯৯.৫ জন লিখতে-পড়তে জানে দেশের নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য কমিশন সুপারিশ করেন যে, বেসরকারী বা বিদ্যালয়সমূহে উদারভাবে সাহায্য দেওয়া হবে, এবং এজন্য বালিকা বিদ্যালয়সমূ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মকানুন কিছু শিথিল করতে হবে। শিক্ষার প্রতি মেয়েদের অ

বার জন্য বেতন সম্পর্কে সুবিধা দেওয়া হবে। বারো বছরের পর কোন মেয়ে স্কুলে তে রাজী হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে। মহিলাদের জন্য অধিক খ্যায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিধবাদের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেরকে শিক্ষিকার কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে। আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ের ন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শনের ন্য নারী-পরিদর্শিকা নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষিকাদের এদের অধীনে কাজ করতে বিধা হবে। মেয়েদের পাঠক্রম ছেলেদের চেয়ে সহজতর করা হবে। ব্যবহারিক বনে কাজে আসতে পারে, এমন শিক্ষা যাতে তারা পায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই মেয়েদের ঠক্রম তৈরি করতে হবে। মেয়েদের জন্য ভিন্ন ধরনের পাঠ্য পুস্তক রচনা করা হবে।

। মিশনারীদের সম্পর্কে মন্তব্য ॥

মিশনারীদের আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (১৮৮২) ঠনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশসমূহ কার্যকর করা হচ্ছে না, ই ছিল মিশনারীদের প্রধান অভিযোগ। শিক্ষা-কমিশনকে ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচের নির্দেশসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার কথা বলা য়েছিল। সিপাহী যুদ্ধের পর শিক্ষায় মিশনারীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা ও তাদের ভবিষ্যৎ ম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হলে মিশনরীরাই শিক্ষাক্ষেত্রে একচ্ছত্র ধিনায়ক হয়ে বসবে, মিশনারীরা এই আশাই করেছিলেন। কারণ, বেসরকারী শিক্ষাক্ষেত্রে শনারী-স্থাপিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই সর্বাধিক ছিল। মিশনারীদের সবচেয়ে বড় রসা ছিল যে, একমাত্র তাদেরই সুনিয়ন্ত্রিত ও স্বচ্ছন্দ সংগঠন রয়েছে যা একটা বিরাট ায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয়দের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, শিক্ষাক্ষেত্র কে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হলে মিশনারীরাই সেই স্থান অধিকার করবে। কমিশন র্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারণের অর্থ এই নয় যে, ক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ মিশনারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কমিশনের মতে, শনারী প্রচেষ্টা ঠিক ঠিক বেসরকারী প্রচেষ্টার সংজ্ঞায় পড়ে না। এ সরকারী ও জাতীয় চেষ্টার মাঝামাঝি একটা অবস্থা। বেসরকারী প্রচেষ্টা বলতে জাতীয় প্রচেষ্টাকে াঝায়। ভারতীয়রাই শিক্ষা-সম্প্রসারণে প্রধান স্থান অধিকার করবে, কমিশন এই আশাই ক করেছিলেন। "The private effort, which it is mainly intended to oke, is that of the people themsleves. Natives of India must constiite the most important of all agencies if educational means are even be co-extensive with educational wants." কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যে শনারীদের হতাশ করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় শিক্ষা-প্রসার

প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে দেখা দেয়, এবং এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশীয় প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৮৫৫—১৮৮২

প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	১৮৫৫		১৮৮২	
	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রসং[illegible]
আর্টস কলেজ	১৫	৩২৪৬	৩৮	৪২০০
বৃত্তিশিক্ষার স্কুল ও কলেজ	১৩	৯১২	৯৬	৩৬০
মাধ্যমিক স্কুল	১৬৯	১৮৩৩৫	১৩৬৩	৪৪৬০৫
প্রাথমিক স্কুল	১২০২	৪০০৪১	১৩৮৮২	৬৭১৮০১
নর্মাল স্কুল	৭	২৯৭	৮৩	২৮৬৪
মোট	১৪০৬	৬২৭০১	৫৪৬২	৭০৭১৯৬

শিক্ষাপ্রসারে বেসরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টা

১৮৮১-৮২

প্রতিষ্ঠান	ভারতীয় পরিচালনা	অন্যদের দ্বারা পরিচালি[illegible]
সাধারণ কলেজ	৫	১৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৩৪২	৭৫৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৪৬৮২	১৮৪২
বৃত্তিশিক্ষার স্কুল ও কলেজ	১০	১৮
	৫৬০১৯	২৬৩৫

॥ ফলশ্রুতি ॥

ভারত সরকার ধর্মসম্পর্কীয় নির্দেশ ছাড়া কমিশনের সব সুপারিশই গ্রহণ করেছি… কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্র… প্রত্যাহার আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়। শিক্ষা-বিভাগ নতুন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা… স্থাপনা থেকে বিরত হলেও সরকার-পরিচালিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারী পরিচালনায় হস্তান্তরিত করেনি। জাতীয় শিক্ষায় ভারতীয় প্রাধান্য স্বীকার ক… নেওয়া হয়।

॥ সমালোচনা ॥

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কমিশন উড ও স্ট্যানলীর শিক্ষানীতিকেই সমর্থন করেছেন। কমিশন নীতিগত দিক্ থেকে কোন-রূপ সুপারিশ বা নির্দেশ দেন নি। মিশনারীদের স্থান নির্দেশ ক'রে যে মন্তব্য রিপোর্টে করা হয়েছে, নীতির দিক্ থেকে সমস্ত রিপোর্টে এই একটি সিদ্ধান্তই মূল্যবান। এ ছাড়া, সমস্ত রিপোর্টে উডের রিপোর্টকে কার্যকর করার প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। অবশ্য এই কমিশন নীতি-নির্দেশক কমিশন ছিল না। তাই কার্যকর (Execution) দিক্ থেকেই কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহকে বিচার করতে হবে।

শিক্ষায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে কমিশন নানা সুপারিশ করলেও শিক্ষা-বিভাগের উপর একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেক অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থার অনুসন্ধান, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন, জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন, শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রভৃতি দেখবার ভার শিক্ষাবিভাগের উপর দেওয়া হয়। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার অগ্রগতির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার পথ নির্দেশ করেন। বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী অর্থ ও পরিদর্শকদের সুচিন্তিত অভিমতের সাহায্যে শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধনের পথকে কমিশন প্রশস্ত করেন।

দ্বিমুখী শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বারা কমিশন বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সূচনা করেছিল। এই দ্বিমুখী শিক্ষার পরিকল্পনা ('এ' ও 'বি' কোর্স) ত্রুটিহীন ক'রে যদি সেই সময় থেকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হত, তাহলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাস অন্যরূপ হতে পারত। বৃত্তিশিক্ষার পরবর্তী উচ্চ স্তরে যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ যদি কমিশন করত, তাহলে হয়ত ব্যবহারিক শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা এরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত না।

বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিশ ক'রে কমিশন অতি প্রয়োজনীয় একটি দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষার এই দিক্‌টিতে আজ পর্যন্ত যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সমাজসেবীদের প্রচেষ্টায় যে অগ্রগতি হয়েছে, তা অতি অকিঞ্চিৎকর।

কমিশন রিপোর্ট রচনাকালে তৎকালীন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা তখনও এমন অবস্থায় আসেনি যে ইংলণ্ডে অনুসৃত শিক্ষানীতি এখানে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা তখন সবেমাত্র প্রবর্তিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কমিশন নীতিগতভাবে কোন ভুল করেনি, বরং সদিচ্ছার পরিচয়ই দিয়েছিল। কিন্তু এই সদ্যোজাত প্রতিষ্ঠানগুলি এত বড় একটা বড় দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম কিনা, সে কথাও কমিশনের চিন্তা করা উচিত ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও এই শিক্ষাকে

বাধ্যতামূলক বা অবৈতনিক করবার কথা কমিশন চিন্তা করতে পারেননি। তারপর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে, সে সম্পর্কে কোন আলোকপাত না করায় কমিশনের মূল্যবান সুপারিশগুলির কার্যকর দিক্‌ থেকে গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছিল। সাহায্যদানের নীতি হিসাবে Payment by results প্রথাকে গ্রহণ করার ফলও দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি।

মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কমিশনের পক্ষে অন্যায় হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য যে অনেকখানি ভাষার প্রশ্নে জড়িত, সেকথা বিচার ক'রে কমিশনের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা উচিত ছিল।

মিশনারীদের স্থান নির্দেশ ও শিক্ষায় ধর্মের স্থান সম্পর্কে কমিশন যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা প্রশংসনীয়। কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের জন্য শিক্ষার বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করবার সুপারিশ ক'রে শিক্ষায় সম্প্রদায়িকতাকে প্রসারিত করবার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

জাতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়রাই গ্রহণ করবে, এই স্বীকৃতির মধ্যে কমিশন দেশীয় শিক্ষা-প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ক'রে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেছিলেন। সরকার ও সাধারণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দূর ক'রে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা-প্রসারের অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টিতে কমিশনের সুপারিশগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

অনেকে অভিযোগ করেছেন, কমিশনের রিপোর্ট সংকীর্ণতা-দোষে দুষ্ট। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কমিশনকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ক'রে পরামর্শ দিতে বলা হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র কমিশনের অনুসন্ধানের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। তবুও কমিশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন।

শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা-সমস্যা (১৮৮২-১৯০২)

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

পরাধীন ভারতে ভারতীয়দের কল্যাণ-কামনায় যে কয়জন বড়লাট শাসন-সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, উদারপন্থী লর্ড রিপণ্‌ তাঁদের অন্যতম। ভারতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার জনকরূপে তাঁর নাম আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব। ইংলণ্ডের কাউন্টি কাউন্সিল (County Council) ও রুরাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের (Rural District Board) অনুকরণে রিপণ ১৮৮২-৮৫ খ্রীঃ মধ্যে মিউনিসিপ্যাল আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাস করেন। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন এই স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবার সুপারিশ করেন। জেলা শিক্ষা-বিভাগ এই নির্দেশ অনুসারে বিভাগীয় ও দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের হাতে হস্তান্তরিত করে। এই হস্তান্তর সর্বত্র একই রকম হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগটি শিক্ষা-বিভাগের হাতে রাখা হল। এছাড়া অনুন্নত ও

আদিবাসীদের শিক্ষার জন্ত যেখানে কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেখানকার দায়িত্ব শিক্ষা-বিভাগ নিজ হাতে গ্রহণ করল।

শিক্ষা-কমিশন স্থানীয় করের একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট ক'রে রাখবার নির্দেশ দিয়েছিল। এই সঙ্গে সরকার থেকে সাহায্য দেবার সুপারিশও করেছিল। সরকারী সাহায্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নভাবে দেওয়া হত। মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশে মোট রাজস্বের শতকরা পাঁচভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ব্যয় করবার সিদ্ধান্ত হয়। বম্বে সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের দেয় অর্থের অনুপাতে সাহায্য করতেন। বাংলা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক দায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। পাঞ্জাব সরকার শিক্ষক-শিক্ষণ ও পরিদর্শকদের ব্যয়ভার বহন করত। প্রথম অবস্থায় এই ব্যয়ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহন করতে হত। আসাম প্রদেশে সাধারণ শিক্ষার খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ হলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আনুপাতিক হারে একটা অংশ দেওয়া হত। সাহায্য-বণ্টনের বিভিন্ন রীতি প্রচলিত থাকলেও ১৯০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফলের উপর সাহায্যদানের রীতিরই প্রাধান্য ছিল। এই সময়ে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির হার সব প্রদেশে সমান হয়নি। নীচের তালিকা দেখলে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা আনুপাতিক কিভাবে বেড়েছে, তার একটা ধারণা মিলবে। সমগ্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার কথা বিবেচনা করলে এই বৃদ্ধি যে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, সে কথা স্বীকার করতে হবে।

	১৮৮৭ খ্রীঃ	১৮৯২ খ্রীঃ
জেলা বোর্ড পরিচালিত স্কুল	১৩,৩১৮	১৪,৫৩১
ঐ ছাত্রসংখ্যা	৫,৬৪,৮০২	৬,৩৯,৮৮৩
মিউনিসিপ্যাল স্কুল	৮১৩	১,০৪১
ঐ ছাত্রসংখ্যা	৭৯,৭৬৩	১,০১,২৯১

সারা ভারতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের অর্ধেকের কিছু বেশী (৫৩%) সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষা পেত। ১৯০১-০২ খ্রীঃ বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের থেকে অনেক বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধিটা বাংলা ও মাদ্রাজেই বেশী হয়েছিল। বাংলাদেশে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ১৮৮৭ খ্রীঃ ৩৯,৪৩৬টি থেকে কমে গিয়ে ১৮৯২ খ্রীঃ ৩৬,৭০৯টিতে পরিণত হয়। অবশ্য স্কুলের সংখ্যা কমলেও ছাত্রসংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছিল। ঐ সময়ে ছাত্রসংখ্যা ৯,৬৩,৭০৯ জন থেকে ১০,১২,৭৫৭ জন হয়। বহু স্কুলের পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় সর্বনিম্ন পাঁচটাকা সাহায্য পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় বাংলাদেশে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পায়।

১৯০২ খ্রীঃ পরে দেশীয় বিদ্যালয়ের সমস্যা বলে আর কোন সমস্যাই রইল না। যে সব দেশীয় বিদ্যালয় জেলাবোর্ডের পরিচালনাধীন হয়েছিল, সেই সব স্কুল প্রাচীন জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। আর যেসব স্কুল সাহায্যবঞ্চিত ছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে অর্থাভাবে লোপ পেয়ে যায়। বিংশ শতকের শিক্ষার ইতিহাসে দেশীয় বিদ্যালয় বলে আর কোন বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ রইল না।

১৮৮২খ্রীঃ—১৯০২ খ্রীঃ মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। দেশীয় বিদ্যালয়গুলি লোপ পেতে থাকায় দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা কমে যায়। দেশের সহজগম্য স্থানেও শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হলেও দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার কোন আয়োজনই এযুগে হয়নি। তারপর সরকারী অনুমোদনের কড়াকড়িতে বহু স্কুলই সরকারী যোগ্যতার মাপকাঠির নীচে বলে সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই ব্যবস্থায় নিম্ন মানের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিও কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। শিক্ষার মানোন্নয়ন কাম্য হলেও ভারতের ন্যায় শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত কড়াকড়ির ফল জনশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় ছিল অর্থাভাব। সরকারী তহবিল থেকে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কোন ব্যপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ হচ্ছিল ১৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, ১৯০১-০২ খ্রীঃ এই অঙ্ক বেড়ে হয় ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। অর্থাৎ বছরে এক হাজার টাকা ক'রেও বাড়ানো হয়নি। অন্য যে-কোন প্রয়োজনে যখন অর্থের অভাব হয়নি, তখন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধিতে এই অহেতুক সরকারী কৃপণতাকে কোন যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় না। জীবনে শিক্ষার কি মূল্য, সে কথা বোঝাবার শক্তি ভারতের অশিক্ষিত জনগণের ছিল না। এইজন্য প্রয়োজন ছিল, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা। হান্টার কমিশন শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় দিকটিকে উপেক্ষা করেছেন। এছাড়া সদ্যোপ্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার কথা বিচার না ক'রে ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না ক'রে একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

।। মাধ্যমিক শিক্ষা ।।

হান্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার নীতি অবলম্বনের উপদেশ দেন। সরকারের এই নীতির ফলে ১৮৮২ খ্রীঃ—১৯০২ খ্রীঃ মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩,৯১৬টি ও ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,১৪,০৭৭ জন। ১৯০১-০২ খ্রীঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৫,১২৪টি, ছাত্রসংখ্যা হয় ৫,৯০,১২৯ জন। অর্থাৎ কুড়ি বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়।

আলোচ্য সময়ে প্রবেশিকা পরিক্ষার্থীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করত। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার চেষ্টা তখনও শুরু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র-রূপেই মাধ্যমিক শিক্ষা তথা প্রবেশিকা পরীক্ষাকে দেখা হত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করত। যারা সে

সুযোগ পেত না, তারা জীবনের চরম কাম্য একটি সরকারী চাকরি বা সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরির সন্ধানে তৎপর হত। প্রবেশিকা পরীক্ষাই ছিল সে যুগের বৃত্তিশিক্ষার পরীক্ষা। যদিও সে বৃত্তি কেরানীর বৃত্তি। তাই, প্রতি বছরই প্রবেশিকা পরিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। ১৮৮২ খ্রীঃ থেকে ১৯০২ খ্রীঃ মধ্যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে যায়। নীচের পরিসংখ্যান দেখলেই এই বৃদ্ধির হার সম্পর্কে ধারণা হবে।

খ্রীস্টাব্দ	প্রবেশিকা পরিক্ষার্থীর সংখ্যা
১৮৮১-৮২	৭,৪২৯
১৮৮৫-৮৬	১৩,০৯৩
১৮৯২-৯৩	১৫,৫০২
১৮৯৬-৯৭	১৮,৩১৪
১৯০১-০২	২২,০৬৭

বাংলা দেশে বৃদ্ধির হার :—

১৮৭২ খ্রীঃ	[illegible],১৪৪
১৮৮২ খ্রীঃ	৩,০০০
১৯৪১ খ্রীঃ	৬,৩০৯

১৯৬৩ খ্রীঃ যেখানে পশ্চিম বাংলায় স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৯ হাজার, সেই তুলনায় সমগ্র বাংলায় ৬ হাজার প্রবেশিকা পরিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই সামান্য বলে মনে হবে; কিন্তু সে যুগের বিচারে এই বৃদ্ধির হার উপেক্ষণীয় নয়।

।। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ।।

মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষা-কমিশন বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে বাণিজ্য ও সাহিত্য বহির্ভূত বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করেন। এই নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে কিছু-না-কিছু বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রীঃ মাদ্রাজে উচ্চতর মাধ্যমিক কোর্স (Higher Secondary Course) প্রবর্তিত হয়। এতে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও কুড়ি বছরে মাত্র ২১০ জন ছাত্র এই পরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। ১৮৯৭ খ্রীঃ বম্বে প্রদেশে স্কুল ফাইনাল কোর্স পরীক্ষার প্রচলন হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পাঠক্রম স্থির হয়। ঐচ্ছিক বিষয়রূপে হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা রাখা হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার ছিল না। সরকারি চাকরির কোন কোন পদে এই পরীক্ষার্থীদের মধ্য হতে নিয়োগ করা হত বলে এই পরীক্ষা বম্বে প্রদেশে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

১৯০১-০২ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩,০০০ হাজার, আর ভিন্নতর পরীক্ষায় (Alternative Examination) প্রার্থী ছিল মাত্র ২,০০০। এর মধ্যে,

১,২০০ প্রার্থী ছিল বঙ্গে প্রদেশে। ১৮৯৪ খ্রীঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এলাহাবাদে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হত। ১৯০১ খ্রীঃ পাঞ্জাবে দু'টি পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়—(১) করণিক ও বাণিজ্য-বিষয়ক পরীক্ষা (Clerical and Commercial Examination), (২) প্রবেশিকা বিজ্ঞান পরীক্ষা।

১৯০০ খ্রীঃ বাংলাদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য 'এ', 'বি', 'সি', তিনটি কোর্স প্রবর্তন করবার ব্যবস্থা হয়। 'এ' কোর্স প্রচলিত প্রবেশিকা পরীক্ষা, 'বি' কোর্স এঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী বিষয়ে যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাদের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা, 'সি' কোর্সে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই কোর্সে অংক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্যিক ভূগোল, অংকন ও একটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত।

বিভিন্ন প্রদেশে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হলেও বৃত্তিশিক্ষার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এলাহাবাদ ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই এই পরীক্ষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার সমকক্ষ বলে গ্রহণ করেনি। ফলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়ায় কেউ এদিকে আসতে চাইত না। যন্ত্রশিল্প শিক্ষাকে এই শিক্ষার মধ্যে স্থান দিলে হয়ত কিছু সুফলের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হাণ্টার কমিশন এদেশ যন্ত্রশিক্ষার উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করেন নি। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মুক্ত, কলেজে না গেলেও যা-হোক একটা চাকরি জুটত। এসব মিলিয়ে বৃত্তিশিক্ষা ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল না।

।। শিক্ষার মাধ্যম ।।

এই সময়ে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী, শিক্ষার বাহন মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সম্পর্কীয় বিতর্কিত প্রশ্নে একটি সিদ্ধান্তে আসবে, এই আশাই করা হয়েছিল। এই সময়ে বঙ্গে বাদে অন্য সব প্রদেশে মাতৃভাষা ভালভাবে শিখবার আগেই ইংরেজী শেখানো শুরু হত। ১৮৮২ খ্রীঃ আমরা দেখি, শিক্ষার অর্থ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার নয়, ইংরেজী জ্ঞানেরই প্রসার। একটা বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত ক'রে সেই ভাষায় নতুন কোন জ্ঞান আহরণ করা যে সহজসাধ্য নয়, একথা শুধুমাত্র বঙ্গে প্রদেশেই জোরের সঙ্গে বলা হয়। বাংলা দেশেই ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী, এখানেই প্রথম ইংরেজীকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়।

কমিশনের সামনে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চ স্তর সম্পর্কে কমিশন একেবারেই নীরব। প্রচলিত ব্যবস্থা চালু থাকুক, এই ছিল নীরবতার অর্থ। মিড্‌ল্ স্কুলের স্তর পর্যন্ত কমিশন প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগকে নিজ নিজ প্রদেশের অবস্থা বিবেচনা ক'রে ব্যবস্থা

অবলম্বন করবার নির্দেশ দেন। স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার পক্ষে এই পরোক্ষ সিদ্ধান্ত যে মাতৃভাষার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজী ভাষার দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে অন্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা কষ্টসাধ্য ছিল, এ ছাড়া শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে-কোন ভাবে ইংরেজী শেখা।

আলোচ্য যুগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়। ১৮৮১ খ্রীঃ ভারতে মাত্র দুইটি ট্রেনিং কলেজ ছিল। একটি মাদ্রাজে, একটি লাহোরে। ১৯০১-০২ খ্রীঃ মধ্যে সৈয়দাকোট, রাজা মহেন্দ্রী, কাসিয়াং, এলাহাবাদ, লাহোর, জব্বলপুর—সব মিলিয়ে ছয়টি ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজগুলি ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কিছু স্কুলও ছিল। প্রতি প্রদেশেই শিক্ষকদের জন্য 'সার্টিফিকেট' পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। একমাত্র বঙ্গে প্রদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য কোন শিক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল না।

।। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ।।

হাণ্টার কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোন অনুসন্ধানের নির্দেশ না দেওয়া হলেও কমিশন উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর লাহোর ও এলাহাবাদে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বতর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হয়। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য Faculty of Oriental Learning বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় ও ভারতীয় ভাষা-চর্চার জন্য ও ভারতীয় ভাষায় আইন-শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হয়।

লাহোরে ভারতীয় ভাষা-চর্চার ব্যবস্থা হলেও এই সময় ভারতের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এরা ইংরেজী শেখাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে এই অনুকূল মনোভাবের ফলে আলোচ্য যুগে ইংরেজী কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ যেখানে মোট কলেজ ছিল ৭২টি (আর্টস্ কলেজ ৬৮টি ও বৃত্তিশিক্ষার কলেজ ৪টি), সেখানে ১৯০১-০২ খ্রীঃ কলেজ সংখ্যা বেড়ে হয় ১৯১টি। এর মধ্যে আর্টস্ কলেজই ছিল ৪৫টি। এই নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির অধিকাংশই বেসরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টার পেছনে ছিল নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা। এই সময়ে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বহু স্কুল কলেজে উন্নীত হয়। একই জায়গায় একই পরিচালনায় স্কুল ও কলেজগুলি পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির শিক্ষা অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল।

ভারতের জাতীয়বাদী নেতৃবৃন্দ, জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে শিক্ষা প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে উন্নত ধরনের পরিচালনায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলতে থাকে। বিজাতীয় প্রভাবমুক্ত এই সব কলেজে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের চরিত্রগঠন ও জাতীয়তাবোধ-উন্মেষের চেষ্টায়

এঁরা ব্রতী হন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, ভি, কে, চীপলঙ্কার এবং জি, জি, আগরকর পুণায় ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন—বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে পরিচিত। লাহোরে আর্য সামাজীরা সংস্কৃত ও হিন্দু শাস্ত্রের চর্চার জন্য 'দয়ানন্দ এ্যাংলো ভেদিক কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি বাধ্যতামূলক করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দয়ানন্দ কলেজ এত বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে যে, প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের ভেতরে পাঞ্জাবের সর্বাধিক ছাত্র-সমন্বিত কলেজে পরিণত হয়। শ্রীমতী এ্যানি বেসান্ত সর্বভারতীয় হিন্দুদের জন্য বেনারসে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজই পরবর্তী কালে বিরাট 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত হয়।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। জাতীয়তা-বাদের উন্মেষের সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহকে শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্বের মত অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে শিক্ষা দেবার জন্য এই সময়ে আন্দোলন চলতে থাকে। ১৮৯২ খ্রীঃ তৎকালীন ভারত সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেবার কথা বিবেচনা করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চ স্তরে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয় না। ১৯০১ খ্রীঃ বিচারপতি রানাডের চেষ্টায় বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পরীক্ষায় দেশীয় ভাষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী কালে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বোম্বাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

এই সময়ে কলেজের ছাত্রসংখ্যাও আশাতীতরূপে বেড়ে যায়। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ আর্টস্ কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫,৩৯৯ জন, ১৮৮৭ খ্রীঃ হয় ৮,০৬০ জন। পরবর্তী কালে কলেজের ছাত্রসংখ্যা কি হারে বাড়তে থাকে, নীচের পরিসংখ্যান থেকেই তা বোঝা যাবে :

খ্রীস্টাব্দ	আর্টস্ কলেজের ছাত্রসংখ্যা
১৮৮১-৮২	৫,৩৯৯
১৮৮৭	৮,০৬০
১৮৮৮	৯,৬৫৬
১৮৮৯	১০,৬১৮
১৮৯০	১১,২৪৬
১৮৯২	১২,৯২৪

দশ বছরের মধ্যে কলেজের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণের বেশী হয়। বি. এ. পরীক্ষাতে পাশের হার বাড়তে থাকে। উচ্চশিক্ষিতদের এই সংখ্যাবৃদ্ধি সমাজ-জীবনে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা বলে কোন

সমস্যা এর পূর্বে ছিল না—আলোচ্য যুগে এই সমস্যার প্রথম সূত্রপাত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৯ খ্রীঃ বলেন, 'আমাদের স্কুল ও কলেজগুলি থেকে যদি শিক্ষিতের সংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকে, তাহলে আমরা যাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলেছি, অদূর ভবিষ্যতে তাদের আর কোন কর্মের সংস্থান ক'রে দিতে পারব না। কারণ, এই জাতীয় শিক্ষা যারা পেয়েছে, তাদের কর্মের ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ।

শিক্ষিত বেকার-সমস্যার সম্ভাবনা ছাড়াও ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হল। পরীক্ষা-পাশই কৃতিত্বের একমাত্র মাপকাঠি বলে নির্ধারিত হওয়ায় যে কোন প্রকারে মুখস্থ ক'রে পাশ করাই শিক্ষার্থীদের চরম লক্ষ্যে পরিণত হয়। সত্যিকারের বিদ্যা কতটা লাভ হল, সে বিচার পরীক্ষায় কতটা সম্ভব, সেকথা ভুলে পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় এই সময় থেকেই ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষার অবাধ আধিপত্য শুরু হয়। পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক কুফল অতি অল্পকালের মধ্যেই দেখা দেয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯০২ খ্রীঃ মন্তব্য করেন—ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষায় পরীক্ষা-ব্যবস্থা সবচেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। পরীক্ষাই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, শিক্ষা দ্বারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না—"The Greatest evil from which University education in India suffers is that teaching is subordinate to examination not examination to teaching"

কলেজ ও স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক গলদ দেখা দেয়। সেনেট যে ভাবে মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, তার ফলে সেখানে দেশের প্রকৃত শিক্ষাবিদ্‌দের স্থান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। দিন দিন মনোনীত সদস্যের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে সেনেট এমন একটা বিরাট সংস্থায় পরিণত হল যে, সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কলেজগুলির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না। পরিদর্শন-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য বেসরকারী কিছু কিছু কলেজে শিক্ষার মানের ও পরিচালনার মধ্যেও অনেক ত্রুটি দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিচালনায় এমন এক জটিলতা দেখা দেয় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের জন্য কমিশন গঠন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

॥ স্ত্রীশিক্ষা ॥

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ অর্থাভাবে কার্যকর করা হয় নি। তার ফলে আলোচ্য যুগে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় নি। বিংশ শতকের শুরুতে

প্রাথমিক বিদ্যালয় (বিংশ শতকের শুরুতে)

১৮৮১—১৯০১-০২

প্রদেশ	১৮৮১-৮২ বিভাগীয়	১৮৮১-৮২ বেসরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত	১৯০১-০২ বিভাগীয়	১৯০১-০২ বেসরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত
মাদ্রাজ	১২৬৩	৭,৪১৪	২,৮৩৬	১১,১২৫
বম্বে	৩৮১১	১৯৬	৪৬৭০	১৯২৯
বাংলা	২৮	৪৭,৩৫৪	২৬	৩৬,০৪৬
উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ	×	×	১৩৫	১৭
যুক্তপ্রদেশ	৫৫৬১	২৪৩	৪৫৯৮	২৪৬৩
পাঞ্জাব	১৫৫৯	২৭৮	১৮০২	৬৩৬
মধ্যপ্রদেশ	৮৯৪	৩৬৮	৯৩১	৮৬৮
আসাম	৭	১২৫৬	১২৬০	১৭৮২
বেরার	৪৬৭	২০৯	৬৪০	৪০০
কুর্গ	৫৭	৩	৭০	১

বিংশ শতকের প্রারম্ভে কলেজীয় শিক্ষার অবস্থা (১৯০১-০২ খ্রীঃ)

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান-সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
আর্টস্ কলেজ—		
পাশ্চাত্যশিক্ষা	১৪০	১৭,০৪৮
প্রাচ্যবিদ্যাশিক্ষা	৫	৫০৩
বৃত্তি-শিক্ষার কলেজ—		
আইন	৩০	২,৭৬৭
চিকিৎসা	৪	১,৪৬৬
এঞ্জিনিয়ারিং	৪	৮৬৫
শিক্ষক-শিক্ষণ	৫	১৯০
কৃষি	৩	৭০
মোট	১৯১	২৩,০০৯

স্ত্রীশিক্ষার সম্পর্কে একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে এই যুগের স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে।

স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠান	১৮৮১-৮২ খ্রীঃ		১৯০১-০২ খ্রীঃ	
	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
আর্টস্ ও সায়েন্স কলেজ	১	৬	১২	১৬৯
মাধ্যমিক স্কুল	৮১	২০৫৪	৪৪২	৯,০৭৫
প্রাথমিক স্কুল	২৬০০	৮২,৭২০	৫,৩০৫	৩,৪৭,৭১১
মিশ্র প্রাথমিক স্কুল	×	৪২,০০১	×	×
প্রাথমিক শিক্ষিকা শিক্ষণ ও অন্যান্য ট্রেনিং স্কুল	১৫	১১৫	৪৫	১,২৫৩
বৃত্তি-শিক্ষার কলেজ	×	×	×	৮৭
অন্যান্য স্কুল	×	×	১৭	১,১১৭
মোট	২৬৯৭	১,২৬,৬৬৬	৫,৮১১	৩,৫৬,৫১৩

Report of the National Committee on Women's Education (Ministry of Education Publication.)

এই সময়ে নারী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। ১২টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১টি—বেথুন কলেজ—সরকারী পরিচালনাধীন ছিল। মাধ্যমিক ৪২২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৫৬টি বেসরকারী পরিচালনাধীন ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালযের ৩৯৮২টি ও ট্রেনিং স্কুলের ৩২টি ছিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করত। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা, শহরের কিছু সংখ্যক মেয়ে ও বম্বে প্রদেশে পার্শী সমাজের মেয়েদের প্রাধান্য দেখা যেত। ১৯০১ খ্রীঃ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মেয়েদের মধ্যে প্রতি এক লক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের ৪ জন ও হিন্দু ১০ জন মেয়ে ইংরেজী শিক্ষা পাচ্ছে।

।। মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা ।।

ভারতীয় শিক্ষায় পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছায় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারণের জন্য মিশনারীগণ বহুদিন থেকে আন্দোলন চালাচ্ছিল। উডের ডেসপ্যাচে তাঁদের সে আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতি

মিশনারীদের প্রাধান্য স্থাপনের পথে বিঘ্ন হয়ে দেখা দিল। হাণ্টার কমিশন মিশনারীদের আন্দোলনের পরোক্ষ ফল। তাই মিশনারীরা আশা করেছিল, হাণ্টার কমিশন তাঁদের স্বপক্ষেই রায় দেবে। হাণ্টার কমিশনের সিদ্ধান্তে মিশনারীদের শেষ আশাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। উডের নীতিকে মেনে নিয়ে যোগ্য বেসরকারী ভারতীয় পরিচালনায় শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করবার সিদ্ধান্তে এদেশের শিক্ষায় মিশনারীদের পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের কোন সম্ভাবনাই আর রইল না।

নতুন পরিস্থিতি মিশনারীরা নতুন ক'রে তাঁদের নীতি-নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রতি দশ বছর অন্তর মিশনারীদের একটি ক'রে সম্মেলন হত। ১৮৭২ খ্রীঃ এলাহাবাদে এরূপ এক সম্মেলনে অভিমত প্রকাশ করা হয়,—স্কুলে পড়ানো মিশনারীদের কাজ নয়। ইংরেজী, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শেখানো সম্পর্কে তাঁদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ লৌকিক শিক্ষা দেওয়া মিশনারীদের কাজ নয়। হাণ্টার কমিশনের সিদ্ধান্তের পর মিশনারীরা স্থির করেন, ভারতীয় খ্রীস্টানদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি উন্নত ধরনের স্কুল ও কলেজের মধ্যে মিশনারী শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা নতুন ক্ষেত্র বেছে নিলেন। আদিবাসী, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশনারীরা তাঁদের শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করেন। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টা ও শিক্ষা-প্রসার প্রচেষ্টা দুই-ই সাফল্য লাভ করে। আলোচ্য যুগে ইন্দোরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, শিয়ালকোটে মারে কলেজ, কানপুরে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ, রাওলপিণ্ডিতে গর্ডন কলেজ প্রতিষ্ঠা মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান।

।। ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস ।।

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে প্রতি প্রদেশে শিক্ষা-বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল, এবং বিভাগীয় কার্য পরিচালনার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিল। সব প্রদেশেই এই সব কর্মচারীদের বেতন ও দায়িত্ব এক রকম ছিল না। হাণ্টার কমিশন বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের নির্দেশ দেন। এই যুগেই সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগ সংগঠিত হয়। শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস (I. E. S.): সর্বভারতীয় চাকরি-শ্রেণীতে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ইন্সপেক্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অফিসারেরা অন্তর্ভুক্ত হলেন। পাঁচশ টাকা বেতনে এই পদে ইংলণ্ড থেকে সরাসরি লোক নিয়োগ করা হত। (২) প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিস (P. E. S.): সরকারী অধ্যাপক, সহকারী ইন্সপেক্টর ও জেলা স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকগণ এই শ্রেণীভুক্ত। D.P.I.-এর সুপারিশে এই পদে লোক নিয়োগ করা হত। (৩) সাব-অরডিনেট সার্ভিস: নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৮৮৬ খ্রীঃ I. E. S.

পদসৃষ্টির সুপারিশ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। I. E. S. ও P. E. S. উভয় শ্রেণীর কর্মচারিগণ সমপর্যায়ভুক্ত বলে ধরা হত। কিন্তু I. E. S. অফিসারগণ বেশী বেতন পেতেন বলে P. E. S.-দের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ বলে গণ্য হতেন।

সাধারণ শিক্ষা-পরিস্থিতি

(১৮৫৪—১৯০২)

১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়। এই নতুন যুগের স্থিতিকাল অর্ধশতাব্দী ব্যাপী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড কার্জন নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরকাল উডের শিক্ষানীতিই ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। * ১৮৫৯ খ্রীঃ স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচও হাণ্টার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ উডের শিক্ষানীতিকে ভিত্তি ক'রেই রচিত। তাঁদের নির্দেশ বা উপদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থায় কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়েছে, কিন্তু মূলনীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 'উডের যুগ' বলে কোন যুগ-বিভাগ নেই, তবু এই যুগকে 'উডের যুগ' বললেই যুগ-বৈশিষ্ট্য অধিক পরিস্ফুট হয়।

এই যুগের বিশেষ যুগবৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা ক'রে Mr. Nurullah ও Mr. Naik তাঁদের গ্রন্থে বলেছেন, 'It is a period of rapid westernization of the educational system, but of Indianization of its agency." মেকলের বিখ্যাত 'মিনিট' লিপিবদ্ধ হবার পর থেকেই ভারত সরকার শিক্ষাকে পাশ্চাত্ত্যকরণের জন্য সবশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু শিক্ষাকে একটা সুসংবদ্ধ রূপ দেবার জন্য সর্বভারতীয়ভাবে কোন নীতি তখনও গৃহীত হয়নি। মেকলের নীতি শুধু মাত্র বাংলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। মেকলের মন্তব্য ও লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রস্তাব গৃহীত হবার পরও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধের মীমাংসা হয়নি। বম্বে ও মাদ্রাজ প্রদেশ মেকলের মন্তব্যে প্রভাবিত হলেও দুই প্রদেশেরই নিজস্ব শিক্ষানীতি ছিল। উডের ডেসপ্যাচ শিক্ষাক্ষেত্রের বহু বাদ-প্রতিবাদের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শিক্ষাকে একটা সুনির্দিষ্ট সর্বভারতীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর এই নীতিই অর্ধশতাব্দী কাল ভারতের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এমন কি, লর্ড কার্জনের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবসমূহ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করলেও উডের নির্দেশিত মূল নীতিকে সাধারণভাবে সমর্থনই করেছে। স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে ও পরে শিক্ষা-সংস্কারের জন্য বহু কমিশন নিযুক্ত হয়েছে—প্রয়োজনীয় সংস্কারও হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন শিক্ষাজগতে হয়নি, যার ফলে আমরা বলতে পারি যে, উডের নির্দেশিত শিক্ষা-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারাকে দৃঢ়রূপে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ উডের নির্দেশের পর থেকে সুশৃঙ্খলভাবে শুরু হয়। পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি পাশ্চাত্ত্যকরণের কাজ

সরকারী নীতির মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হলেও ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী পরিচালন ও মিশনারী আধিপত্য হ্রাস পেয়ে আসছে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারে ভারতীয়দের প্রচেষ্টা এযুগের স্মরণীয় অবদান। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের অর্থে ও শ্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্রতী হয়। উনবিংশ শতকের শেষে দেখা যায়, বেসরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

আলোচ্য যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতের বুকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরেজকে সাম্রাজ্য-বিপন্নকারী কোন যুদ্ধে এযুগে আর লিপ্ত হতে হয় নি। মোঘল যুগের অবসান সময়ে দেশব্যাপী যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, ইংরেজ শাসনে সেই অরাজকতা দূর হয়ে দেশে শান্তি ফিরে আসে। জীবন ও ধন সম্পর্কে মানুষের মনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হওয়ায় শিক্ষিত মানুষ ভারতে ইংরেজ শাসনকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবার পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব বজায় ছিল। মিশনারীদের শিক্ষা-প্রসার প্রচেষ্টার সঙ্গে ধর্মান্তরিতকরণের দুরভিসন্ধি এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে এদেশের মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পর ইংরেজের সদিচ্ছা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় কমতে থাকে। বহুদিন পর দেশে শান্তি ফিরে আসায় মানুষের মনে ইংরেজ সম্পর্কে আস্থার ভাব সৃষ্ট হয়। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু না হওয়া পর্যন্ত দেশে এ আবহাওয়াই বজায় ছিল। উড মিশনারীদের সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তবু সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন—"Education conveyed in them should be exclusively secular." লৌকিক শিক্ষা প্রচারের আদর্শ গ্রহণ করাতেও শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে গ্রহণ করায় এদেশবাসীর মনে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে যে সংশয় ছিল, তাও দূর হয়। বাংলায় এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইংরেজী শেখার যে উগ্র আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষা ও শিক্ষা-পরিচালনা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দেশ তার নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতীয়তাবোধ উন্মেষের কোন সম্ভাবনা নেই, একথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে। এই যুগেই পরবর্তী যুগের বিরোধের বীজ উপ্ত হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। এ যুগের সহযোগিতা পরবর্তী যুগে অসহযোগিতায় পরিণত হয়।

১৮১৩ খ্রীঃ থেকে শিক্ষায় যে যুগের শুরু হয়, তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ ব

য়। বাদ-প্রতিবাদই ছিল সেই যুগের বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গঠন (Construction)। এই যুগেও বাদপ্রতিবাদ ছিল, কিন্তু সেই বিতর্কের আবর্তে শিক্ষায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। শিক্ষা গতিশীল, তাই এর অগ্রগতির সঙ্গে কিছু জটিলতা, কিছু সমস্যা দেখা দেবেই। একটি দেশের সজীব শিক্ষা-ব্যবস্থার এটাই স্বাভাবিক প্রাণধর্ম—আলোচ্য যুগ তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সেই সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে অচলায়তনের সৃষ্টি করে নি। উড-নির্ধারিত নীতিকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা এগিয়ে চলেছে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকার উৎসাহ দিয়েছে, আর্থিক সাহায্য করেছে, তার ফলে ভারতীয় প্রচেষ্টায় দেশে শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটেছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারে ভারতীয় প্রাধান্য শুধু এই যুগের একটি বিশিষ্ট ঘটনা নয়—এর ফলে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী প্রাধান্যের সম্ভাবনা দূর হয় ও পরবর্তী কালে শিক্ষাকে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি ও বেসরকারী পরিচালকদের মধ্যে দেখা দেয়।

উডের ডেসপ্যাচ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই সরকারী শিক্ষানীতিকে নির্ধারিত ক'রে দিয়েছিল। এই সময় ভারতে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা-পরিচালনার জন্য শিক্ষাবিভাগ গঠিত হয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। চুঁইয়ে-নামা নীতির ব্যর্থতা স্বীকার ক'রে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারে সরকারকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকার ক'রে স্ত্রীশিক্ষার জন্য উদ্যোগী হতে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার দ্বারা বেসরকারী শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার ব্যবস্থা হয়। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকালে এই নীতিই শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। আবার শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে সব দোষত্রুটি পরবর্তী কালে দেখা দিয়েছিল, তার বীজও উডের ডেসপ্যাচেই নিহিত ছিল। মাতৃভাষার অবহেলা, বৃত্তি-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের অভাব, গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার পরোক্ষ ফলস্বরূপ অতিরিক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষায় লাল ফিতার অবাধ আধিপত্যের সূচনা প্রভৃতির জন্য আমরা উডের ডেসপ্যাচকে দায়ী করতে পারি। ১৮৫৪ খ্রীঃ থেকে ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত যে যুগকে আমরা পর্যালোচনা করলাম, সেই যুগকে শিক্ষায় 'উডের যুগ' বলাই সঙ্গত। ঐতিহাসিক জেম্সের ভাষায় বলতে পারি—

"The Despatch of 1854 is thus the climax in the history of Indian education, what goes before leads upto it, what follows flows from it."

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের শিক্ষা পরিসংখ্যান

১৮৬০-৬১ হতে ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ

	১৮৬০-৬১	১৮৭০-৭১	১৮৮১-৮২	১৮৯১-৯[illegible]
প্রাথমিক শিক্ষা :—				
বিদ্যালয়	৫,৪৫০	১৫,৯২১	৮৬,২৬৯	৯৭,১[illegible]১
ছাত্রসংখ্যা	২,০১,২৪৫	৫,১০,৫৭৪	২১,৫৬,২৫২	২৮,৩৭,৬০[illegible]
মাধ্যমিক শিক্ষা :—				
বিদ্যালয়	১৪২	৩,১১৬	৪,১২২	৪,৮৭২
ছাত্রসংখ্যা	২৩,১৬৫	২,০৬,৩০০	২,২২,০৯৭	৪,৭৩,২৯[illegible]
কলেজীয় শিক্ষা :—				
আর্টস কলেজ	১৭	৪৪	৬৭	১৫৪
ছাত্রসংখ্যা	৭,১৮২	৩,৯৯৪	৬,০৩৭	১২,৯৮০
বিশেষ শিক্ষা :—				
প্রতিষ্ঠান	২৬	১০৪	২৩৮	৫৫[illegible]
ছাত্রসংখ্যা	১,৯৩৭	৪,৩৪৬	৯,১৫০	১১,০[illegible]
বৃত্তি-শিক্ষার কলেজ :—				
প্রতিষ্ঠান	৮	১৯	১৮	৩০
ছাত্রসংখ্যা	৬,৭৯	২,১২৬	১,৫৪৫	৩,২৯২
মোট :—				
প্রতিষ্ঠান	৫,৬৪৩	১৯,২৩৪	৯০,৭১৪	১,০২,৬৭৬
ছাত্রসংখ্যা	২,৩০,২০৮	৭,৩৪,৩৪০	২৩,৯৫,০৭১	৩৩,৪৮,৯১০

নবম অধ্যায়

লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন

১৮৯৯ খ্রীঃ লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শাসনকাল নানাভাবে স্মরণীয়। গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে তিনি একজন জবরদস্ত শাসক বলে পরিচিত। গোড়া সাম্রাজ্যবাদীরূপে তিনি যে কুখ্যাতি ভারতীয়দের নিকট অর্জন করেছিলেন, আজ বহুদিন বাদে কার্জনের বিভিন্ন সংস্কারের পর্যালোচনা ক'রে মনে হয়, তিনি যতটা কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, ততটা কুখ্যাতি তাঁর প্রাপ্য নয়। যদি তিনি ভারতীয়দের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সংস্কারকার্যে ব্রতী হতেন, তাহলে তিনি তাঁর কার্যের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবীই করতে পারতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতে এসেছিলেন ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা অবিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে। তাঁর সমস্ত সংস্কারের পিছনে যে মনোবৃত্তি সক্রিয়, ছিল, তা হচ্ছে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে ধ্বংস ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করা। ফলে তিনি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা, কি বিশ্বাস কিছুই অর্জন করতে পারেননি। তাঁর সদিচ্ছা প্রণোদিত সংস্কারসমূহের তীব্র সমালোচনা হয়েছে, এবং কার্জনের প্রতিটি কাজ দেশের জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখেছে।

ঊনবিংশ শতকের ভারতের জাতীয় জাগরণকে ইংরেজ খুব সুনজরে দেখেনি। ইলবার্ট বিল, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যেই যে ভবিষ্যৎ ঝড়ের ইংগিত রয়েছে, ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় তা বুঝতে পেরে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্ট হয়। প্রাক্তন সিভিলিয়ান্ মিঃ হিউম চেয়েছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সংহত ক'রে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব যাতে দেশের মধ্যে গড়ে না ওঠে, সে ভাবে জনমতকে চালিত করতে। ভারত সরকার প্রথমে কংগ্রেস সম্পর্কে উদার ভাব অবলম্বন করলেও কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদীদের প্রাধান্য স্থাপিত হলে বিরূপ মনোভাব দেখাতে শুরু করে। জাতীয়তার এই সুসংহত রূপটিকে শাসক সম্প্রদায় সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস প্রথম থেকেই শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির সমালোচনা শুরু করে। বিদেশী সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা জাতীয় ভাবধারা বিকাশের পরিপন্থী, এ সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার জন্য এর পূর্বেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শিক্ষাকে জাতীয়ভাবাপন্ন ক'রে তুলতে হবে, যন্ত্র-শিক্ষার

আয়োজন করতে হবে, শিক্ষিত সমাজের এই দাবীকে কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে স্বীকার ক'রে নেওয়ায় জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের মুখপাত্রের স্থান গ্রহণ ক'রে। জাতীয়তার প্রকাশ শুধুমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে নতুন আদর্শে জাতীয় ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছিল। লাহোরে দয়ানন্দ এ্যাংলো বেদিক কলেজ ও কাশীর শ্রীমতী বেশান্তের সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। এছাড়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীন ও প্রাচীনের সমন্বয়ে নতুন ধরনের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হয়। এভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতীয় সংস্কৃত ও ঐতিহ্য এবং এদেশীয় ধর্মকে আসন দেবার ও শিক্ষা-প্রকৃতিকে দেশীয়ভাবাপন্ন করবার একটা চেষ্টা এ সময়ে দেখা গেল। কার্জন বড়লাট হয়ে এসেই জাতীয় মনোভাব যাতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী প্রভাব বাড়িয়ে জাতীয়তাবাদকে অঙ্কুরেই বিনাস করবার চেষ্টায় ব্রতী হন। শিক্ষা হতে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার-নীতিকে তিনি ত্যাগ ক'রে সেখানে সরকারী প্রভাব বেশী ক'রে বিস্তার করতে চাইলেন। এই জন্যই কার্জনের প্রতিটি সংস্কার এদেশবাসীর সন্দেহের ও সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কার্জন ভারতে এসেই এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মনোযোগী হন। তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কারের কাজে তিনি যেভাবে ভারতীয়দের বর্জন করবার নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তার ফলে শিক্ষিত সমাজের মনে কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের উদয় হয়। ১৯০১ খ্রীঃ তিনি সিমলায় ভারতের শিক্ষা-সমস্যা আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তা (D.P.I.) ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভিন্ন মাদ্রাজ খ্রীস্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিলার উপস্থিত ছিলেন। কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সম্মেলনে কার্জন ভারতের শিক্ষা-সমস্যা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা ক'রে শিক্ষার উন্নতির উপায় সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এক পক্ষ কাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সম্মেলনে ১৫০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবগুলির মুসাবিদায় কার্জন অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কার্জনের সময়ের বিভিন্ন শিক্ষাসংস্কার ও ১৯০৪ খ্রীঃ ভারত সরকারের শিক্ষানীতি-বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ এই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি ক'রেই রচিত হয়।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
(Indian Universities Commission—1902)

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রথম তিনটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গঠিত হবার পর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির

আর কোন সংস্কার হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমস্যা প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের তদন্তের আওতার বাইরে রাখা হয়। কমিশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও কলেজের সংখ্যা-বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রায় দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গলদ দূর করবার প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেনেটের সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায় ও সভ্যগণ আজীবন-কালের জন্য মনোনীত হওয়ায় সদস্য সংখ্যা বেড়ে একটা বিরাট সংস্থায় পরিণত হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ দেখা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য-সংখ্যা ১৮১ জন, বম্বের ২২৬ জন, মাদ্রাজের ১৯৮ জন, পাঞ্জাবের ১৩২ জন ও এলাহাবাদের ১১২ জন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে যে ত্রুটি ছিল, তার সংস্কারও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। উড সুপারিশ করেছিলেন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে হবে। তার ফলে দেশের প্রধান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও কলেজ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের মধ্যে তাদের কার্যক্ষেত্র সীমায়িত রেখেছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'বার সংস্কার হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সংস্করণগুলিরও পুনর্গঠন প্রয়োজন, এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সচেতন হন। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে আমরা দেখেছি, ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে কোন সংস্কার হলেই ভারত সরকার এ দেশের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে অবহিত হতেন। তার পূর্বে দেশের লোকের কোন আবেদন-নিবেদনই তাঁদের সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারত না।

পরিবর্তিত শিক্ষা-পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ায় ১৯০২ খ্রীঃ ২৭শে জানুয়ারী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে প্রথম কোন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয়নি, পরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামীকে ভারতীয় সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

কমিশনকে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তদন্ত ক'রে তাঁদের অভিমত জানাতে বলা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন সুপারিশ করবার অধিকার কমিশনকে দেওয়া হয়নি। এর ফলে কমিশন কলেজীয় শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষাকে সমগ্রভাবে বিচার ক'রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করতে পারেনি। কমিশনের সামনে প্রশ্ন ছিল কোন্ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের পক্ষে উপযোগী এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরিবর্তিত ক'রে বাঞ্ছিত রূপ দেওয়া যায়।

কমিশন অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের কাজ শেষ ক'রে সুপারিশ-সহ বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। স্যার গুরুদাস অন্য সদস্যদের সঙ্গে একমত হতে না পারায় ভিন্ন রিপোর্ট পেশ করেন।

॥ কমিশনের সুপারিশ ॥

কমিশন নিয়োগকালে আলিগড়, নাগপুর, বাঙ্গালোর, ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিবান্দ্রম, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন চলছিল। কমিশন মন্তব্য করেন, দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন নেই। দেশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী হয়নি বলেই তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণ-ধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা সম্পর্কে কমিশন বলেন, অনুমোদিত কলেজগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অবিলম্বে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গঠন করা সম্ভব নয়। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির ক্ষমতা-বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজস্ব অধ্যাপক নিযুক্ত ক'রে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গঠন করা যায়।

কমিশন সুপারিশ করেন, স্নাতক নিম্নস্তরের শিক্ষার দায়িত্ব অনুমোদিত কলেজগুলি গ্রহণ করবে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে।

কমিশন প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিশন মন্তব্য করেন, নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনের ফলে কাজের কিরূপ উন্নতি হয়, তা পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজন। অর্থাৎ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কমিশনের সুপারিশের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয় যে, সেনেটের সদস্যসংখ্যা কমিয়ে সেনেটের আয়তন হ্রাস করা হবে। কোন সদস্য পাঁচ বছরের বেশী সেনেটের সভ্য থাকতে পারবে না। প্রতি বছর সেনেটের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের পদত্যাগ করতে হবে। সেনেটে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক ও দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যাতে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সিণ্ডিকেটকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে এবং সদস্য-সংখ্যা নয় থেকে পনেরজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এঁরা সেনেটের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

কমিশন কলেজের অনুমোদনের জন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেবার সুপারিশ করেন। কলেজের অনুমোদনের পূর্বে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে একবার অনুমোদন-লাভের পর যাতে কলেজের শিক্ষার মানের অবনতি না হয়, বিশ্ববিদ্যালয় সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান করবে। প্রতি কলেজের বিধিসঙ্গতভাবে গঠিত পরিচালকমণ্ডলী থাকবে ও কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। ছাত্রের বাসের জন্য ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থানীয় অবস্থা

উচ্চশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন ও ছাত্রদের আর্থিক অবস্থার কথা বিচার ক'রে সিণ্ডিকেট অনুমোদিত কলেজগুলির জন্য একটা নিম্নতন বেতনের হার নির্ধারণ ক'রে দেবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ সম্পর্কে বলা হয়, ভবিষ্যতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কলেজের আর অনুমোদন দেওয়া হবে না। পূর্ব-অনুমোদিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করতে হবে, না হয় এদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পর্যায়ভুক্ত করা হবে।

পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ক'রে শিক্ষার মানোন্নয়নেব জন্য কমিশন কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইংরেজী সম্পর্কে সুপাবিশ করা হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে কোন নির্দিষ্ট বই থাকবে না। ইংরেজী ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার্থীকে মাতৃভাষা অথবা কোন একটি প্রাচীন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভাষা পাঠ্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উপযোগিতাকে স্বীকাব করলেও কমিশন ডিগ্রী-পরীক্ষায় ভারতীয় ভাষা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন বলেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষাব মান উন্নত করতে হবে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বিলুপ্তি ঘটিয়ে বি. এ. পরীক্ষার পাঠকাল বাড়িয়ে তিন বছর করা হবে। বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে নিয়ম-কানুন কঠোরতর করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েব পবীক্ষা ও ডিগ্রীর একই রূপ নামকরণ করতে হবে।

।। সমালোচনা ।।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট রচনায় কমিশনের সভ্যগণ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংস্কার আইনের (১৮৯৮ খ্রীঃ) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গঠন ও পরবর্তী সংস্কারে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকায় দেশের প্রয়োজন ও বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কথা কারো মনে ওঠেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এজন্য মন্তব্য করেন—In 1902 as in 1857 the policy of London seemed to be the latest word of educational statesmanship. There were four features of the London changes whose influence is directly perceptible in the Indian discussions.……Thus once again, as so often before, educational controversy in England had its echo in India.

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশসমূহ সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট। সমগ্রভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তাব সম্পর্কে কমিশন ভেবে দেখেননি। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ কমিশনের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। সিমলা বৈঠকের সময় থেকেই কার্জনের সদিচ্ছায় ভারতীয় জনসাধারণ সন্দিহান ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে প্রথমে কোন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয়নি, এবং কমিশনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হতে না পারায় স্যার গুরুদাস পৃথক্ রিপোর্ট পেশ

করেন। ফলে দেশবাসীর মনে কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে জনসাধারণ যখন বিশেষ আগ্রহশীল, ঠিক সেই সময়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র পরীক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যে কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকায় দেশবাসী সন্তুষ্ট হয়নি। এছাড়া কলেজের অনুমোদন-ব্যবস্থায় কড়াকড়ি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের বিলোপসাধন, বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে কঠোরতর বিধি-প্রণয়ন প্রভৃতিকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের শিক্ষা-সংহার প্রচেষ্টার নামান্তর বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে কমিশন কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এর উন্নতি সাধন করতে চাননি। প্রচলিত ব্যবস্থাকে কি করে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন ক'রে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, সে কথাই চিন্তা করেছিলেন।

কমিশনের সুপারিশসমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রশংসনীয় নির্দেশও ছিল, একথা স্বীকার না করলে কমিশনের উপর অবিচার করা হবে। উপযুক্ত অধ্যাপকমণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতির ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খ্রীঃ)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ ও ভারত সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে ঘোষিত নীতিসমূহের উপর ভিত্তি ক'রে ১৯০৪ খ্রীঃ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি উপস্থাপিত করা হয়। বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কাউন্সিলে লর্ড কার্জন বলেন,—

"Its main principle is·········to raise the standard of education all round, and particularly to higher education. What we want to do is to apply better and less fallacious tests than at present exist, to stop the sacrifice of everything in the colleges which constitute our University system to cramming, to bring about better teaching by a superior class of teachers, to provide for closer inspection of Colleges and Institutions which are now left practically alone, to place the Government of the Universities in competent, expert and enthusiastic hands, to reconstitute the Senates, to define and regulate the powers of the Syndicates, to give statutory recognition to the elected Fellows, who are now only appointed to sufferance, ············to show the way by which our Universities which are now merely examining boards can ultimately be converted into teaching institutions; in fact, to convert higher education in India into

reality instead of shame. These are the principles underlying the Bill."

ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯০৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে ইম্পিরিয়া-লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই বিলটি পাস করা হয় এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খ্রীঃ) নামে পরিচিত হয়।

এই আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এইজন্য অধ্যাপক নিয়োগ, শিক্ষার উন্নতির জন্য দানগ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, গবেষণাগার গড়ে তোলা, ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস স্থাপন, ছাত্রদের অধ্যয়ন, আচরণ, নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হল।

আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে, সেনেটকে অধিকতর কার্যকরী ক'রে তোলবার জন্য সেনেটের সদস্য-সংখ্যা হ্রাস করা। এর পূর্বে সেনেটের সদস্যগণ চির-জীবনের জন্য নির্বাচিত হতেন এবং সদস্য-সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না। এর ফলে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সেনেটে স্থান পেয়েছিলেন এবং ক্রমবর্ধমান এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের কাজ সেনেটের দ্বারা চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই আইনের স্থির হয়, সেনেটের ফেলোর সংখ্যা পঞ্চাশ জনের কম ও একশ জনের বেশী হবে না। আজীবন সদস্যের পরিবর্তে সদস্যদের কার্যকাল পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়।

১৮৯০ খ্রীঃ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ফেলো নির্বাচিত হতেন। এই আইনে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য গ্রহণে আংশিকভাবে নির্বাচনের নীতিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। স্থির হয় যে, পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ২০ জন ও নতুন দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন ক'রে ফেলো নির্বাচনের ভিত্তিতে গৃহীত হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য সিণ্ডিকেট থাকলেও আইনের চক্ষে এর কোন স্বীকৃতি ছিল না। এই আইনে সিণ্ডিকেটকে আইনগতভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। সিণ্ডিকেটে যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক প্রতিনিধির স্থান পাবার সুযোগ দেওয়া হয়।

এই আইনে অনুমোদিত কলেজসমূহের মান উন্নয়নের জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হয়। কলেজের অনুমোদন দান ও বাতিল করা সরকারী অনুমতিসাপেক্ষ করা হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেনেট এই আইনকে কার্যকরী করতে না পারলে প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন বা নতুন নিয়ম প্রণয়নের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। পূর্ব আইনে বিধি প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল সেনেটের, সে সব বিধান সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল, সরকার দরকার হলে সেনেট-প্রণীত বিধান বাতিল ক'রে দিতে পারত, কিন্তু নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে পারত না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকা সুনির্দিষ্ট না থাকায় কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, একটি কলেজ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন

লাভ করেছে। কোন ক্ষেত্রে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার কলেজ অন্য বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এই আইনে সপরিষদ বড়লাটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

।। সমালোচনা ।।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উনবিংশ শতকের শেষ ভাগেই দেখা দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আর কোন সংস্কার হয়নি। হাণ্টার কমিশনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কারের কোন সুযোগ ছিল না। এদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষার দাবীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছিল না। লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস ক'রে শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অভাব মেটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আইনে এমন কয়েকটি ধারা সন্নিবদ্ধ হয়েছিল, যার ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতীয় সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। বরং প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে তাঁরা প্রসারিত করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকারের শিক্ষা-নীতিতে সবভাবে ভারতীয়দের বর্জন করবার মনোভাব অত্যন্ত নগ্নরূপে প্রকাশ পাওয়ার সরকারী সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভারতীয়দের মনে এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, এই আইনের মধ্যে সরকারী দুরভিসন্ধির সন্ধানই তাঁরা পেয়েছেন। দেশবাসীর মনে ধারণা হল যে, সরকার শিক্ষা-সংস্কারের নামে দেশীয় শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দিতে চান।

সিমলা শিক্ষা-সম্মেলনে ভারতীয়দের সহযোগিতা পরিহার করবার পর থেকেই কার্জনের শিক্ষানীতি সম্পর্কে এদেশে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ ক'রে দেশব্যাপী যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পটভূমিকায় কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আজ অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল অতীত হয়েছে, বঙ্গভঙ্গের উত্তাপ আর নেই, আজকের পরিস্থিতিতে কার্জনের শিক্ষানীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা যতটা সম্ভব, সেই সময়ে তা হয় নি। তার ফলে কার্জনের উপর কিছুটা অবিচারও আমরা করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলবার প্রস্তাবে শিক্ষিত সমাজের পূর্ণ সমর্থন ছিল, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্পর্কে তাঁদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন, আইনে সে অর্থের কোন সংস্থান করা হয়নি।

সেনেটের ফেলো আংশিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নেওয়া হবে, এই নীতিতে দেশবাসী সন্তোষ প্রকাশ করলেও নির্বাচিত সদস্য-সংখ্যা এত অল্প নির্ধারিত হয় যে, এই আইন দ্বারা সেনেটের ইউরোপীয় দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতালাভ হবে বলে অনেকে ভীত

হয়ে ওঠেন। এটা কার্জনের চক্রান্ত বলেই তাদের মনে ধারণা হয়। এছাড়া, অধ্যাপক সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে করা হয়নি বলে অসন্তোষ দেখা দেয়। শিক্ষক সম্প্রদায় বা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এই আইনে ছিল না।

কলেজ অনুমোদন-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের কঠোরতাকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়। ভারতীয় প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ ক'রে সরকার শিক্ষা-সংকোচন নীতিকে কার্যকরী করতে ইচ্ছুক, এই ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি জনগণের অত্যন্ত বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কলেজের অনুমোদন, সদস্য-মনোনয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য-পরিচালনার জন্য বিধান-প্রণয়ন প্রভৃতি বহু ক্ষমতা সরকারের কুক্ষিগত হবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের একটি শাখায় পরিণত হবে বলেই অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এই আইনের নিন্দার দিক্ ছাড়াও গঠনমূলক একটা দিক্ ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেওয়া দরকার, এই আইনের রচয়িতারা প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার উন্নতিবিধানের জন্য অধিক মনোযোগী ছিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে "সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত" বলে যে অভিযোগ করা হয়, তার কারণ হচ্ছে শিক্ষা-বিষয়ক একটা আইনে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ দেওয়া হবে আশা করা গিয়েছিল, সেদিক্ থেকে সবাইকে হতাশ হতে হয়েছে। তবুও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থায় এ সময়ে যে গলদ দেখা দিয়েছিল, তার সংস্কারের জন্য যে এরকম একটি আইনের দরকার ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। দেশবাসীর মনে কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক মনোভাবের জন্য এরূপ একটা অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই আইনের গঠনমূলক দিকের সঠিক বিচার ক'রে এর মূল্যায়ন তাঁরা করতে পারেননি। তৎকালীন বহু আশঙ্কাই যে অমূলক, তা পরে প্রমাণিত হয়েছিল।

এই আইনে সেনেট পুনর্গঠিত হলে সেনেটের কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেনেটে ইউরোপীয় দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের হাতে চলে যাবে বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক উন্নতি হয়েছে, একথা বিশিষ্ট ভারতীয়গণ স্বীকার করেন। ঘন ঘন সেনেট ও সিণ্ডিকেটের অধিবেশনের ফলে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও সুষ্ঠু সমাধানের সম্ভাবনা সেনেটের কার্যকরী শক্তিবৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

আইনে কলেজের অনুমোদন-ব্যবস্থায় অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিল বলে এই ধারার তীব্র সমালোচনা হয়। কিন্তু এতে যে শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, একথা সবাই স্বীকার করেছেন। অনুমোদন ব্যবস্থায় কড়াকড়ির ফলে এই সময়ে কিছু কলেজ উঠে যায়। ১৯০২ খ্রীঃ অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭৭টি,

১৯০৭ খ্রীঃ কলেজের সংখ্যা কমে গিয়ে হয় ১৭৪টি। এতে নিকৃষ্ট স্তরের অবাঞ্ছনীয় ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্র কলুষিত হবার সম্ভাবনা অনেকটা দূর হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরিদর্শন ও অনুমোদন ব্যবস্থায়, কঠোরতায় ভারতীয় প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। কিছু দিনের মধ্যেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় অধিকতর কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। তাই দেশবাসীর মনে যে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়।

অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী ক'রে তোলার প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হবে না বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাও অমূলক প্রমাণিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এর পূর্বে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য দেওয়া হত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কার্য পরিচালনার জন্য কোন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনও হত না। পরীক্ষা-গ্রহণ ও নিজস্ব দপ্তরের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা পরীক্ষার ফি বাবদ যে অর্থ পাওয়া যেত সেই অর্থে ব্যয় কুলিয়ে আরও কিছু টাকা বেঁচে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী ক'রে তোলা যেমন এই আইনের একটি বিশিষ্ট অবদান, তেমনি এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সরকারী তহবিল থেকে অর্থ ব্যবস্থা করা কার্জনের কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৯০৪-০৫ খ্রীঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা, পরিদর্শন-ব্যবস্থার উন্নতি ও গৃহনির্মাণ, জমিক্রয় প্রভৃতির জন্য দেওয়া হয়। সাড়ে তের লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকারসমূহকে কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য দেওয়া হয়। প্রথমে এই সাহায্য পাঁচ বছরের জন্য করা হবে স্থির হলেও এ সাহায্য স্থায়ীভাবে দেওয়া হতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, এই আইন ভারতীয়দের মনে যে আশঙ্কা ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল, তার অধিকাংশই অমূলক। বেসরকারী প্রচেষ্টার অবসান, শিক্ষাসংকোচন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ইউরোপীয় প্রাধান্য, অর্থের অনটনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা প্রভৃতি কোন অঘটনই এই আইনের ফলে ঘটেনি! লর্ড কার্জন যেভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী হস্ত বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। এ সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের ভাষায় আমরা বলতে পারি—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ :—"the most completely Governmental Universities in the world."

ভারত সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব

(Government of India's Resolution on Indian Educational Policy, 1904)

১৯০৪ খ্রীঃ ১১ই মার্চ লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি এক সরকারী প্রস্তাবে প্রকাশ করেন। সিমলা সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। এই প্রস্তাবসমূহের উপর ভিত্তি করেই সরকারী-ভাবে এক শিক্ষা-বিষয়ক পত্র প্রকাশিত হয়। এই শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে ভারতের শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে দেশের তৎকালীন শিক্ষার প্রকৃত চিত্রটি উদ্ঘাটিত করা হয়। একদিক থেকে এই শিক্ষা-পত্রটি অভিনব। সরকারের তরফ থেকে দেশের শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ আর এভাবে কোনদিন প্রকাশ করা হয়নি। এতে বলা হয়েছে, ভারতের প্রতি পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতেই কোন বিদ্যালয় নেই। চারটি ছেলের মধ্যে তিনটি ছেলে কোনরূপ শিক্ষা পায় না এবং চল্লিশটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে সামান্য লেখাপড়া শেখে।

প্রস্তাবে স্বীকার করা হয় বিগত কুড়ি বছরে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, কিন্তু এ বিস্তার আশানুরূপ হয় নি। উচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন ক্রমে সরকারী চাকরি লাভ। শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় প্রকৃত শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল। শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরীক্ষা-কেন্দ্রিক। ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষা নিতান্তই পুঁথিগত হয়ে পড়েছিল। স্কুল কলেজে বুদ্ধির উৎকর্ষ অপেক্ষা স্মৃতিশক্তির অনুশীলনই হচ্ছিল। ইংরেজী শিক্ষার অতিরিক্ত আগ্রহে মাতৃভাষার চর্চায় যথোচিত উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রস্তাবে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা ক'রে কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত সরকার উডের ডেসপ্যাচ ও হাণ্টার কমিশনের নির্দেশিত নীতি অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার-নীতিকে গ্রহণ ক'রেও কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শরূপে রাখবার সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া উপযুক্ত সরকারী পরিদর্শনের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবার ব্যবস্থা হয়। পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁরা শুধু শিক্ষার ফলাফলেরই বিচার করবেন না, শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কেও উপদেশ দেবেন।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হলেও তাতে আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকা উচিত নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যে হারে হচ্ছিল, শিক্ষার প্রসার সে অনুপাতে হয় নি। ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ দেশে ১৬,৪৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬,০৭,৩২০

জন ছাত্র ছিল, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ এই সংখ্যা বেড়ে স্কুলের সংখ্যা হয় ৮২,৯১৬টি ও ছাত্রসংখ্যা হয় ২০,৬১, ৫৪১ জন। কিন্তু দশ বছর বাদে ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ স্কুলের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭,১০৯টি হয় এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ২৮,৩৭,৬০৭ জন। ১৯০১-০২ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৯০,৫৩৮টি হয়, বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমলেও ছাত্রসংখ্যা কমেনি। এই সময় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩২,৬৮,৭২৬ জন, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলতে পারছিল না। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৩,০২০টি থেকে ৫,৪৯০টি হয়, ছাত্রসংখ্যাও সে অনুপাতে ২,০৪,২৯৪ জন থেকে—দ্বিগুণেরও কিছু বেশী ৫,৫৮,৩৭৮ জন হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় বিগত পঁচিশ বছর কালের মধ্য বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় ছিল ১৬,০০,২৩৯ টাকা। ১৯০১-০২ খ্রীঃ দেখা যায়, এই খাতে ব্যয় হচ্ছে ১৬,৯২,৫১৪ টাকা অর্থাৎ পঁচিশ বছরে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ও বাড়েনি। তাই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছিল, যদিও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের কোন উল্লেখযোগ্য আয়োজন হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে সে মনোযোগ দেওয়া, অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা কোনটাই হয় নি। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সঙ্গে একমত হয়ে প্রস্তাবে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকররূপে প্রসার রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য—"The active extension of Primary education is one of the most important duties of the state."

অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হচ্ছে না, তাই স্থির হয় প্রাদেশিক রাজস্বের একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করবে না। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি বছর তাদের শিক্ষা-বাজেট নিজস্ব এলাকার পরিদর্শকের মারফৎ শিক্ষা-অধিকর্তার (D.P.I.) নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাবে।

গ্রামের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পল্লী অঞ্চলের জন্য পাঠক্রম রচিত হলে শিক্ষার উপযোগিতা বাড়বে। শিক্ষা পদ্ধতি সকলের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য হবার মত করে সহজতর করতে হবে। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে কৃষিবিদ্যার প্রবর্তন হয়। পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান-নীতি (Payment by results) পরিহার করতে ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও ট্রেনিং ব্যবস্থার কথা প্রস্তাবে বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে কার্জন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ-সাধনের উপর জোর দেওয়ায় সেখানে শিক্ষা সংকোচনের দায়িত্ব নিয়ে মানোন্নয়ন করবার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তার। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই

প্রথম স্বীকার করা হয়—প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত-বিস্তার রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ও শহরের শিক্ষাধারা একই রকম হবে, এমন কোন কথা নেই। পল্লীর প্রয়োজনের দিকে চেয়ে পল্লী-অঞ্চলের শিক্ষা-ব্যবস্থার নির্দেশও বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক। প্রস্তাবে পল্লীর শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—

"The aim of the rural school should be, not to impart definite agricultural training but to give the children a preliminary training which will make them intelligent cultivators, will train them to be observers, thinkers, and experimenters in however humble a manner, and will protect them in their business transactions with the landlords to whom they pay rent and with the grain dealers to whom they dispose their crops The reading books prescribed should be written in simple language, not in unfamiliar literary style, and should deal with topics associated with rural life. The Grammar taught should be elementary, and only native systems of arithmetic should be used. The village map should be thoroughly understood, and most useful course of instruction may be given in the accountant's papers, enabling every boy before leaving school to master the intricacies of the village accounts and to understand the demands that may be made on the cultivator."

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

বিগত ত্রিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবনীয় প্রসারকে প্রস্তাবে "একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা" বলা হয়েছে। এই শিক্ষার প্রসারের স্বীকৃতির সঙ্গে এই সংখ্যাগত বৃদ্ধির কুফলের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবাধ বিস্তারের ফলে শিক্ষার মান যাতে নেমে যেতে না পারে সেজন্য প্রস্তাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন সম্পর্কে কড়াকড়ি করতে বলা হয়। অনুমোদন দেবার আগে দেখতে হবে—

—"that it is actually wanted, that financial stability is assured, that its managing body, where there is one, is properly constituted, that it teaches the proper subjects upto a proper standard, that due provision has been made for the instruction, health, recreation and discipline of the pupils, that the teachers are suitable as regards character, number and qualifications, and that the fees to be paid

will not involve such competition with any existing school as will b unfair and injurious to the interests of education." (*Govt. Resolu tion on Education 1904*)

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অনড় হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক (mechanical) হয়ে যাচ্ছিল। পাঠক্রমে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা ক'রে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করতে বলা হয়।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়—প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থা নেই ও স্থান থাকবে না। মাতৃভাষার স্থান ইংরেজী গ্রহণ করবে এই নীতি সরকা গ্রহণ করতে চায় নি। একথা সত্য যে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ পরীক্ষা ইংরেজীতে গ্রহ করবার ফলে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর উপর স্কুলে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়— এতে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ অবহেলিত হচ্ছে। শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় কিছুটা অগ্রস না হওয়া পর্যন্ত ও মাতৃভাষার ভিত্তি দৃঢ় না হলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হবে না। ইংরেজ শিক্ষা দেওয়া শুরু হবার পর যেন এ ভাষায় অন্য বিষয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা না হয়। এ ফলে ছেলেরা না বুঝে মুখস্থ করতে শিখবে, কিন্তু যে বিষয় তাদের শেখানো হল তা সক্রিয় ভাবে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হবে না। শিক্ষার্থীর কমপক্ষে তের বছর বয়স পার হবা পর ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। কোন অবস্থাতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষাকে ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না—

"English has no place, and should have no place in scheme primary education. It has never been part of the policy of Goverr ment to substitute English language for the vernacular dialects the country···As a general rule, a child should not be allowed t learn Eeglish as a language until he has made some progress in th primary stages of instruction and has received a thorough groundin in his mother tongue. It is equally important that when the teach ing of English has begun, it should not be prematurely employed a the medium of instruction in other subjects Much of the practice too prevalent in Indian schools of committing to memory ill under stood phrases and extracts from text-books or notes, may be trace to the scholars having received instruction through the medium English before their knowledge of the language was sufficient t enable them to understand what they were taught. The line division between the use of Vernacular and of English as medium o instruction should broadly speaking be drawn at a minimum ag of 13. No scholar in a Secondary school should, even then b allowed to abandon the study of his Vernaculor, which should b

kept up until the end of the school course." (*Govt. Resolution of 1904*). এই প্রস্তাবে মাতৃভাষার গুরুত্বকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার ক'রে বলা হয়েছে যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষাকে অবহেলা ক'রে, তাহলে ভাষা কথ্যভাষার স্তরে নেমে যাবে। কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য তাতে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। দেশীয় ভাষা সম্পর্কে এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

।বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়—কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো ও গঠন পদ্ধতি ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে ইউরোপের শিক্ষাদর্শের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষত্রুটি দূর ক'রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ক'রে তাকে শিক্ষণধর্মী রূপ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার অত্যাবশ্যক বলেই মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও সংস্কারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উপর দেওয়া হয়েছিল বলে শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নি। অত্যাবশ্যক সংস্কার সম্পর্কে শুধুমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। অনিবার্য কারণে সেনেটের আয়তন অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনন্দিন কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তাই সেনেটের পুনর্গঠন ক'রে তাকে কাজ চালানোর উপোযোগী ক'রে তুলতে হবে। সিণ্ডিকেটের আইনগত মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। অনুমোদিত কলেজগুলির পরিদর্শনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন কলেজের অনুমোদনের পূর্বে শিক্ষার উন্নতমান সেখানে রক্ষিত হবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে অনুমোদন দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ ও শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবের উপর ভিত্তি ক'রেই বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচিত হয়েছিল।

॥ অন্যান্য সংস্কার ॥

লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষার অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করেছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত এমন সব বিষয়েও তার মনোযোগ ছিল। কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় কারিগরী শিক্ষা প্রধানতঃ সরকারী প্রয়োজন মেটাতে উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষার দিকেই চালিত হয়েছে। দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ প্রস্তাব-পত্রে করা হয়। কৃষিপ্রধান দেশে যেখানের এক-তৃতীয়াংশ লোকের উপজীবিকা কৃষি-সেখানে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা ছিল, তা দিয়ে দেশের কোন প্রয়োজন মেটানই সম্ভব নয়। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করবার নির্দেশ ও ভারতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে শিক্ষা-পত্রে সুপারিশ করা হয়েছিল।

শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সরকারী পত্রে করা হয়। দেশের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাবে মোটেই সন্তোষ প্রকাশ করা হয়নি। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে আরও অর্থব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অধিক সংখ্যক পরিদর্শিকা নিয়োগের কথা প্রস্তাবে বলা হয়।

লর্ড কার্জনের এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব তথ্য ও নীতি সমৃদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতীয় শিক্ষার প্রসার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে বহু মূল্যবান পরামর্শ প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা শুধু নীতিগত ভাবেই স্বীকার করে কর্তব্য শেষ করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বৃত্তিশিক্ষা সম্পকীয় বিশেষ মূল্যবান প্রস্তাবসমূহ আজও অবহেলিত রয়েছে। ইংরেজীকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করা ও প্রাচ্য-বিদ্যা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ নীরবতা এই মূল্যবান শিক্ষা-পত্রের প্রধান ত্রুটি।

চারুকলার স্কুলগুলির সংস্কার কার্জনের আর একটি বিশিষ্ট অবদান। এই স্কুলগুলি ভারতীয় চারুকলা ও শিল্পের কোন উন্নতি সাধন করতে পারেনি বলে অনেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে উঠিয়ে দেবার দাবী জানান। কার্জন এই বিদ্যালয়গুলির সংস্কার ক'রে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। কৃষির সংস্কারের জন্য শুধু নীতি নির্ধারণের মধ্যেই কার্জনের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময়ে দেশে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য কয়েকটি কলেজ ছিল, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই বিদ্যার প্রয়োগে কলেজীয় শিক্ষা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। কার্জন কৃষি-বিভাগ সংগঠন করেন, কৃষিবিদ্যার সর্বোচ্চ শিক্ষার জন্য পুসায় কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার স্থাপন করেন। প্রাদেশিক সরকারকে কৃষিবিদ্যার জন্য কলেজ স্থাপনের ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কৃষিবিদ্যা চর্চার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কার্জন উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে যাওয়ার সুবিধার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

'শিক্ষায় ধর্মের স্থান' এই আলোচনা সিমলা শিক্ষা সম্মেলনে হয়েছিল। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হয় সরকার লৌকিক শিক্ষাদানের মধ্যেই শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখবে। শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবেও সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। তবে পাঠক্রমে নীতিশিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা রাখবার নির্দেশও দেওয়া হয়। কার্জন ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন—কিন্তু বহু-ঘোষিত ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহসী হননি।

কার্জনের শিক্ষানীতির বহু নিন্দা করা হলেও একটি কাজের জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। দেশের অতীত গৌরব বিজড়িত স্মৃতিস্তম্ভগুলি অবহেলা ও অযত্নে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কার্জন এই স্মৃতিসৌধ, স্তম্ভ ও প্রাচীন চিত্রকলার

নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণ আইন (Ancient Monuments Preservation Act of 1904) প্রণয়ন করেন।

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক শিক্ষা-দপ্তরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে সংযোগ ও কার্যের সমন্বয় সাধনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই অভাব দূর করবার জন্য কার্জন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাইরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন (Director General of Education) পদ সৃষ্টি করেন।

।। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ।।

লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাবের ফলে দেশে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু ক'রবার জন্য তাঁর বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার ফলে এই অসন্তোষ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করবার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলনে দেশের ছাত্ররাও দলে দলে যোগ দেয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান সরকার মোটেই সুনজরে দেখেনি। সরকার থেকে এক সার্কুলার জারী করা হল, স্কুলের ছাত্ররা কোন সভা বা শোভাযাত্রায় যোগ দিলে তাদের কঠোর-ভাবে শাসন করা হবে। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী এই বিশ্বাসে শিক্ষিত সমাজ পূর্বেই প্রভাবিত হয়েছিল। সরকারের এই নির্দেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সরকারী প্রভাবমুক্ত জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুললেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি দেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) স্থাপিত হয়। এইজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তোলা হয়। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য বিস্তৃত খসড়া তৈরি হয়। উচ্চতম শ্রেণী থেকে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত কোথায় কি পড়ান হবে, তা স্থির হয়। কলকাতায় ন্যাশন্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। যাদবপুরে যন্ত্র শিক্ষার জন্য 'টেকনিক্যাল' স্কুল স্থাপিত হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে দূরে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপকভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এই প্রথম। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে ন্যাশন্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। জাতীয় বিদ্যালয়গুলিও ধীরে ধীরে উঠে যায়। বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়েও যাদবপুরের টেকনিক্যাল স্কুলটি ধীরে ধীরে উন্নতি ক'রে ১৯৫৬ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

।। শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের দান ।।

ইংরেজ শাসকদের মধ্যে লর্ড কার্জনের কার্যের যে পরিমাণ সমালোচনা হয়েছে ও ভারতীয় সমাজ যে ভাবে তাঁর তীব্র নিন্দা করেছেন, কার্জনের পূর্ববর্তী কোন ইংরেজ শাসককে এরূপ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। ভারতীয় জনমত তাঁর বিরুদ্ধে যাবার জন্য তিনিই অনেকখানি দায়ী। সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক মনোভাবে তিনি এমন আচ্ছন্ন ছিলেন যে এদেশের লোকের মতামতের কোন মূল্য দেবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। কার্জনের শিক্ষানীতি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে এদেশের শিক্ষিত সমাজ তাঁর প্রতিটি সংস্কার গূঢ় অভিসন্ধিমূলক বলে সন্দেহ করেছেন। তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য মহামতি গোখলে কার্জনকে ভারতের শিক্ষা-জগতের ঔরঙ্গজেব বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি, তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতি অনেকাংশেই অমূলক ছিল। তবু তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমন বিক্ষুব্ধ আকার ধারণ করেছিল যে, কার্জনের সংস্কারের সঠিক মূল্য নিরূপণ সে যুগে সম্ভব হয়নি। কার্জনের মনোভাব যাই থাকুক যদি কাজের কর্মফল দেখে বিচার করতে হয়, তাহলে কার্জন আমাদের নিকট কিছুটা প্রশংসার দাবী করতে পারেন। বঙ্গ-বিভাগের যুগ আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। তার চেয়ে অনেক বড় ক্ষতিকে আমরা মেনে নিয়েছি। তাই ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে বিচার ক'রে কার্জনকে আর খুব বড় অপরাধী বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি যে পরিশ্রম করেছেন, তাতে আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। শিক্ষার প্রতিটি বিভাগে তাঁর সমান মনোযোগ ছিল। যে মনোভাব নিয়েই তিনি শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হন না কেন, তার ফল দেশের পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছিল। আমরা দেখেছি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সদিচ্ছা মাত্র প্রকাশ ক'রে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি—প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও তিনি করেছিলেন। মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থা ও অনুমোদন বিধানের কঠোরতা শিক্ষার মান-উন্নয়নের সহায়কই হয়েছিল। বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা কৃষিবিভাগের পুনর্গঠন ও কৃষিবিদ্যার সংস্কার এবং গবেষণার উন্নতি, মাতৃভাষা অনুশীলনে উৎসাহ দান, প্রভৃতির জন্য তিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। দেশবাসীর ভয় ছিল শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে কার্জন শিক্ষা সংকোচন করতে চায়, কার্যতঃ তা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউরোপীয় কবলিত করবার ইচ্ছা যদি তাঁর থেকেও থাকে বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। বরং বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেনেটের ও সিণ্ডিকেটের পুনর্গঠনে প্রশাসনিক দিকে উন্নতির সহায়কই হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী ক'রে তোলার চেষ্টা তাঁর সময় থেকেই শুরু হয়। শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব তিনি স্বীকার করে নেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায় কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা কার্জনের ছিল—জাতীয়তাবাদকে তিনি অঙ্কুরেই বিনাস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তার সংস্কার পরবর্তীকালে কল্যাণকরই হয়েছিল। জাতীয় স্মৃতি সৌধ রক্ষার

আইন প্রণয়ন ক'রে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন। সবদিক থেকে বিচার করলে শাসক লর্ড কার্জনকে আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, শিক্ষাসংস্কারক-রূপে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। অধ্যাপক অমরনাথ ঝা কার্জন সম্পর্কে বলেছেন—

"Now that the ashes of the numerous strifes are cold, all Indians are grateful to the wise statesmanship of the Great Viceroy who did so much to preserve our ancient monuments and raise our educational standards By these achievements he still lives, and generations of Indians will bless him for them." (*As quoted by Syed Nurullah & J. P Naik*).

দশম অধ্যায়

কার্জন থেকে দ্বৈতশাসন

(১৯০৪—১৯২১)

ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব (১৯১৩ খ্রীঃ)
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা
উচ্চ শিক্ষার সমস্যা
মাধ্যমিক শিক্ষা
মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা
প্রাথমিক শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা বিল—
গোখেলের প্রচেষ্টা
স্ত্রী-শিক্ষা
মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা
ফলশ্রুতি

লর্ড কার্জন যখন ভারত ত্যাগ করেন, তখন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করবার জন্য স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করায় এই রাজনৈতিক আলোড়নের প্রতিক্রিয়া শিক্ষা জগতেও প্রতিফলিত হয়। ছাত্রগণ দলে দলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে সরকারী দমন-নীতি রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে। ফলে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব গণচেতনার সঞ্চার হয়। বিদেশী শোষণ ও শাসনের নগ্ন রূপ শিক্ষিত সমাজকে জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

ভারতের নবজাগরণের ইতিহাস সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের নব জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় (১৯০৫) আধুনিক প্রাচ্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পাশ্চাত্ত্য শক্তি অজেয় এই ভ্রান্তি দূর হয়ে এশিয়ার জাতিসমূহ আত্মশক্তি সম্পর্কে নব চেতনা লাভ ক'রে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বন্ধন-মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। পারস্য ও তুরস্কে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল মাঞ্চুবংশের অবসানে চীনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার" এই মহাবাণী ভারতীয়দের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুরু হয়। জাপানের মত ভারতও একদিন জগৎ-সভায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান মর্যাদার অধিকারী হবে, এই বিশ্বাস ভারতবাসীর মনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে।

নবজাগ্রত ভারত শাসক সম্প্রদায়ের সকল নীতিই আর অবনত মস্তকে মেনে নিতে চাইছিল না। কার্জনের শিক্ষানীতি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁর শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা হয়। কার্জনের ভারত-ত্যাগের পর তার কোন কোন নীতি পরবর্তী বড়লাটগণ পরিবর্তন করেন। জনমতের প্রবল দাবীর নিকট মাথা নত ক'রে সরকার বঙ্গবিভাগ রহিত করতে বাধ্য হয়। কার্জন

শিক্ষিত ভারতীয়দের তাঁর শাসন পরিষদে স্থান দিতে রাজী ছিলেন না। মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের (১৯০৯ খ্রীঃ) ফলে শাসন পরিষদে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। মর্লি-মিণ্টো সংস্কারকে উপলক্ষ করেই আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ্যভাবে দেখা দেয়। ভারত সরকারও নানাভাবে এই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেয়। মুসলিম সম্প্রদায় সরকারী প্রশ্রয়ে পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দাবী করে। হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ দাবী দেখা দেয়। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করে।

কার্জনের অন্যান্য নীতির পরিবর্তন হলেও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির কোন পরিবর্তন হল না। ভারত সরকার অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে তার নীতিকে কার্যকরী করতে তৎপর হয়ে উঠল। ভারতের শিক্ষা-প্রসারের পথে প্রধান বাধা ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা। সরকারী রাজস্বের অতি সামান্য অংশই শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হত। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় কর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করত, এ বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি অকিঞ্চিৎকর। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার একটা স্থিতাবস্থায় এসে দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য কার্জন এই খাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করেন। পরবর্তী বড়লাটরা এই ব্যবস্থা চালু রাখেন। ১৯০১-০২ খ্রীঃ শিক্ষার জন্য সারা ভারতে মোট ব্যয় হত ১০৪ লক্ষ টাকা, ১৯২১-২২ খ্রীঃ এই ব্যয় বেড়ে হয় ৯০২ লক্ষ টাকা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সরকারী বাজেটে ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্ত হতে শুরু করে। এই উদ্বৃত্ত অর্থের একটা অংশ শিক্ষার জন্যও ব্যয় হত। এই আর্থিক সচ্ছলতার ফলে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই কমবেশী প্রসার লাভ হয়। তবে এই অতিরিক্ত অর্থের একটা বিরাট অংশই সরকার-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যয় করা হত। সেই তুলনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য খরচ অনেক কম ছিল। সরকারী মনোযোগ এ সময় পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা প্রসারের দিকেই নিবদ্ধ ছিল বলে সরকারী বরাদ্দ অর্থ সেইজন্যই বেশী ব্যয় করা হত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে স্বীকার করেও এজন্য যথোচিত অর্থ বরাদ্দ করা হয় নি।

ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব

(১৯১৩ খ্রীঃ)

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের কার্পণ্যে সাধারণের মধ্যে সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার দাবী জানায়। মহামতি গোখলে রাজকীয় আইন পরিষদে এই উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করেন। এই পরিস্থিতিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণকালে ১৯১২ খ্রীঃ ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দানকালে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উক্তি

তৎকালীন ভারত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেন,

"It is my wish that there may spread over the land a net work of school and colleges from which will go forth loyal and manly and useful citizens, able to hold their own industries and agriculture and all the vocations in life And it is my wish, too, that the homes of my Indian subjects may be brigtened and their labour sweetened by the spread of knowledge with all that follows in its train, a higher level of thought of comfort, and of health It is through education that my wish will be fulfilled, and the cause of education in India will ever be very close to my heart"

এই ভাষণের কিছুদিন বাদেই দিল্লী দরবারে শিক্ষার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা ঘোষণা করা হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ ও গোখলের প্রাথমিক শিক্ষাবিলের প্রতিক্রিয়ায় বিলাতের পার্লামেন্টের সদস্যগণও ভারতে শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেন। ১৯১২ খ্রীঃ ৩০ শে জুলাই পার্লামেণ্ট-সভায় ভারতের জন্য ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা কালে সহকারী ভারত সচিব স্বীকার করতে বাধ্য হন ভারতের শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারের আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। তিনি বলেন, যদি সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জনকে স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বয়সের বলে ধরা হয়, তাহলে ভারতে এর মধ্যে শতকরা ৪ জন ছেলে ও ৭ জন মেয়ে স্কুলে যায়। দিল্লী-দরবারে প্রতি বছর শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ৩,৩০,০০০ পাউণ্ড বার্ষিক যে ব্যয়-মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই অর্থ পুরোপুরিই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৯০,০০০ হবে, অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। দ্বিগুণ-সংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। প্রতিটি স্কুলের জন্য বার্ষিক ২৫ পাউণ্ড ব্যয় করা হবে। যে সব অঞ্চলে স্কুল নেই, সেখানে স্কুল স্থাপন করা হবে এবং পুরানো স্কুলগুলির জন্য যেখানে বার্ষিক মাত্র দশ টাকা ব্যয় করা হয় স্কুলের উন্নতির জন্য তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হবে।

।। সরকারী প্রস্তাব ।।

চারদিকের অবস্থার চাপে ভারত সরকার ১৯১৩ খ্রীঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী নীতি প্রস্তাবাকারে প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব-পত্রে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পর শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কীয় কতগুলি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাব-পত্রে প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে, ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। সরকারী অনবধানতার জন্য বহু নিম্ন মানের বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন ও সাহায্যলাভে সমর্থ হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনার পর প্রস্তাব-পত্রে তিনটি মূল নীতির কথা বলা হয়েছে :—

১। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা মান-উন্নয়নের জন্য অধিক মনোযোগ দেওয়া হবে।

২। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ছাত্রদের জন্য অধিকতর কার্যকরী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

৩। বিদেশে না গিয়ে যাতে ভারতীয় ছাত্ররা গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায় সেজন্য ভারতে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

মূলনীতি নির্ধারণের পর প্রস্তাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়।

।। বিভিন্ন শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয় ।।

লিখন, পঠন, অঙ্ক, অঙ্কন, প্রাকৃতিক পাঠ, শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি শিক্ষণ-যোগ্য বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা হবে।

উপযুক্ত কেন্দ্র নির্বাচন ক'রে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রয়োজন-বোধে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে।

প্রধানতঃ বোর্ড-স্কুলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা হবে। আর্থিক কারণে তা সম্ভব না হলে অনুমোদিত স্কুল, অন্যথায় পাঠশালায় ও মক্তবগুলিকে সাহায্য দিয়ে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহিত করা হবে। হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা স্কুলের (Venture School) উপর ভরসা করা হবে না।

সারা ভারতের গ্রাম ও শহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম স্থির করা সম্ভব নয়। তবে পল্লী-অঞ্চলের পাঠক্রম রচনায় স্থানীয় ভূগোল, প্রকৃতি পরিচয় সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা সম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষক পেলেই পাঠক্রমে অধিকতর বৈচিত্র্য সাধন সম্ভব।

সমাজের যে শ্রেণীর বালক-বালিকারা শিক্ষালাভ করবে, সেই শ্রেণী থেকেই শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে। শিক্ষকদের উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের বেতন ১২ টাকার কম হবে না। শিক্ষকদের জন্য পেন্সন বা প্রভিডেন্টফাণ্ডের ব্যবস্থা থাকবে।

একজন শিক্ষককে ৫০ জনের অধিক ছাত্র পড়াতে হবে না। এই সংখ্যা ৩০।৪০ জনের মধ্যে হলেই ভাল হয়।

প্রতি শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক রাখবার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

মধ্যস্কুল বা মাধ্যমিক দেশীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর স্থানে অল্পব্যয়ে স্কুলগৃহ নির্মাণ করা হবে। নারী শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব পত্রে স্বীকার করা হয় দেশে নারী শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়নি। মেয়েদের জন্য দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পাঠক্রম ('Practical with reference to the position which they would fill in social life') রচনার ব্যবস্থা করা হবে।

মেয়েদের শিক্ষা-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে না। শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষিকা ও পরিদর্শিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

উডের ডেসপ্যাচে ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বেসরকারী উদ্যোগকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, শিক্ষা প্রস্তাবে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সেই নীতিই সমর্থিত হয়। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র হতে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি প্রত্যাহারের নীতিকে সমর্থন করা হয়নি। বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে রাখবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

চিরাচরিত পাঠক্রমের বদলে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠক্রম রচনা করা হবে। উন্নত পরিদর্শন-ব্যবস্থার দ্বারা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান-উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য অধিক সংখ্যায় শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

১৯০৪ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার পর ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপ্রণালী ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করেন শিক্ষাদানের জন্য "ফেডারেল" বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মোটেই উপযোগী নয়। এতে শিক্ষার উন্নতি কি প্রসার কোন দিকেই সুবিধা নেই। তাই 'ফেডারেল' বিশ্ববিদ্যালয় গঠন পদ্ধতি ইংলণ্ডে বর্জন করা হয়। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষণ-ধর্মী ঐকিক (Unitary) ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতে এসে পৌছায়। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কার্যকরিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

শিক্ষা-প্রস্তাবে বলা হয়, সমগ্র ভারতের জন্য ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৮৫টি কলেজ উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান দুইটি কাজই থাকবে। ঢাকা, আলিগড়, বেনারস প্রভৃতি স্থানে আবাসিক ঐকিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়।

পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। এজন্য বর্ধিত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্পর্কীয় সুপারিশগুলি তখনই কার্যকর করা হয়নি। কারণ কার্যে রূপ দেবার আগে এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

এই প্রস্তাব-পত্রে আরও কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ ছিল। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পেন্সন ও প্রভিডেন্টফাণ্ডের ব্যবস্থা, বৃত্তি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী নৈতিক শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা

(১৯০৫ খ্রীঃ—১৯১৯ খ্রীঃ)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) গৃহীত হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় প্রভূত উন্নতি হয়। সেনেটের আয়তন হ্রাস পাওয়ায় কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কলেজীয় শিক্ষার উন্নতি ও বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণ-ধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপ দেবার কাজে কর্তৃপক্ষ অধিকতর মনোযোগী হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কার্যবিধি প্রণয়ন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ, পাঠক্রম রচনা, কলেজ পরিদর্শন, কলেজ ও বিদ্যালয় অনুমোদন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন রচিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার পূর্বে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার থেকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করা হত না। সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল পরীক্ষা-গ্রহণের যন্ত্রবিশেষ। পরীক্ষার ফিস্ বাবদ যে অর্থ আয় হত, অনেক সময় সে অর্থের একটা অংশ উদ্বৃত্ত থাকত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট একটি অফিসের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য সামান্য অর্থই ব্যয় হত। সেনেট সিণ্ডিকেটের সদস্যরা নিজ নিজ খরচেই যাতায়াত করতেন। এঁদের সভার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হত না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে নিজস্ব গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতির জন্য প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা করে পাঁচ বছরের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করেন। পরে এ ব্যবস্থা স্থায়ী সাহায্যে পরিণত হয়। এই টাকা থেকে ১,৩৫,০০০ টাকা শুধু মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত করা হয়। এই সাহায্য ছাড়াও ১৯১১-১২ খ্রীঃ এককালীন ১৬,০০,০০০ টাকা ও পৌনঃপৌনিক ২,৫৫,০০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য সরকার থেকে মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য (১৯১২-১৭ খ্রীঃ) উদার হস্তে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে এককালীন দানস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ৪৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মিণ্টো অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য ১৯১০ খ্রীঃ ১০,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল, ১৯১৩ খ্রীঃ এই টাকা বাড়িয়ে বার্ষিক ১৩,০০০ টাকা করা হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়। আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ক'রে সাহয্য মঞ্জুর করা হয়। ১৯০১ খ্রীঃ সরকার থেকে শুধু মাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালকে দেওয়া ২৯,৩৮০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সবসমেত ব্যয় হত বছরে ৭,২১,০০০ টাকা। ১৯২১-২২ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকার থেকে সাহায্য পেত ২০,৫৪,০০০ টাকা, এর মধ্যে বাংলাদেশের জন্য দেওয়া হত ৮,৬৫,১৩২ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য এ সময়ে সবসাকুল্যে ব্যয় হত ৭৪,১৩,০০০ টাকা। সরকারী সাহায্য, পরীক্ষার ফিস, বেসরকারী দান প্রভৃতি নানা সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্থিক স্বচ্ছলতার সৃষ্টি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব

বাড়ী, সেনেট হল, গ্রন্থাগার প্রভৃতির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে স্থবিধা হয়।

আলোচ্য যুগেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯২১ খ্রীঃ ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটিতে শুধুমাত্র শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন ও শিক্ষণ এই মিশ্র জাতীয় ছিল। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাতে ধীরে ধীরে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সে চেষ্টা হচ্ছিল। ১৯০৪ খ্রীঃ পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ভিন্ন অন্য বিষয়ের জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়। ১৯১০ খ্রীঃ অর্থনীতির জন্য মিণ্টো অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯১২ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জন লেকচারার ও ৫৫০ জন ছাত্র ছিল। স্যার আশুতোষের পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষা কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হয়। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের জন্য দু'টি কাউন্সিল সৃষ্টি করা হয়। স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের ২৫ লক্ষ টাকা দানে উচ্চতর গবেষণা ও স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) বিভাগ খোলা হয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভারত ও বিদেশের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীদের দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ছাত্রদের জন্য প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় ও ভাষা-বিজ্ঞানের জন্য উইলসন অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা চর্চার জন্য সাধোলাল রীডারশিপ পদের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের নির্দেশ অনুসারে কলেজসমূহের পরিদর্শন-ব্যবস্থায় কড়াকড়ি শুরু হওয়ায় কলেজীয় শিক্ষার মান উন্নত হয়। অনুমোদন দান-ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রচিত হওয়ায় বিভিন্ন কলেজের পরিচালনা ও শিক্ষার মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য ছিল, তা দূর হয়। অনুমোদন ও পরিদর্শন ব্যবস্থার কঠোরতায় শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে কার্যতঃ কিছু কলেজ কমে গিয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা কমেনি। ১৯০২ খ্রীঃ কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪৫টি, ১৯১২ খ্রীঃ কলেজ কমে গিয়ে হয় ১৪০টি। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা এই সময়ের মধ্যে ১৭,৬৫১ জন থেকে ২৯,৬৪৫ জন হয়। নিম্নমানের কিছু কলেজ উঠে গেলেও উচ্চ-শিক্ষার প্রসার হয়। ব্রিটীশ ভারতে ১৯২১-২২ খ্রীঃ কলেজ সমূহে দেখা যায় ৪৫,৪১৮ জন শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা (General education) লাভ করেছে। এই সময়ে সারা ভারতে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৪,৩৭৩ জন। কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ২০০% বৃদ্ধি পেয়ে ছিল।

সাধারণ শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটলেও বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত প্রসার এই যুগে হয়নি। ১৯২১-২২ খ্রীঃ দেশে কলা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার কলেজ ছিল ১৬৭টি আর বৃত্তি শিক্ষা

কলেজ ছিল ৫২টি, এতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩,৬৬২ জন। এর মধ্যে ২০টি ছিল শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ১৫টি আইন কলেজ, ৮টি মেডিকেল কলেজ, ৬টি কৃষিবিদ্যালয়, ৫টি বাণিজ্য বিদ্যালয়, ৩টি পশু ও ৩টি বন বিভাগীয় বিদ্যালয়। চিকিৎসা, আইন ও শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১০,৫৪৩ জন, অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষা পাচ্ছিল ৩,১১৬ জন। বৃত্তিশিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা এই যুগে ছিল, তা উচ্চতর বৃত্তি। সাধারণের পক্ষে চিকিৎসা কি আইন শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন ক'রে নিম্নস্তরের শিক্ষায় বৈচিত্র্যসাধনের সুপারিশ করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তখনও কিছু করা হয়নি।

এই যুগে কলেজের ছাত্রসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, কলেজীয় শিক্ষার মানও তেমনি অনেক উন্নত হয়। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, সুরম্য অট্টালিকা, সুসজ্জিত গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি সব দিক্ থেকেই কলেজগুলির মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কলেজের বেতন বেড়ে যাওয়ায় ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজ-গুলির আর্থিক সচ্ছলতা বেড়ে যায়, ফলে পরিচালকগণ কলেজের শিক্ষার উন্নতির জন্য অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হন। ছাত্রদের বেতন-বৃদ্ধি ছাড়াও এই সময় সরকার থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করা হতে থাকে। ১৯০৫ খ্রীঃ থেকে পাঁচ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রসারের জন্য বছরে পাঁচ লক্ষ ক'রে মোট ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। এই টাকার মধ্যে পাঁচ বছরে সাড়ে তের লক্ষ টাকা কলেজীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। পরে এই সাহায্য স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হলে বার্ষিক ৩,৬৫,০০০ টাকা কলেজগুলির জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হয়। ১৯০৭-১২ খ্রীঃ এই পাঁচ বছরে ভারত সরকার বার্ষিক আরও ২,৪৫,০০০ টাকা কলেজীয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করে। এ ছাড়া কলেজভবন-নির্মাণ, ছাত্রাবাস প্রভৃতির জন্য প্রতি বছর অর্থ সাহায্য করা হত। ১৯২১-২২ খ্রীঃ সাধারণ শিক্ষার জন্য কলেজগুলির জন্য ৪৯·২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১৫·২৮ লক্ষ টাকা বেসরকারী কলেজের সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়।

১৯০৯ খ্রীঃ ভারতীয় ছাত্রদের ইংলণ্ডে থেকে শিক্ষা-গ্রহণের সুবিধার জন্য লণ্ডনের ক্রমওয়েল রোডে একটি সংবাদ-সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। যে সব ইংরেজ পরিবার ভারতীয় ছাত্র গ্রহণে প্রস্তুত, এই সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ছিল সেই খবর দিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করা।

॥ উচ্চ-শিক্ষার সমস্যা ॥

আলোচ্য সময়ে কলেজীয় শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটলেও এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হয়। এই যুগে কলেজীয় শিক্ষা প্রধানতঃ সাধারণ শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বৃত্তিশিক্ষার ব্যাপক কোন আয়োজন এই যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখা যায় না। প্রথম অবস্থায় কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ ক'রে বের হলেই সরকারী বিভাগে বা অন্য কোন স্থানে একটা চাকরি মিলত। এই সময়ে সাধারণ শিক্ষাই ছিল

বৃত্তিশিক্ষার পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু দলে দলে ছাত্র যখন গ্রাজুয়েট হয়ে বের হতে লাগল, তখন সবার পক্ষেই উপযুক্ত চাকরি সংগ্রহ করা আর সহজ রইল না। শিক্ষিত বেকার সমস্যা বলে একটা নতুন সমস্যা আমাদের সমাজ-জীবনে দেখা দিল। বৃত্তিশিক্ষার যে সামান্য আয়োজন ছিল, তাতে স্থান সংকুলান হত না বলেই সাধারণ শিক্ষার জন্য এত ছাত্র ভীড় করত। সাধারণ শিক্ষা কিরূপভাবে বিস্তার লাভ করছে তা বোঝা যায়, যখন দেখি যেখানে ১৯১২ খ্রীঃ বি. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,৩৫৮ জন, ১৯১৭ খ্রীঃ সেখানে বি. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮০৮৯ জন। অন্য কোন সহজতর পথ খোলা ছিল না বলেই বাধ্য হয়ে এত ছাত্র সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করছিল। দেশে উচ্চশিক্ষার আয়োজন হয়েছিল সত্য, কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল উপযুক্ত সরকারী কর্মচারী সৃষ্টিই হবে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কার্যতঃ দেখা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা যেন সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করবার নির্দেশ ডেসপ্যাচে থাকলেও সেই সুপারিশকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা অতি সামান্যই হয়েছিল। ফলে, উচ্চশিক্ষার যে ব্যবস্থা হল সেই সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ ক'রে চাকরির সন্ধান ভিন্ন অন্য কোন পথ শিক্ষার্থীদের সামনে আর খোলা থাকত না। শিল্প বাণিজ্যের প্রসার না হওয়ায় ও কারিগরী শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় উডের ইচ্ছাই আমাদের জীবনে কার্যকরী হচ্ছিল।

॥ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ॥

১৮৮৭ খ্রীঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ত্রিশ বছরের মধ্যে নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। উচ্চশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সমগ্র ভারতের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব বহন করা অসম্ভব হওয়ায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় হয়নি, এরূপ সুপারিশ করায় কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারে ব্রতী হলেও নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হননি। ১৯১৩ খ্রীঃ ভারত সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ ঘোষিত হবার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহীশূরে ১৯১৬ খ্রীঃ একটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় (Affiliating University) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইটি দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কাজের চাপ কিছু কমে।

বিহার ও উড়িষ্যার জন্য ১৯১৭ খ্রীঃ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইটি পুরানো কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর গঠনতন্ত্রে কিছুটা নতুনত্ব ছিল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ আবাসিক ও শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching and Residential University) রূপে এর কাজ শুরু হয়।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ আদর্শে আলিগড়ে ১৯২০ খ্রীঃ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্যার সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য স্থাপিত হয়। যদিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে শিক্ষা পেতে পারত।

শেঠ নাথ্‌ভাই দামোদর থ্যাকার্সে (S. N. D. T.) বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ খ্রীঃ পুণায় স্থাপিত হয়। এইটি মেয়েদের জন্য স্থাপিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই বিশ্ব-বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন পায়নি।

১৯১৮ খ্রীঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজীর পরিবর্তে উর্দু গৃহীত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের* সুপারিশ অনুসারে ১৯২০ খ্রীঃ ঢাকায় একটি আবাসিক ঐকিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বছরই অনুরূপ গঠন-পদ্ধতিতে লক্ষ্ণৌয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারণকালে লর্ড কার্জন সংখ্যাগত বৃদ্ধি অপেক্ষা গুণগত উৎকর্ষের দিকে অধিক মনোযোগ দেবার সুপারিশ করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীঃ ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা মানোন্নয়নের দিকেই অধিক শক্তি নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। এইজন্য স্কুলগুলির অনুমোদন-ব্যবস্থায় ও পরিদর্শন-ব্যবস্থায় কঠোরতর বিধান রচিত হয়। সরকারী বিরোধিতার মধ্যেও ১৯০৫-২১ খ্রীঃ মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা অভাবনীয়রূপে বিস্তারলাভ করে। ১৯০৫ খ্রীঃ যেখানে ৫,১২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫,৯০,১২৯ জন শিক্ষার্থী ছিল, সেখানে ১৯২১-২২ খ্রীঃ ৭,৫৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা হয় ১১,০৬,৮০৩ জন। এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তারই ফলে ভারতীয় প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য লাভ হয়।

১৯০৪ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত সরকারী শিক্ষাকোড শুধুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির উপরই প্রযোজ্য ছিল। লর্ড কার্জন দেশের সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনবার জন্য স্থির করেন সমস্ত অনুমোদিত স্কুল শিক্ষাকোডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সরকারী অনুমোদন না থাকলে কোন স্কুল সরকারী সাহায্যের দরখাস্ত করতে পারত না, ও ঐসব স্কুলের কোন ছাত্র বৃত্তি বা কোনরূপ সাহায্য পাবার অধিকারী হত না। ফলে বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী অনুমোদন গ্রহণে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রচনা করে। অনুমোদন লাভ না করলে কোন বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রেরণ করতে পারত না। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় দুই দিক্ থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষায় একটা শৃঙ্খলা আনবার যৌথ প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক শিক্ষার মান অনেকটা উন্নত হয়।

---

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ॥

আলোচ্য যুগে মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষাকেন্দ্রিক হওয়ায় শিক্ষাব একমাত্র লক্ষ্য ছিল কি ক'রে সর্বাধিক পরিমাণে ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করানো যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত পাঠক্রম ছিল অত্যন্ত নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক (mechanical), কোন বৈচিত্র্যের স্থান এতে ছিল না। একঘেয়ে পাঠক্রমে নতুনত্ব আনবার জন্য প্রাদেশিক সরকার থেকে স্কুল ফাইন্যাল কোর্সের প্রবর্তন হয়। ছেলেরা যাতে ধরাবাঁধা বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর বাইরে নতুন কিছু শিক্ষার সুযোগ পায়, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিভাগ স্কুলফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণেব দায়িত্ব গ্রহণ করে। বম্বে প্রদেশে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার না থাকলেও সরকারী চাকরি লাভের সুবিধা থাকায় এই কোর্স জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল। বাংলা দেশে এই 'বি' 'সি' কোর্সের ব্যর্থতাব কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। যুক্তপ্রদেশে এক নতুন School Leaving Certificate পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকাব দেওয়া হয়। পাঠক্রমে বহু বিষয়েব সংযোজন করা হয়। চারটি বাধ্যতামূলক বিষয় ও অন্যান্য বহু বিষয় থেকে সাতটি বিকল্প বিষয় নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেখা যায়, ছাত্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহই বেছে নিচ্ছে।

শিক্ষা সংকোচন করবার দায়িত্ব নিয়ে ও শিক্ষাব মানোন্নয়নেব নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হলেও এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারলাভ ঘটেছিল এবং অধিকতব সরকারী অর্থ এইজন্য ব্যয়িত হচ্ছিল। ১৯০১-০২ খ্রী বিভিন্ন দিক্ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হত ১,২২,৫০,০০০ টাকা। ১৯২১-২২ খ্রীঃ এইজন্য ব্যয় হয় ৪,৮৭,০০০ টাকা। এই ব্যয়ের একটা বড অংশই সবকাব-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য করা হত। ১৯২১-২২ খ্রীঃ ৫৪২টি সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১,১৩,০৭২ জন শিক্ষার্থী ছিল। আর বেসরকারী ৪৭১১টি বিদ্যালয়েব ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,৩৮,৮১৯ জন। প্রতি ছাত্রের জন্য সরকারী বিদ্যালয়ে বার্ষিক ব্যয় ছিল ৫৪ টাকা, আর বেসরকারী বিদ্যালয়ে সেখানে খরচ হত প্রতি ছাত্র পিছু বার্ষিক মাত্র ১৩ টাকা, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ছাডাও জনসাধারণ-পরিচালিত সাহায্যহীন বিদ্যালয়সমূহে ১,৮১,৩৯৩ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করত। আদর্শ বিদ্যালয় নামে যে সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল, তার প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ব জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। জনসাধারণ থেকে দাবী করা হয় সরকারী বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি বাদে অন্য সব প্রতিষ্ঠান বেসরকারী পরিচালনাধীনে ছেড়ে দেওয়া হোক। অবশ্য সরকার এ দাবীতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেনি।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির পথের অন্যতম অন্তরায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এই অভাব দূর করবার প্রয়োজনীয়তা সরকার বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীঃ শিক্ষাপ্রস্তাবে বলা হয় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে শিক্ষক বিশেষ শিক্ষা পায়নি, তাকে শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা উচিত নয়। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব না হয়, সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১২ খ্রীঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন

মাত্র ১২টি কলেজ ছিল। ১৯২১-২২ খ্রীঃ এই কলেজের সংখ্যা হয় ২০টি। ১৪৪৩ জন শিক্ষক এখানে শিক্ষা পেতেন। এই সময় পর্যন্ত শিক্ষণ-শিক্ষায় বাংলা দেশ সবার পিছনে ছিল।

।। মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন ।।

এই যুগের শিক্ষার বাহন নিয়ে বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ ক'রে। কার্জন নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীর একাধিপত্য অপসারণের কোন ইচ্ছা সরকারের না থাকায় শিক্ষার বাহনই শিক্ষার পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিল। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করায় সকল শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ইংরেজীর মাধ্যমে সমানভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষকের অভাব ও ছাত্র সাধারণের অক্ষমতায় ইংরেজী শিক্ষার মান অত্যন্ত নেমে যায়। ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ পদ্ধতির (Direct Method) প্রবর্তন হয়। শুধুমাত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ক'রে, কখনও বাতিল ক'রে, নিম্নতম পাসমার্ক বাড়িয়ে—নানাভাবে ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নতির চেষ্টা হতে থাকে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করবার ফলে অপর বিষয়গুলি স্বাভাবিকভাবেই অবহেলিত হয়। সামান্যসংখ্যক ছাত্র ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করলেও বহু ছাত্র পরীক্ষায় ইংরেজীতে ফেল করবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় বিরাট অপচয় সৃষ্ট হয়।

১৯১৫ খ্রীঃ ১৭ই মার্চ Mr S R. Ayanıngar দিল্লীর রাজকীয় আইন পরিষদে মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন ক'রে ইংরেজীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে আবশ্যিক (Compulsory) ভাষারূপে গ্রহণ করবার সুপারিশ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে বিষয়টি প্রাদেশিক সরকার সমূহের বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে, সরকার পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ শিক্ষাসচিব স্যার শংকরণ নায়ারের সভাপতিত্বে যে সম্মেলন হয়, লর্ড চেমসফোর্ড সেই সম্মেলনের নিকট শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠান। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ একমত হতে না পারায় এই সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষা গ্রহণ করা হবে কিনা, সেই প্রশ্নটি এই যুগে অমীমাংসিত থেকে যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এ সময় সরকারী নীতি ও বেসরকারী নীতি পরস্পরবিরোধী হলেও এই যুগে শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন দুই-ই হয়েছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় বর্ধিত হয়েছিল ও শিক্ষক-শিক্ষণের অধিকতর আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু প্রধান দুইটি সমস্যার কোন সমাধানই এ সময়ে হয়নি। বৃত্তিশিক্ষার বা কার্যকরী প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রসারের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা এই সময়ে করা হয়নি। আর মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে গ্রহণের প্রশ্নের কোন সিদ্ধান্ত সরকার

গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। একটি প্রশ্ন পরবর্তী যুগে মীমাংসিত হলেও কারিগরী শিক্ষার প্রশ্নটির সমাধানের জন্য স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

।। প্রাথমিক শিক্ষা ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকারী শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টা প্রধানতঃ উচ্চশিক্ষা প্রসারের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। "চুঁইয়ে নামা" নীতির অসারতা প্রমাণিত হবার পরও শিক্ষাবিভাগ উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের জন্যই অধিক অর্থ ব্যয় করছিল। এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যে হয়নি তা নয়, কিন্তু, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে এই বৃদ্ধি অতি নগণ্য। ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ ১৬,৪৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬,০৭,৩২০ জন ছাত্র ছিল। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ দেখা যায় ৮২,৯১৬টি বিদ্যালয়ে ২০,৬১,৫৭১ জন ছাত্র রয়েছে। তার দশ বছর বাদে ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ ৯৭,১০৯টি স্কুলে ২৮,৩৭,৬০৭ জন শিক্ষার্থী ছিল, অর্থাৎ এক দশ বছরে বৃদ্ধির সংখ্যা খুবই কম। পরের দশ বছরে স্কুলের সংখ্যা কমে যায়, কিন্তু মোট ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯০১-০২ খ্রীঃ ৯২,২২৬টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা হয় ৩২,৬৮,৭২৬ জন। এই যুগে দেখা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা সে হারে বাড়েনি। মাধ্যমিক স্কুল ত্রিশ বছরের মধ্যে ৩,২০ থেকে ,৪৯ টি হয়, এবং ছাত্রসংখ্যা হয় ২,০৪,২৯৬ জন থেকে ৫,৫৮,৩৭৮ জন। অর্থাৎ ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশী হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ও এই সময়ের মধ্যে বিশেষ কিছুই বাড়েনি। ১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে ব্যয় হয় ৬,০০,২ ৯ টাকা, ১৯০১-০২ খ্রীঃ এই খাতে ব্যয় হয় ১৬,৯২,৫১৪ টাকা অর্থাৎ পনের বছরে এক লক্ষ টাকাও ব্যয় বাড়েনি। প্রাথমিক শিক্ষার এই শোচনীয় অবহেলা দেখেই কার্জন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— "The active extension of Primary education is one of the most important duties of the state, among all other sources of difficulties in our administration and of possible danger to the stability of our Govt. there are few so serious as the ignorance of the people"

বিংশ শতকের প্রারম্ভেই দেখি সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ-সাধনের দিকেই লর্ড কার্জন অধিক মনোযোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন অপেক্ষা শিক্ষার প্রসারের জন্যই অধিক তৎপর হতে বলা হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ সরকারী হিসাবে দেখা যায়, স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বয়সের ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছেলের মধ্যে ৩৬ লক্ষ ছেলে প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে। ইংলণ্ডে ১৯০২ খ্রীঃ শিক্ষা-আইন পাশ হবার পর প্রাথমিক শিক্ষায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। এই আইনের প্রভাব ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতেরও শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, ট্রেনিং-এর উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা হয়। অর্থের অভাব দূর করবার জন্য সরকারী সাহায্য বর্ধিত করা হয়। সরকার থেকে শিক্ষার জন্য ১৯০২ খ্রীঃ

৭০ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হত। এই সাহায্য ১৯০৫ খ্রীঃ বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা করা হয়; এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। সাহায্যবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির সময় এই ইচ্ছাই প্রকাশ করা হয়েছিল যে, বর্ধিত সাহায্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যই ব্যয়িত হবে। কিন্তু কার্যতঃ এই অর্থের একটা বড় অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়। এর ফলে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয়নি। সামান্য যে সাহায্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল, সে টাকায় নতুন নতুন স্কুল খোলা হয়, এবং পুরানো স্কুলগুলি সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০২ খ্রীঃ যেখানে ৯২,১২৬টি ছিল, সেখানে ১৯০৭ খ্রীঃ ১,০২,৯৪৭টি হয়। এর আগে প্রতি স্কুলে গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৩ জন, এখন সংখ্যা বেড়ে ৩৬ জন হয়। প্রাইমারী স্কুলগুলির মধ্যে মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ ছিল সরকারী পরিচালনাধীন, বাকী বেসরকারী স্কুলগুলি সরকার থেকে বা জেলাবোর্ড থেকে সামান্য সাহায্য পেত। দেশীয় পাঠশালা এ সময়েও সামান্য কিছু ছিল। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি সরকার-নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসরণ করত। কিন্তু দেশীয় পাঠশালাগুলি সেই চিরাচরিত সনাতন রীতিতেই শিক্ষা দিত। ১৯০৭ খ্রীঃ দেখা যায় প্রায় ৫,৫০,০০০ ছাত্র দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষালাভ করছে। ১৯০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত পরীক্ষার ফল বিচার ক'রে (Payment by result) স্কুলগুলিতে সাহায্যদানের যে রীতি ছিল, এই সময় তা থেকে কমিয়ে আনা হয়, এবং ১৯০৬ খ্রীঃ পর থেকে এই রীতি একেবারে লোপ পেয়ে যায়।

লর্ড কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যের পূর্বতন রীতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেবার পর বিভিন্ন প্রদেশে সাহায্য দানের বিভিন্ন রীতি প্রবর্তিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে প্রতি শিক্ষক পিছু বছরে ৩৬ টাকা সাহায্য দেওয়া স্থির হয়। এ ছাড়া, প্রতি ছাত্রের গড় হাজিরা অনুপাতে প্রতি স্কুলে আট আনা ক'রে দেওয়া হত। মোট সাহায্যের পরিমাণ পরিদর্শক কমিয়ে দিতে পারতেন।

বম্বে প্রদেশে প্রতি স্কুলে একটা নির্দিষ্ট সাহায্য করা হত। বাংলায় সাহায্যের দু'টি দিক্ ছিল। এখানে প্রধান শিক্ষককে সর্বোচ্চ মাসিক ৫ টাকা ও সহকারী শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মাসিক ৩ টাকা ক'রে সাহায্য দেওয়া হত। বার্ষিক সাহায্য দেবার সময় ছাত্র-সংখ্যা, গড় হাজিরা, শিক্ষার মান, পরিদর্শক ও লোকাল বোর্ডের মন্তব্য ইত্যাদি বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। বাংলা ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে জেলা-শিক্ষাবোর্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যের পরিমাণ স্থির করবার অধিকার ছিল না।

উত্তর প্রদেশে একটি স্কুলে ১৫ জন ছাত্র থাকলে শিক্ষক মহাশয় মাসিক ৪ টাকা সাহায্য পেতেন। যদি স্কুলে বোর্ড-নির্ধারিত পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মানচিত্র ও অন্যান্য শিক্ষাপোকরণের ব্যবস্থা থাকত, তা হলে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে পাঁচ থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত করা হত। যদি একজন শিক্ষক ২৫ জন ছাত্র পড়াতে সক্ষম হতেন, তাহলে সাহায্য একটাকা বাড়িয়ে দেওয়া হত। সহকারী শিক্ষকের জন্য মাসিক তিন টাকা সাহায্য দেওয়া হত। সব প্রদেশেই স্কুলগৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের জন্য ভিন্ন সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল।

১৮৮৭ খ্রীঃ থেকে ১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে তালিকা দেওয়া হল, তা থেকে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত দেশের গণশিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা হবে :—

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

খ্রীস্টাব্দ	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
১৮৭০-৭১	১৬,৪৭৩	৬,০৭,৩২০
১৮৮১-৮২	৮২,৯১৬	২০,৬১,৫৪১
১৮৯১-৯২	৯৭,১০৯	২৮,৩৭,৬০৭
১৯০১-০২	৯২,২২৩	৩২,৬৮,৭২৬
১৯১১-১২	১,১৬,২৬২	৪৮,০৬,৭৩৬

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়

	১৯০১-০২ খ্রীঃ		১৯২১-২২ খ্রীঃ	
বিভিন্ন তহবিল	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার
সরকার	১৬,২৭,৯৪৭	১৩.৫%	২,৬৭,৪৬,০৩৫	৫২.৮%
লোকাল বোর্ড	৩৬,৭৪,৩৮৬	৩০.৫%	৮৯,৬৭,৮৯৯	১৭.৬%
মিউনিসিপ্যালিটি	৭,৭৬,৪৮৫	৬.৭%	৫০,৫১,৬৩৫	৯.৮%
বেতন	৩১,১৫,২১১	২৬.৩%	৪৯,০৭,৪২৭	৯.৬%
দান	২৭,১১,৭৩০	২৩.০%	৫২,৩৫,১১১	১০.২%
মোট	১,১৮,৭৫,৭৫৯	১০০%	৫,০৯,০৮,১০৭	১০০%

প্রতি বিদ্যালয় ও ছাত্র পিছু ব্যয়

	১৮৮৭ খ্রীঃ	১৯০৭ খ্রীঃ	১৯১৭ খ্রীঃ
একটি বিদ্যালয়ের গড় ব্যয়	৮৫ টাকা	১৩৩ টাকা	২০২ টাকা
একটি ছাত্রের জন্য গড় ব্যয়	৩ টাকা	৩.৯ টাকা	৫ টাকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বত্র এক রকম ছিল না। যেখানে উচ্চবর্ণের অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য ছিল, সে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী ছিল। নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ১৯০৭ খ্রীঃ দেখা যায়, বাংলায় গড়ে ১০.৯ বর্গমাইলে একটি ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার যখন এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা, ঠিক সেই সময়ে বম্বে প্রদেশের বরোদার দেশীয় রাজা তাঁর রাজ্যে ১৯০৭ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। বরোদার অনুসৃত নীতি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়েছিল।

গোখলের প্রাথমিক শিক্ষাবিল (১৯১০ খ্রীঃ ও ১৯১১ খ্রীঃ)

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-বিস্তার না হলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, এই সত্যটি জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করবার পর থেকেই তাঁরা গণশিক্ষা-বিস্তারে সরকারকে অধিক তৎপর হবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। সরকারী প্রচেষ্টা মোটেই আশাপ্রদ না হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণের মনে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মনোভাব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে মহামতি গোখলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তিনি ১৯০৫ খ্রীঃ বলেন, অশিক্ষিত জাতি কোনদিনই কোন উন্নতি করতে পারে না, জীবন-যুদ্ধে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে। মাতৃভূমির উন্নতির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা।

বরোদার মহারাজা তাঁর রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় ভারতেও দাবী উঠল প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হোক। এই উদ্দেশ্যে গোখলে ১৯১০ খ্রীঃ ১৯শে মার্চ রাজকীয় আইন পরিষদে একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবে বলা হয়—সমগ্র দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার প্রস্তুতি-পর্ব রূপে এবং কি ক'রে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যায়, তার উপায় নির্ধারণের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে একটি মিশ্র কমিটি গঠন করা হোক—("a beginning should be made in the direction of making elementary education free and compulsory throughout the country, and that a mixed commission of official and non-official be appointed at an early date to frame definite proposals.")

এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করবার সময় তিনি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাষণে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রয়োজনীয়তা সরকারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের ১৮৭০ খ্রীঃ শিক্ষা আইনের অনুরূপ একটি আইনে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার দায়িত্ব দেওয়া হোক।

প্রথম অবস্থায় ছেলেদের শিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে, এবং ৬ বছর থেকে ১০ বছরের ছেলেদের এই আইনের অধীনে আনা হবে। মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না।

যে সব অঞ্চলের স্কুলে যাওয়ার যোগ্য ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন স্কুলে যাচ্ছে, সেখানেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতির আয়োজন করা হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবৈতনিক হবে।

শিক্ষার ব্যয় সরকার ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগি ক'রে বহন করবে। সরকার বহন করবে $\frac{2}{3}$ অংশ, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান $\frac{1}{3}$ অংশ।

প্রস্তাবটি আলোচনাকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, সরকার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এই আশ্বাসের উপর

নির্ভর ক'রে গোখলে বিলটি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। গোখলের প্রস্তাবের ফলে দেশে-বিদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন আলোচিত হতে থাকে। ১৯১০ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেস এলাহাবাদের অধিবেশনে ও মুসলিম লীগ নাগপুর সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সহকারী ভারত সচিব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন গণশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে।

॥ দ্বিতীয় বিল ॥

কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ না করায় গোখলে ১৯১১ খ্রীঃ ১৬ই মার্চ রাজকীয় আইন পরিষদে নতুন ক'রে "প্রাথমিক শিক্ষা বিল" উপস্থিত করেন। বিলটি যাতে সরকারী ও বেসরকারী সমর্থন লাভ করে, সেজন্য বিশেষ চিন্তা ক'রে ধারাগুলি রচিত হয়। বিলটিতে বলা হয় যে, কোন অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক ছেলে-মেয়ে অধ্যয়ন রত থাকলে এই আইন সেখানে প্রয়োগ করা হবে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যা কত হবে, তা সপরিষদ বড়লাট স্থির করবেন।

কোন অঞ্চল ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে পূর্ব শর্তটি পূরণ করবার পর সমগ্র অঞ্চলে বা আংশিকভাবে সেই অঞ্চলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ তা স্থির করবে। কোন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে চায়, তাহলে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

এই আইন যে অঞ্চলে প্রবর্তিত হবে, সেখানে ৬-১০ বছরের ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকগণ বাধ্য থাকবেন।

মেয়েদের সম্পর্কে এই আইন ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা হবে।

যে ছাত্রের অভিভাবকের আয় মাসিক ১০ টাকা বা তার কম, তাদের কোন বেতন দিতে হবে না।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর দায় থেকে অব্যাহতি পাবার অনেক সুযোগ-সুবিধা এই আইনে ছিল।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিক্ষাকর ধার্যের ক্ষমতা এই বিলে দেওয়া হয়। এই আয় ও সরকারী সাহায্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যয় নির্বাহ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

যে সব অভিভাবক তাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠাবেন না, তাঁদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্কুল কমিটি স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

এই বিলটির ধারাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এই আইন প্রয়োগে যাতে বিশেষ কোন বেগ পেতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বিলটি রচিত হয়েছিল।

বিল সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের

মতামত গ্রহণ করা হয়। গোখলে বিলটির ধারাগুলি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠাবার প্রস্তাব করেন। সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। গোখলে বলেন, যে অঞ্চলে স্কুল যাওয়ার যোগ্য বয়সের শতকরা ৩৩ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, সেইখানেই এই আইন প্রয়োগ করা হোক। শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক হবে সেখানেই অবৈতনিক করতে হবে। ১৯১২ খ্রীঃ ১৮ই ও ১৯শে মার্চ বিলটির আলোচনা হয়। সরকারী সদস্য ও বেসরকারী জমিদার সদস্যদের বিরোধিতায় ৩৮—১৩ ভোটে বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

এই বিলের বিপক্ষে সরকার থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে, দেশ এখনও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়নি। এই বিল গ্রহণ করলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি করাই হবে। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও বিলের বিরোধিতা করেছে। তার কারণ তারা আর কোন অতিরিক্ত কর ধার্য করতে রাজী ছিল না। স্বেচ্ছামূলকভাবে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, সেখানে জোর ক'রে শিক্ষাকে চাপাতে গেলে দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে।

বিলটি বাতিল হবে জেনেও গোখলে হতাশ হননি, তাঁর ভাষণের শেষে উদাত্তকণ্ঠে বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য ক'রে যা বলেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "My Lord, I know that my Bill will be thrown out before the day closes, I make no complaint……I shall not feel even depressed …I have alyways felt and have often said that we the present generation in India can only hope to serve our country by our failures." (*As quoted by Dr. S. N. Mukherjee in History of Education in India.*)

বিলটি বাতিল হয়ে গেলেও সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করবে। এই শিক্ষাকে ক্রমে অবৈতনিক করাই সরকারের নীতি। এই উদ্দেশ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এককালীন ৮৪ লক্ষ টাকা ও পৌনপৌনিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করবে। প্রাদেশিক সরকার সমূহকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গোখলের বিলের উপলক্ষে দেশব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে বাধ্য হয়। ১৯১২ খ্রীঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়। আসামে নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে বেতন স্বেচ্ছামূলক করা হয়। উত্তর-প্রদেশে ও মধ্য-প্রদেশে অতি সামান্য বেতন ধার্য করা হয়। পাঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈতনিক করা হয়। এইভাবে বাংলা, মাদ্রাজ ও বম্বে প্রদেশ ছাড়া অন্য সব প্রদেশে যারা বেতন দিতে অসমর্থ, তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ, ১৯১২ খ্রীঃ ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ৫০ লক্ষ, অর্থাৎ ছাত্রসংখ্যা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের মনোভাব গোখলের চেষ্টার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। সরকারী সদস্যদের বিরোধিতার ফলে গোখলের বিল বাতিল হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারের দাবীকে আর অস্বীকার করতে পারছিল না। এই বিলের বিরোধিতা করায় সরকারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করবার জন্যই, সম্রাট পঞ্চম জর্জ বলতে বাধ্য হন, "The cause of education in India will ever be very close to my heart".

শিক্ষার জন্য তিনি রাজকোষ হতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে বলে স্থির হয়। এই সময়ে সহকারী ভারত সচিব ভাবতে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র পার্লামেণ্টে উপস্থিত করেন। নানা দিক্ থেকে ভারত সরকারের উপর চাপ আসতে থাকায় ভারত সরকার শিক্ষানীতি-বিষয়ক প্রস্তাবে (১৯১৩ খ্রীঃ) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি কার্যকর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারেই ১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে বম্বে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বোর্ডের পরিচালনাধীনে আনা হয়। মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে প্রথম থেকেই বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকারী সাহায্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের উৎসাহী করায় এই প্রদেশগুলিতে "বোর্ড-স্কুলে"র সংখ্যা খুবই কম ছিল। বাংলা সরকার পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কীম্ বলে একটি পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি ১৪ বর্গমাইলে একটি ক'রে তিন শ্রেণী যুক্ত আদর্শ স্কুল সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে স্থাপিত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যয় সরকার থেকে বহন করা হলেও, পরিচালনার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। এই স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সামান্য বেতন, পাঠক্রমের ত্রুটি, অসুবিধাজনক অবস্থিতি ও ছাত্রদের নিকট থেকে বেতন নেবার ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

১৯১২ খ্রীঃ যেখানে দেশের প্রতি ১০·২ বর্গ মাইলে একটি ক'রে স্কুল ছিল, সেখানে ১৯১৭ খ্রীঃ প্রতি ৮·২ বর্গমাইলে একটি ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের যারা লেখাপড়া করেছিল, তাদের হার ৪% থেকে বেড়ে ৪·৫% হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে সামান্য অর্থ ব্যয় করা হত বলে লর্ড কার্জন নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে শিক্ষার জন্য যা ব্যয় করা হবে, তার একটা প্রধান অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণের চার বছর পরেও দেশের অতি সামান্য সংখ্যক ছেলে মেয়েই শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছিল।

।। স্ত্রী-শিক্ষা ।।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নারী-শিক্ষার যে সামান্য বিস্তার হয়েছিল, তা প্রধানতঃ মিশনারী ও বেসরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টায়। সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ

আগ্রহ না থাকায় হাণ্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকর করবার জন্য কোন বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বিংশ শতকের শুরুতে দেশের নারী-শিক্ষার যে চিত্রটি পাই, তা হতাশাব্যঞ্জক। ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে নারী-শিক্ষার যতটুকু প্রসার হচ্ছিল, ১৯০১-২১ খ্রীঃ মধ্যে তা আরও ব্যাপক হয়। এই সময়ে নারী-শিক্ষার সম্পর্কে সনাতনপন্থীদের বিরূপ মনোভাব দূর হওয়ায় দেশের জনমত নারীশিক্ষা-প্রসারের অনুকূল হয়। জাতীয় আন্দোলনের ফলে দেশের গণচেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীশিক্ষাও যে দেশের কল্যাণে বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে সম্পর্কে জনসাধারণ সচেতন হয়ে ওঠে। সাধারণ শিক্ষার প্রসারে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। সমাজে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বাড়ীতে মেয়েদের বসিয়ে না রেখে সামান্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, এ সম্পর্কে অভিভাবকগণ সচেতন হন। শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিতা নারীকে স্ত্রীরূপে পেতে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। ফলে, বাধ্য হয়েই অনেকে নারীশিক্ষার দাবীকে মেনে নেন।

নারীশিক্ষা-প্রসারে এর পূর্ব-যুগে সরকারকে যতটা নিষ্ক্রিয় দেখি, এই যুগে সেই নিষ্ক্রিয়তা অনেকাংশ দূর হয়। শিক্ষাবিভাগ নারীশিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। মেয়েদের স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শিকা নিযুক্ত করা হয়। ছাত্রীদের বেতন মকুব ব্যবস্থা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুরস্কার দান ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহশীল ক'রে তোলবার চেষ্টা হতে থাকে। বেসরকারী নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য উদারভাবে সরকারী আর্থিক সাহায্যদানের নীতি গৃহীত হয়। নারীদের শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। নারী শিক্ষা-সমস্যার আলোচনার জন্য নারী-সদস্যযুক্ত প্রাদেশিক সমিতি সরকার থেকে গঠন করা হয়।

নারীশিক্ষা-প্রসারের জন্য সরকার উদ্যোগী হলেও প্রধানতঃ বেসরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টায় এই যুগের অধিকাংশ স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। নীচের তালিকায় ১৯২১-২২ খ্রীঃ দেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর হিসাবের সঙ্গে পূর্বতালিকা মিলিয়ে দেখলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের রূপটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হবে।—

নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রীসংখ্যা (১৯২১-২২ খ্রীঃ)

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান-সংখ্যা	ছাত্রীস
কলেজ	১৯	৯০৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৭৫	২৬,১৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১,৯৫৫	১১,৮৬,২২৪
অন্যান্য নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	১,১২৮	১০,৮৩৬

[Report of the National Committee on Women's Education.]

কুড়ি বছরে কলেজের সংখ্যা ১২টি থেকে ১৯টি হয়। এই কলেজগুলির মধ্যে ৪টি ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৭৫টির মধ্যে ১১৫টি ছিল সরকার পরিচালিত। এমন কি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬,৮১০টি। এই হিসাব থেকেই নারীশিক্ষা-প্রসারে বেসরকারী অবদানের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

আলোচ্য যুগে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই, তার মধ্যে ১৯০৪ খ্রীঃ শ্রীমতী এনি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত বেনারসের সেণ্ট্রাল হিন্দু গার্লস্ কলেজ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ১৯১৬ খ্রীঃ মেয়েদের চিকিৎসা-বিদ্যা শেখাবার জন্য দিল্লীতে লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পুণায় অধ্যাপক কার্ভে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান উইমেনস্ ইউনিভারসিটি (১৯১৬ খ্রীঃ)। নারীদের উপযোগী পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে এখানে শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথমে সরকারী অনুমোদন ছিল না—বর্তমানে এটি একটি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়।

এই যুগের নারীশিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীদের জন্য বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। এর আগে শুধুমাত্র ডাক্তার ও স্কুল-শিক্ষিকা ভিন্ন মেয়েদের উপযোগী বিশেষ কোন বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে, বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ এই যুগের মেয়েরা কিভাবে গ্রহণ করেছে :—

বৃত্তিশিক্ষায় নারী (১৯২১-২২ খ্রীঃ)

উচ্চতর শিক্ষা (কলেজ)	ছাত্রীসংখ্যা
চিকিৎসা	৬৮
শিক্ষাবৃত্তি (টিচার্স ট্রেনিং)	
বাণিজ্য	
নিম্নতর শিক্ষা (স্কুল)	
শিক্ষাবৃত্তি	৩,৯০৩
চারুকলা (আর্ট)	৩২
চিকিৎসা	৩৩৪
কারিগরী ও শিল্পবিদ্যা	২,৭৪৪
বাণিজ্য	৩০৮
কৃষি	৭৯
অন্যান্য বৃত্তি	৩,১৭০
মোট	১০,৮৩৬

[Report of the National Committee on Women's Education.]

॥ মিশনারী প্রচেষ্টা ॥

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পর ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের একাধিপত্য স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। মিশনারীগণ সরকারী মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁদের কার্যক্ষেত্র অন্যত্র সম্প্রসারিত করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য কিছু আদর্শ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান রেখে তাঁরা গণশিক্ষা-বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম-প্রচারের মাপকাঠিতে যদি মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার সাফল্য নির্ণয় করতে হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে মিশনারীদের নতুন প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। আদিবাসী, পার্বত্য জাতি, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ও খ্রীস্টধর্ম-বিস্তার কিভাবে সুষ্ঠুরূপে চালিয়ে যাওয়া যায়, সে সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের জন্য ১৯১৯ খ্রীঃ কাণ্ডির ট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ফ্রেসারকে সভাপতি ক'রে একটি কমিশন গঠিত হয়।

কমিশন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে মোটেই তুষ্ট হতে পারেন নি। শিক্ষাব্যবস্থায় শোচনীয় অপচয় (wastage) ও বদ্ধতা (stagnation) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় বলে কমিশন নির্দেশ করেছিলেন। কমিশন সুপারিশ করেন যে, গ্রামে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়গুলিকে আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে; যার ফলে গ্রাম্য পরিবেশে বাস ক'রে ছাত্ররা গ্রামকে চিনতে পারবে ও গ্রামের উন্নতির জন্য সচেতন হবে। কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার সুপারিশ করেন। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাতেও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থারও সুপারিশ করা হয়। ফ্রেসার কমিশন যদিও বেসরকারী মিশনারী শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা ও উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, তবুও অপচয় ও বদ্ধতা সম্পর্কে কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা সর্বভারতীয় শিক্ষা-সমস্যা। ফ্রেসার কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশগুলি শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

ভারতীয় সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ায় মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহ অতি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ মিশনারী পরিচালনাধীনে সারা ভারতে ১০,৪৬১টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে ৪২টি কলেজ, ৮৪৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭৫টি ট্রেনিং স্কুল, ৯২৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৪২টি অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫,৩৩,৯৫৪ জন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মোট ব্যয় ছিল ১,৩৮,০০,৪৭৫ টাকা।

॥ ফলশ্রুতি ॥

১৮৫৪ খ্রীঃ থেকে ১৯২১-২২ খ্রীঃ একটি দীর্ঘ পথ। এ পথ অতিক্রম করতে অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও বাদ-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতের শিক্ষা একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতার কথা

স্বীকার ক'রে নিয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী, ভারতীয় ও মিশনারী প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার হয়েছিল, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন এক নতুন রূপ গ্রহণ ক'রে। ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টের ফলে শাসন-ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত হয়। দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থায় কয়েকটি সরকারী বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সময় থেকে আমাদের দেশের শিক্ষায় ও নতুন যুগের শুরু হয়। শিক্ষাকে হস্তান্তরিত বিভাগভুক্ত করায় ভারতীয় মন্ত্রিগণ শিক্ষানীতি-নির্ধারণের সুযোগ লাভ করেন। ১৯২০-২১ থেকে ১৯৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন অধ্যায় রচিত হয়।

একাদশ অধ্যায়

কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট (১৯১৭-১৯১৯ খ্রীঃ)

লর্ড কার্জনেব বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার দশ বছর পার না হতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিচালনার দিক্ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক উন্নতি হলেও শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার সাফল্যজনক প্রচেষ্টা তখনও হয়নি। এ ছাডা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। ভারত সরকাবের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ১৯১৩ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারেব জন্য যে সব সুপারিশ করা হয়, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা হবে না বলে স্থির হয়। এদিকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের পর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের প্রশ্নটি আরও তীব্রভাবে দেখা দেয়। ১৯১০ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে রয়েল কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি ছিলেন লর্ড হলডেন। ১৯১৪ খ্রীঃ লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কাবের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব কবা হয়। লর্ড হলডেন ভারতে আসতে রাজী না হওয়ায় ও ইউরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় শিক্ষা-সংস্কারের সব চেষ্টা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

১৯১৭ খ্রীঃ মহাযুদ্ধের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হওয়ায় শিক্ষা-সংস্কারের প্রশ্নের দিকে সরকারের দৃষ্টি দেবার সুযোগ ঘটল। এই বছরই ভারত-সরকার লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি ক'রে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" নিয়োগ করে। এই কমিশন স্যাডলাব কমিশন নামে সর্বাধিক পরিচিত। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার জিয়াউদ্দিন আহ্‌মদ, ডাঃ গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামজেমুর। অনেকে মনে করেন, এই কমিশন স্যার আশুতোষের মতামতের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা এবং গঠনমূলক দিকের প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা ক'রে পুনর্গঠনের পরামর্শের ভার কমিশনকে দেওয়া হয় ("—to inquire into the condition and prospects of the University of Calcutta and to consider the question of a constructive policy in relation to the question it presents") কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার উপলক্ষ ক'রে কমিশন গঠিত হলেও সমগ্র ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষার কিভাবে সংস্কার করা যায়, সেই সমস্যাটির আলোচনা কমিশন করেন। কমিশনের সভ্যরা ১৭ মাস ধরে সারা ভারত ঘুরে ছোট বড় নানারূপ প্রতিষ্ঠান দেখলেন,

শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা রচনা করেন।

।। কমিশনের সুপারিশ ।।

১৯১৯ খ্রীঃ স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বের হয়। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে এত প্রয়োজনীয় ও সুদীর্ঘ রিপোর্ট এর আগে কখনও তৈরি হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সব রকম শিক্ষারই বিস্তৃত আলোচনা এই রিপোর্টে ছিল।

।। মাধ্যমিক শিক্ষা ।।

কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নটি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিশনের অভিমত ছিল যে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার সার্থক হবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাফল্য মাধ্যমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল—

("No satisfactory reorganisation of University system of Bengal will be possible unless and until a radical reorganisation of the system of Secondary education upon which University work depends, is carried into effect."—*Calcutta University Report, Vol. V, P. 297*).

কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও জ্ঞান-পিপাসার প্রশংসা করা হয়। অর্থের অভাবে বহু ছাত্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, সে কথার উল্লেখও করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটির মূলে প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা বলা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হত, সেই বেতনে যোগ্য লোক পাবার সম্ভাবনা খুব কম। তারপর শিক্ষকদের অনেকেরই কোন ট্রেনিং নেই। রিপোর্টে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষাবিভাগের দ্বৈত শাসনের কবলে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা সরকার না করলে কোন সংস্কারই কার্যকর হবে না। এজন্য সরকারী তহবিল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্যের সুপারিশ করা হয়।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু কলেজের প্রথম দু'বছরের পাঠ অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ, তাই এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এই দুই বছরের শিক্ষার নাম হবে "ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা"।

মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বোর্ড গঠিত হবে (Board of Secondary and Intermediate Education), বোর্ডের হাতে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও সাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ড যাতে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য সুপারিশ করা হয়। বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হবে বেসরকারী। কমিশন বোর্ডে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কমিশন সাম্প্রদায়িক বাটোয়াবার নীতিকে গ্রহণ করবার ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীকে ডিগ্রী কলেজ থেকে পৃথক্ করে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে। এই কলেজে কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা, এঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখবার সুপারিশ করা হয়।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারের স্থলে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মাপকাঠি বলে গণ্য করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সম্পর্কে কমিশন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে, ইংরেজী ও গণিত ব্যতীত মাধ্যমিক স্তরে অন্য সব বিষয়ে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হবে। কলেজীয় শিক্ষার বাহন অবশ্য ইংরেজীই থাকবে।

কমিশন আশা করেছিলেন, এই বোর্ড গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপ অনেক কমে যাবে। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্য অধিকতর মনোযোগ দিতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে কমিশন প্রস্তাব করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ডিগ্রী কোর্স দু' বছরের স্থলে তিন বছরের করা হবে। এর কম সময়ে ঠিকমত পড়ানো সম্ভব নয় এবং ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্ট হতে পারে না, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্থক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা কমে যায়। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স [illegible]লেতে প্রচলিত ছিল, সেখানকার আদর্শেই কমিশন অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

বাংলায় কলেজের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কলেজীয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব [illegible]কে বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যাহতি দিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা [illegible]ব হবে। কমিশন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং [illegible]ায় একটি শিক্ষণধর্মী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এরূপভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে এটি একটি প্রকৃত [illegible]ণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মফঃস্বলের কলেজগুলিকে এমনভাবে উন্নত [illegible]তে হবে যাতে এগুলি ক্রমে এক-একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে উঠতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান বিষয়ে দোষত্রুটি দূর করবার জন্য কমিশন সুপারিশ করেন। শিক্ষাকে শুধুমাত্র বক্তৃতা-ভিত্তিক না রেখে টিউটোরিয়াল প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থায় পড়াশোনার উন্নততর আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। বি. এ. পরীক্ষায় অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিবিধ কারিগরী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। ভারতীয় ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক পদ ও রিডারের পদ সৃষ্টি করতে হবে। ডিগ্রী পরীক্ষায় ও অনার্স কোর্সে দেশীয় ভাষাকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে একটি সরকারী বিভাগে রূপান্তরিত না হয়, সেজন্য কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনায় অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে সেজন্য পরিচালনা সমিতিগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধি বাড়ানোর সুপারিশ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনার নিয়মকানুনে অতিরিক্ত কড়াকড়ি থাকা উচিত নয় বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন। সেনেট ও সিণ্ডিকেটের পরিবর্তে ব্যাপক প্রতিনিধি মূলক কোর্ট (court) ও ক্ষুদ্র কার্যকরী সমিতি (Executive Council) গঠন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

অধ্যাপক নিয়োগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পাঠক্রম নির্ধারণ, ডিগ্রী বিতরণ প্রভৃতি বিশুদ্ধ শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী একাডেমিক কাউন্সিল (Academic Council) গঠন ও বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ফ্যাকাল্টি ও বোর্ড অব স্টাডিজ (Faculty and Board of Studies) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য একজন বেতনভুক উপাচার্য নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়।

কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও কতকগুলি সুপারিশ ছিল।

প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য শিক্ষা-বিভাগ (Department of Education) স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। বি. এ ও আই. এ. পরীক্ষায় 'শিক্ষা' (Education) একটি বিষয়রূপে গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়।

।।স্ত্রীশিক্ষা।।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি বিশেষ বো[র্ড] স্থাপনের কথা বলা হয়। ১৫।১৬ বছরের মেয়েদের জন্য পর্দা-স্কুল স্থাপনের সুপারি[শ] করা হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কমিশন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানকে পাঠ[ক্রমে] স্থান দেবার নির্দেশ দেন।

ছাত্রদের শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একজন শারীরিক শিক্ষার পরি[চালক] (Director of Physical Education) ও স্বাস্থ্যকল্যাণ-পরিষদ (Board of Students' Welfare) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করবার জন্য একটি আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড (Inter University Board) গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

॥ সমালোচনা ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনাথনাথ বসু বলেন, "এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যবান আর কোন রিপোর্ট ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। পরবর্তী কালের শিক্ষাধারার গতিবহুল পরিমাণে ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজও ইহার প্রভাব একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।" বাস্তবিক আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার এমন কোন প্রয়োজনীয় দিক্ নেই যে, সেই সম্পর্কে কমিশন আলোচনা করেননি ও যথাযোগ্য পরামর্শ দেননি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ ক'রে কমিশন গঠন করা হলে ও ভারতেব সমস্ত বিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছে। পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গঠনে কমিশন-নির্দেশিত আদর্শই অনেকাংশে গ্রহণ কবা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য নিযুক্ত হলডেন কমিশনের বিপোর্টের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার সংস্কারের জন্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ভারতীয় ভাষায় স্থান নির্ধারণ, বৃত্তিশিক্ষা, গবেষণার ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষাব জন্য বোর্ড গঠন, তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তন, ইণ্টারমিডিয়েটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে পৃথক্করণ প্রভৃতি সুপাবিশ কমিশনেব প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। কোন কোন সুপাবিশ সময়োপযোচিত না হলেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় গৃহীত হয়ে কমিশনের দূরদৃষ্টির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কমিশন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ ক'রে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের; হিসেব ক'রে দেখা গিয়েছে, একপ একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হলে ৫০ লক্ষ টাকা (সেই সময়কার হিসেবে) দরকার। এ ছাড়া, আমাদের মত দরিদ্র দেশের অভিভাবকদের পক্ষে আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে ছেলে পড়াতে যে খরচ লাগে, তা বহন করা সম্ভব নয়। এত বড় বিরাট দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে অনেক কলেজ রয়েছে ও থাকবে। তার প্রতিটিকে সংহত ক'রে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাই এদেশে অনাবাসিক অনুমোদনধর্মী (Affiliating) বিশ্ববিদ্যালয় থাকবেই।

ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড গঠনে, সদস্য-নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতিকে মেনে নিয়ে, বোর্ডে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের সুপারিশ ক'রে কমিশন ভ্রান্ত নীতিকেই সমর্থন করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের যে বিষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু ক'রে তুলেছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে সেই সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিয়ে কমিশনের সুপারিশগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, পরবর্তী ত্রিশ বছরের উচ্চশিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে স্যাডলার কমিশনের প্রভাব অপরিসীম। এ সম্পর্কে মেহিউ (Mayhew) বলেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট তথ্য ও পরামর্শের এক অফুরন্ত খনি। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এর তাৎপর্য অপরিমেয়—"The Report of the Calcutta University Commission has been a constant source of suggestion and information. Its significance in the Histroy of Indian Education is incalculable."

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন

।। পটভূমি ।।

ভারতের নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে ইংরেজ বণিক্ কোম্পানী ও পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার যে শিক্ষা-ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করেছিল, তার সঙ্গে দেশের নাড়ীর কোন যোগ ছিল না। আমাদের দেশের প্রাচীন টোল-পাঠশালার মধ্য দিয়ে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, তাকে ভিত্তি ক'রে প্রয়োজনমত যুগোপযোগী সংস্কার ক'রে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা ভারতের বৈদেশিক শাসন-কর্তাদের ছিল না। **এডাম সাহেব বলেছিলেন—প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার কোন আয়োজন সার্থক করতে হলে তাকে জাতীয় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে।** তৎকালীন শাসক সম্প্রদায়, বিশেষ ক'রে মেকলে, দেশীয় শিক্ষার মান-উন্নয়নের প্রস্তাবকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে নাকচ ক'রে দেন। দেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হয়ে সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। যুগের দাবিকে উপেক্ষা না ক'রে তাঁরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করবার জন্য আগ্রহশীল হয়েছিলেন—কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতের উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবার প্রয়োজনে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা উৎসাহী হয়েছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংরেজী-শিক্ষিত একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠুক—যাদের সঙ্গে অধিকাংশ লোকের কোন যোগ থাকবে না, এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা তাঁরা চান নি। কিন্তু দেশের শাসকবর্গের মনোভাব ছিল অন্যরূপ। দেশ শাসনের প্রয়োজনেই তারা দেশে ইংরেজী শিক্ষিত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় শুধুমাত্র কোম্পানীর কর্মচারীর অভাবই পূরণ করবে না, কোম্পানীর শাসনের তারা হবে অন্ধ সমর্থক—এই ছিল কোম্পানীর মনোভাব। **উডের ডেসপ্যাচে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন, বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি করা সরকারী শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য।** সেই সঙ্গে বণিক কোম্পানী তাদের বাণিজ্যের স্বার্থের কথা ভুলতে পারে নি, তাই এর পরেই বলা হয়েছে, ইংলণ্ডের কারখানায় কাঁচা মালের যোগান দেওয়া ও ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করা সরকারী শিক্ষানীতির আর একটি উদ্দেশ্য।

বণিক্-মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইংরেজ এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। দেশের শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষার উন্নতির জন্য বহু কমিশন ও

কমিটি বসেছে, কিন্তু উড-কথিত মূলনীতি থেকে ইংরেজ-শাসিত ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা কোন দিন বিচ্যুত হয়েছে, একথা বলা চলে না। **উনবিংশ শতকে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'ল, তা নেহাৎ পুঁথিগত শিক্ষা।** ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থান উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছিল না বললেই চলে। আইন, চিকিৎসা, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কয়েকটি ভদ্রলোকের বৃত্তি শিক্ষার যে সামান্য আয়োজন ছিল, তার সুযোগ মুষ্টিমেয় লোকে পেত। মেডিকেল কলেজ ও এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ ক'রে সরকারী চাকরির চেষ্টাই তারা প্রথমে করত, আর সে সময়ে সরকারী চাকুরির অভাব ছিল না। যখন ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চার ফলে নিত্যনতুন আবিষ্কার হচ্ছিল ও শিল্পজগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তখন আমরা ইংরেজের গোলামখানায় নাম লিখিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সাক্ষাৎ ফললাভ থেকে বঞ্চিত ছিলাম।

।। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সূচনা ।।

ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় গণশিক্ষার অতি সামান্য আয়োজনই ছিল। ভ্রান্ত "চুঁইয়ে-পড়া শিক্ষানীতি" দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে গণশিক্ষাকে অবহেলা ক'রে উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করাই ছিল সরকারী শিক্ষানীতি। এর ফলে শহরাঞ্চলের মুষ্টিমেয় অধিবাসী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল। দেশের আপামর জনসাধারণ যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। গণশিক্ষার ব্যবস্থা, কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দাবি তোলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। অনেকে এগিয়ে এসে বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে উন্নত ধরনের পরিচালনায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলতে থাকে। বিজাতীয় প্রভাবমুক্ত এইসব কলেজের শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের চরিত্র ও জাতীয়তা উন্মেষের চেষ্টায় এঁরা ব্রতী হন।

।। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রথম পর্ব ।।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্য ক'রে ব্যাপক রূপ ধারণ করে। কিন্তু এর পূর্ব থেকেই ধীরে ধীরে এর প্রস্তুতিপর্ব চলছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, তা কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া। এই আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ১৯০১ খ্রীঃ বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে ছেলেদের

জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী গুরুকুল শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা প্রচার করেন। তাঁরই প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে কাংড়ী গুরুকুলের (১৯০৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবন গুরুকুল (১৯০২ খ্রীঃ) প্রথমে সেকেন্দ্রাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৯১১ খ্রীঃ বৃন্দাবনে স্থানান্তরিত হয়। বৈদিক ভারতে গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক যুগে নাগরিক জীবনের কলকোলাহলের বাইরে তপোবনের শান্ত পরিবেশে সেভাবে বিদ্যাচর্চাই ছিল গুরুকুলের আদর্শ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশের শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুরু করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ আহমেদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ সরকারী শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০২ খ্রীঃ লর্ড কার্জন সিমলায় ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের নিয়ে গোপন বৈঠকের পর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে প্রথমে কোন ভারতীয় সদস্য নেওয়া হয় নি। পরে এ নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হ'লে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ বিলগ্রামীকে ভারতীয় সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কার্জনের সাম্রাজ্যবাদীসুলভ প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই পরিচিত ছিল। তাই কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাধারণের মনে আশঙ্কা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট বের হলে দেখা গেল—উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাতের যে উদ্দেশ্য কার্জনের ছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে। স্যার গুরুদাস কমিশনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হ'তে পারলেন না, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধ মন্তব্যের কোন গুরুত্বই দেওয়া হ'ল না। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে তাঁর ভাষণে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন, **উচ্চ শিক্ষার সংকোচসাধনই লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য**। কমিশন সিদ্ধান্ত করেছিল, বেসরকারী আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দেওয়া হবে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হ'লে ভারত সরকার বেসরকারী আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

রাজনৈতিক নেতাদের আন্দোলন, বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সমাজসেবীদের প্রচেষ্টা ছাড়াও একজন আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ্ ছাত্রদের জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বিংশ শতাব্দী শুরু হবার পূর্ব থেকেই নিরলসভাবে কাজ করতে থাকেন। এই অক্লান্ত কর্মী, নিরলস শিক্ষা-সাধকের নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নাম 'ডন সোসাইটি'।

॥ ডন সোসাইটি ॥

সতীশচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা-প্রচেষ্টা ভাগবৎ চতুষ্পাঠী। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৯৫ খ্রীঃ সতীশচন্দ্র 'ভাগবৎ চতুষ্পাঠী' নামে ভবানীপুর অঞ্চলে একটি টোল খোলেন। ডন প্রথমে এই চতুষ্পাঠীর মুখপত্র ছিল (১৮৯৭ খ্রীঃ

থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ)। **সতীশচন্দ্র ১৯০২ খ্রীঃ ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ডন পত্রিকার নামানুসারে।** ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী উঠে গেলে ১৯০৪ খ্রীঃ ডন পত্রিকা সোসাইটির মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার নাম হয় "দি ডন এণ্ড ডন সোসাইটি'স্ ম্যাগাজিন"। ভারতবাসীকে ভারত সম্পর্কে সচেতন ও পরিচিত করবার জন্য এবং বিদেশীদের ভারত বিষয়ে অবহিত করবার জন্য ডন পত্রিকায় কয়েকটি নতুন বিভাগ এই সময় সংযোজিত হয়। ডন পত্রিকায় ভারততত্ত্ব (*Indology*) ও ভারতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রথমে রাজনৈতিক আলোচনা হ'ত না, পরে রাজনীতি বিষয় নিয়ে লেখা বের হ'ত।

ডন সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল যুব-সম্প্রদায়ের শিক্ষাদান। ছাত্রদের পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে উন্নত ধরনের শিক্ষাদান ও শিক্ষার অব্যবস্থা দূর করা সম্পর্কে সতীশচন্দ্র সচেষ্ট ছিলেন। ছাত্রদের চরিত্র গঠন করা, নৈতিক শিক্ষাদান, স্বার্থত্যাগ, কারিগরী শিক্ষা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রসমাজকে একমাত্র মানুষ করতে পারবে বলে সোসাইটি সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। সোসাইটিতে নিয়মিত ক্লাস হ'ত। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করত। এতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্লাস নিতেন ও তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

কারিগরী শিক্ষা সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতায় শিল্প-প্রদর্শনী হয়, স্বদেশী দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে ইতিহাস, দর্শন, শিল্প সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, সতীশচন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম পথপ্রদর্শক। শিক্ষা-আন্দোলন ও শিক্ষা-চিন্তা সম্পর্কেও ডন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা যে আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়, সতীশচন্দ্র যুক্তি দিয়ে দেশবাসীকে সে সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলেন।

১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর ডন সোসাইটি ক্রমে পরিষদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ বেঙ্গল ন্যাশানাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তার অধ্যক্ষ হন অরবিন্দ ও তত্ত্বাবধায়ক হন সতীশচন্দ্র। অরবিন্দ পদত্যাগ করলে সতীশচন্দ্র অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

ডন সোসাইটির প্রভাব তৎকালীন যুব-সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে ডন সোসাইটির সদস্যরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে, দেশপ্রেমের বাণী প্রচার ও যুব-সম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ক'রে, বিদেশী পণ্যবর্জন ও স্বদেশী শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেছিল। জাতীয় শিক্ষা-প্রচেষ্টায় ডন সোসাইটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ডন সোসাইটির এক সভায় সোসাইটির সদস্যদের লক্ষ্য ক'রে বলেন, "আপনারা যেভাবে দীক্ষিত ও অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহাতে বাহিরের কোন উত্তেজনার প্রয়োজন আপনাদের নাই। সতীশবাবু যে সময় ডন সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না। শিক্ষা-সম্পর্কীয় এই ন্যাশনাল

মুভমেন্টেরও তখন সূত্রপাত হয় নাই। এমন দিনে সতীশবাবু দূরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরের উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহৎ লক্ষ্য মাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সভা সাময়িক কোন বৃহৎ উত্তেজনা, উদ্দীপনার মুখে তৈয়ার হয় নাই, আপনারা সেই সভার আকর্ষণে এখানে মিলিয়াছেন। এতদিন ধীরে ধীরে উহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন তাহা পল্লবিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।" ডন সোসাইটি স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা-বিস্তারে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা অতুলনীয়।

।। বঙ্গ-ভঙ্গ ও জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ।।

শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে বঙ্গবিভাগ লর্ড কার্জনের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি। কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাবের ফলে দেশে তীব্র অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাঁর শিক্ষানীতি যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, দেশের শিক্ষিতসমাজ তা বুঝতে পেরে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করার জন্য প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থল বঙ্গভূমিকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে এই আন্দোলনকে দুর্বল করবার এক পরিকল্পনা তিনি করেন। বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বহুদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশব্যাপী তুমুল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ এই 'সুনিশ্চিত ঘটনাকে অনিশ্চিত করবার জন্য' যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলনে দেশের ছাত্ররা দলে দলে যোগ দেয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আন্দোলনে যোগ দেওয়া সরকার কোনরূপেই সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাংলা সরকার ছাত্রদের দমন করবার জন্য প্রথম নিয়ম জারী ও আইন পাস করলেন। সরকারী চণ্ডনীতি ছাত্রদলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র-আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করলে নানা জায়গায়—বিশেষ ক'রে রংপুর, ঢাকা, মাদারীপুরে ছাত্রদলন অত্যন্ত হিংস্র রূপ ধারণ করে। জাতীয় আন্দোলন থেকে ছাত্রদের সরিয়ে রাখবার জন্য রিজলী সার্কুলার, কার্লাইল সার্কুলার ও লায়ন সার্কুলার জারী করা হয়। শুধু মাত্র সার্কুলার জারী ক'রে যখন ছাত্রসমাজকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হ'ল না, তখন সরকার পাইকারীভাবে ছাত্রনির্যাতন শুরু করল। রংপুরে ও ঢাকায় বহু ছাত্রকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কোন কোন ছেলেকে বেত্রদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। রংপুরে অভিভাবকগণ জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করল। রংপুরে ছাত্র-নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় সরকারী স্কুল ত্যাগকারী ছাত্রদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (৯ই নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রীঃ)। জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনে রংপুরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় নেতাদের এক নতুন পথের সন্ধান দিল।

কার্লাইল সার্কুলারে (২২ অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ) স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষদের বলা হয়েছিল, ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বা সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এই সার্কুলার জারীর দু'দিন বাদে কলকাতার ফীল্ড এণ্ড একাডেমিক ভবনে জাতীয় শিক্ষার কথা আলোচনা করা হয়। এর কয়েকদিন বাদে এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন তবে একদিন ঠকিতেই হইবে।...(বিদেশী) গভর্ণমেণ্ট এদেশের অনুকূল শিক্ষা কখনও দিতে পারে না। বিদেশী অধ্যাপক অশ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দেন। শিক্ষা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিকট হইতে আমরা এমন একটি জিনিস পাই, যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়।"

কলকাতায় যখন সার্কুলারের ছড়াছড়ি তখন কলকাতার যুব-সম্প্রদায় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এণ্টি সার্কুলার সোসাইটি স্থাপন করেন। সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। ইনি ছিলেন সোসাইটির প্রাণস্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে সোসাইটির সভ্যগণ বিলাতী বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে চালাতে থাকে। কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে নির্যাতিত ও বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ ৯ই নভেম্বর তারিখে পান্তির মাঠে (এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল) এক বিরাট জনসভায় সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এই বিরাট দানের জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জাতির পক্ষ থেকে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ ও মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন।

রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েকমাস বাদে কলকাতায় National Council of Education বা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হয়। সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক তাঁর প্রতিশ্রুত এক লক্ষ টাকা পরিষদের হাতে দেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর ও সূর্যকান্ত ছাড়া এই উপলক্ষে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকেও প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। এই টাকায় জাতীয়তার আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হ'ল। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিদেশী সরকারের প্রভাবমুক্ত করে পুরোপুরি জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দেবার জন্য ৯২ জন সদস্য নিয়ে ১৯০৬ খ্রীঃ ১২ই মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেন। এঁদের চেষ্টায় রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে ১৯০৬ খ্রীঃ ১৪ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অনুমোদিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়। স্যার গুরুদাস সভায় উপস্থিত জনসাধারণের সামনে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন—তাঁরা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে দোষমুক্ত জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরোধিতা তাঁরা করবেন না। এই সভার পরদিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট বৌবাজার স্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়ীতে জাতীয় স্কুল-কলেজের কাজ শুরু হ'ল। জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হলেন শ্রীঅরবিন্দ ও প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কলেজ তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল—কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরী শাখায়

ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার অতি ব্যাপক বিবিধ শিক্ষার পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ শিক্ষাদান ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে অভিনব আয়োজন করেছিল। পাঠশালা থেকে হাতের কাজ ছিল আবশ্যিক। স্কুল বা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞান পড়বার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনা ও পঠন-পাঠনের জন্য সংস্কৃত, পালি, মারাঠি ও হিন্দী শেখবার ব্যবস্থা করা হয়। কলেজে উচ্চতর বিজ্ঞান শেখাবার ব্যাপক আয়োজন করা হয়। বৃত্তিমূলক কাজ শেখাবার জন্য কারিগরী বিভাগের ব্যবস্থা হয়। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় তত্ত্ব (Theory) ছাড়া প্রয়োগ ও উৎপাদন সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োগমূলক কাজের মধ্যে কাঠের কাজ, লোহার কাজ, ঢালাইয়ের কাজ ও যন্ত্রপাতি চালানোর কাজ শিখতে হ'ত। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বহু ছাত্রকে পরিষদ থেকে আমেরিকা পাঠানো হয়।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হ'লে নেতাদের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তারকনাথ পালিত ও নীলরতন সরকার কেবলমাত্র কারিগরী ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন—ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসারের উপর। নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কারিগরী শিক্ষারও উন্নয়নের জন্য তাঁরা ১৯০৬ খ্রীঃ বর্তমান আপার সার্কুলার রোডের উপর যেখানে বিজ্ঞান কলেজ, সেখানে বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন।

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন শুধুমাত্র কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় জাতীয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার দশটি শহরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অর্থ সাহায্যে পরিষদ-অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অর্থসাহায্য ও অনুমোদন ছাড়াও শিক্ষা-পরিষদের আদর্শে মফঃস্বলের বহু শহরে স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহে ও উদ্যোগে অর্থ সংগৃহীত হয়ে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয়, **কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বালক-বালিকাদের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে সচেষ্ট হ'বার সময় উপস্থিত হয়েছে।** জাতীয় আদর্শ স্বদেশবাসীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের প্রয়োজন অনুরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক এই প্রস্তাব যে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রভাবে গৃহীত হয়েছিল, এ বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বাংলার জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের সমর্থন লাভ করেছিল। তাঁর প্রভাবে বোম্বাই প্রদেশে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন বিস্তৃত লাভ করে ও সেখানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া, মাদ্রাজ প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০৯ খ্রীঃ অন্ধ্রে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হয়।

সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে দূরে থেকে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শে কয়েকটি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেই স্থাপিত হয়েছিল, একথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ব্যাপকভাবে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের পথ বাংলা দেশেই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে প্রদর্শিত হয়। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনকালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি বেশী দিন টেকে নি। স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে নাশন্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের অভাবে ও অর্থাভাবে কিছু কিছু জাতীয় বিদ্যালয় উঠে যেতে বাধ্য হয়। নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখে।

অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব :— মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার রিপোর্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিলে সরকার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধ শেষে 'ভারত রক্ষা আইনের' মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় দমননীতি চালু রাখার উদ্দেশ্যে কুখ্যাত 'রাওলাট আইন' পাশ হয় ও জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালিয়ে ইংরেজ সেনানায়ক ডায়ার শত শত নিরপরাধ নরনারীকে হত্যা করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এক বিরাট গণ-আন্দোলন শুরু হয়। সরকারী অফিস ও স্কুল-কলেজ বর্জনের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সহস্র সহস্র ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে মুক্তি-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। নতুন ক'রে ইংরেজপ্রভাবমুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য জাতীয় আন্দোলন সৃষ্ট হয়। ফলে, একদিকে যেমন স্কুল-কলেজ পরিত্যক্ত হ'ল, অপরদিকে তেমনি ছাত্রদের জন্য জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সময় কলকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও জাতীয় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। পাটনায় বিহার বিদ্যাপীঠ, বারাণসীধামে কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাটে গুজরাট বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্রে তিলক বিদ্যাপীঠ, অন্ধ্রে জাতীয় বিদ্যায়তন প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে প্রতি জেলায়, মহকুমায় এমনকি বড় বড় গ্রামে বিভিন্ন স্তরের জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আলিগড়ে "জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া" অর্থাৎ জাতীয় মুসলিম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ ক'রে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশপ্রেমিক শিক্ষাব্রতীগণ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথম অবস্থায় সরকার পরিচালিত ও অনুমোদিত স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা হঠাৎ খুব কমে যায়। ১৯২১-২২ খ্রীঃ শিক্ষা-সমীক্ষায় দেখা যায়—সেই সময়ে সমগ্র ভারতে ১২২৭টি জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৮,৫৭১ জন। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পুরানো স্কুলগুলিকে অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯২০-২১ খ্রীঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩৭,০০০ জন ও কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ৬০০০ জন কমে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফিস বাবদ ২,৬৩,০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **জাতীয় আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে**

কর্মীর অভাবে ও অর্থাভাবে বহু স্কুল উঠে যায়। এছাড়া সরকার-অনুমোদিত ডিগ্রী-ডিপ্লোমার জন্য ছাত্রসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই পুরাতন বিদ্যায়তনসমূহে ফিরে যায়। কলকাতায় জাতীয় মেডিকেল স্কুল, যাদবপুরের টেকনিক্যাল স্কুল, দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অসহযোগ-আন্দোলন প্রত্যাহারের পর টিকে থাকে নি।

॥ **শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রভাব** ॥

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন ও অসহযোগ-আন্দোলনকে উপলক্ষ ক'রে জাতীয় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভাবনা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দেখা গিয়েছে ও নানাস্থানে বেসরকারীভাবে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে বা আপনার মধ্যে জীবন-রসের অভাবে উৎসাহ গুটিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে—শুধুমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় সারা ভারতব্যাপী একটা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তুলে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তবু বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্মৃতি-বিজড়িত কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজও বেঁচে আছে ও জাতীয় সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতীয় বিদ্যায়তনগুলি অধিকাংশই টিকে থাকে নি বলেই জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে—একথা মনে করলে ভুল করা হবে। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, তা বিচার ক'রেই এই আন্দোলনের সার্থকতা নিরূপিত হবে।

রাজনৈতিক নেতারা যখন দেশে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন শুরু করেন, তখন জাতীয় শিক্ষা বলতে কি বুঝায়, এ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল বলে মনে হয় না। **জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ যখন স্থাপিত হ'ল তখন তার কর্মকর্তারা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি দূর করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার বিরোধিতার কথা তাঁরা বলেন নি। সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত শিক্ষাকেই হয়ত তাঁরা জাতীয় শিক্ষা বলতে চেয়েছেন।** কারণ ১৯০৬ খ্রীঃ কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষা-প্রস্তাবে স্বদেশবাসীর কর্তৃত্বাধীনে প্রয়োজনীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার কথাই তাঁরা বলেছেন। দেশের সর্বক্ষেত্রে বিজাতীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত হবার যে প্রয়াস, শিক্ষাক্ষেত্রকেও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত করাই জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনকারীদের প্রথম লক্ষ্য ছিল। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবার সুযোগ বা সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করা ও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করা। ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে অতীত গৌরব সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন ক'রে তোলাও জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। ডন সোসাইটির কার্যকলাপের মধ্যে আমরা দেখেছি, ভারতবাসীকে ভারত সম্পর্কে সচেতন ও পরিচিত করবার জন্য ও বিদেশীদের

ভারত সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য ভারততত্ত্ব-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে যা কিছু ভারতীয়, সেই সম্পর্কেই একটা অবজ্ঞার মনোভাব সৃষ্ট হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের ফলে শিক্ষিত সমাজ থেকে এই মনোভাব দূর হয়।

আমরা পূর্ব আলোচনায় দেখেছি জাতীয় আন্দোলনের একটি তরঙ্গ যখনই এসেছে, তখনই জাতীয় বিদ্যালয়-স্থাপনের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। আবার আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়গুলি টিকিয়ে রাখা একটা সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই জাতীয় শিক্ষা-আন্দোনের প্রত্যক্ষ ফল খুব গভীর না হলেও পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। **জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের একটা বড় দাবি ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা।** শিক্ষার বাহন ইংরেজী হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের পথে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদ উন্মেষের সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার আন্দোলন ও মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯০১ খ্রীঃ বিচারপতি রাণাডের চেষ্টায় বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে অন্য প্রদেশেও ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার দাবি নীতিগতভাবে স্বীকৃতি লাভ ক'রে এবং ধীরে ধীরে মাতৃভাষার সাহায্যে মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা চালু হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষাচর্চা নতুন প্রেরণা লাভ করে। জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। **ইংরেজীর স্থানে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা সম্পর্কে গণচেতনা দেখা দেয়।**

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ নেবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিয়েছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শে হরিদ্বার ও বৃন্দাবনে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দু'টি প্রতিষ্ঠানই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-মর্যাদাসম্পন্ন।

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের একটি দাবি ছিল কারিগরী ও যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত যাদবপুরে যন্ত্র-শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম ক'রে যাদবপুরের টেকনিক্যাল স্কুলটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' আজ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনের ফলেই সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি প্রবল হয়ে উঠে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে গণশিক্ষার বিস্তার না হলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, এ সত্যটি জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করবার পর থেকেই তাঁরা গণশিক্ষা-বিস্তারের জন্য চাপ দিতে থাকেন। ১৯০৩

খ্রীঃ গোখলে বলেন, অশিক্ষিত জাতি কোন দিনই কোন উন্নতি করতে পারে না, জীবন-যুদ্ধে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে। মাতৃভূমির উন্নতির জন্য চাই সার্বজনীন শিক্ষা। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রীঃ দু'টি বিল রাজকীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। বিল দু'টি গৃহীত হয় নি, কিন্তু সরকার নীতির দিক্ থেকে বিলের উদ্দেশ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংহত রূপ লাভ করে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনেরই পরিণত রূপ। জাতীয় কংগ্রেস ক্রমাগত দাবি করে এসেছে—দেশে সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হোক। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি যখন দেশে সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্নে বিভ্রান্ত, সেই সময়ে গান্ধীজি এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে। তাই আজ 'বুনিয়াদি শিক্ষা' নামে পরিচিত।

সাময়িক লাভের কথা চিন্তা না ক'রে যদি জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনকে সামগ্রিক ভাবে দেখা যায়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে—দেশের শিক্ষাকে জাতীয় ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যে প্রচেষ্টা একদিন শিক্ষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, তাই আজ বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে।

উডের ডেস প্যাচের পর থেকে দ্বৈত শাসনের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত ভারতে শিক্ষার অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র

১৮৫৫—১৯২১-২২ (বর্মা বাদ দিয়ে ব্রিটিশ ভারতের হিসাব)

	১৮৫৫	—	১৯২১-২২
বিশ্ববিদ্যালয়	×		১০
আর্টস কলেজ	২১		১৬৫
বৃত্তি-শিক্ষার কলেজ (বৃত্তি-শিক্ষার স্কুল সহ নর্মাল স্কুল বাদ দিয়ে)	১৩		৬৪
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮১		৭,৫৩০
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮১০		১৫৫,০১৭
বিশেষ বিদ্যালয়	৭		৩,৩৪৪
মোট অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান	৩,১৩২		১৬৬,১৩০
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র	১৩৫,০৭৯		[illegible],৩৯৬,৫৬০
	(টাকা)		(টাকা)
শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়	৯৯৯,০৯৮		১৭,৩৫,৮৮,০৯৯
শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়	জানা যায়নি		৮,৫৬,০১,৩৬৬

History of Education in India by Syed Nurallah and I. P. Naek.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বৈত শাসন যুগ

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ও শিক্ষা
দ্বৈত শাসনে শিক্ষা-সমস্যা
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন
হার্টগ কমিটির রিপোর্ট
সপ্রু কমিটির রিপোর্ট
কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাব
উড-এবট রিপোর্ট

শিক্ষা-প্রসার ও শিক্ষা-সমস্যা (১৯২১-৩৭)
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা
মাধ্যমিক শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা
বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন
মিশনারী প্রচেষ্টা
বয়স্কদের শিক্ষা

।। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ও শিক্ষা ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত বৃটিশ সরকারকে সর্বভাবে সাহায্য করেছিল। এই সাহায্যের বিনিময়ে বৃটিশ সরকার ভারতে দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদ্ধের অবস্থা ইংরেজদের অনুকূলে আসবার পর থেকে ভারত সরকার জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করে। ফলে, দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ শান্ত করবার জন্য ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতে আসেন। তিনি ভারতের বড়লাট চেমসফোর্ডের সঙ্গে একযোগে এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি ক'রে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত শাসন সংস্কার আইন (১৯১৯ খ্রীঃ) পাশ হয়। এই আইনের বলে ভারতে এক শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এই সংস্কার মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই আইন অনুসারে বড়লাটের শাসন পরিষদে তিনজন ভারতীয় সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং সমগ্র ভারতের জন্য আইন-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দুই পরিষদ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইন সভার সৃষ্টি হয়।

প্রাদেশিক ব্যাপারে এই সংস্কারে যে অভিনব শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, তা দ্বৈত শাসন বা ডায়ার্কী (Dyarchy) নামে খ্যাত। এই আইনের বলে প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন বিষয়গুলি দুইভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগের নাম হল সংরক্ষিত বিভাগ (Reserved), অপর ভাগের নাম হস্তান্তরিত বিভাগ (Transferred)। শিক্ষা হ'ল এই হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সংরক্ষিত বিভাগগুলি রইল গভর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্যদের অধীনে। আর হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনার ভার দেওয়া হল দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের হাতে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্য হতে গভর্ণর মন্ত্রী নিযুক্ত করতেন। মন্ত্রীরা তাঁদের কাজের জন্য দায়ী রইলেন ব্যবস্থাপক সভার নিকট।

এই শাসন-সংস্কারের ফলে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এই সংস্কারের প্রতিক্রিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল, আমরা সেইটুকু আলোচনা করব। শিক্ষা-বিভাগের হস্তান্তর বিনা বাধায়

সম্পাদিত হয়নি। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয় সম্প্রদায় প্রথমেই আপত্তি তুলল ভারতীয়দের হাতে তাদের শিক্ষা ব্যাহত হবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। সংযুক্ত প্রদেশ (ইউ. পি.) বাদে কোন প্রাদেশিক সরকারই শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরিত করবার পক্ষপাতী ছিল না। ভারতশাসন-আইনে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং য়ুরোপীয়দের শিক্ষা ও কোন কোন অঞ্চলের শিক্ষা-ব্যবস্থা (যেমন বাংলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং) প্রাদেশিক, কিন্তু সংরক্ষিত রেখে বাদ বাকী শিক্ষা-ব্যবস্থা হস্তান্তরিত বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বেনারস, আলিগড় এই জাতীয় সর্ব-ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন অঞ্চলের শিক্ষা নিজের ব্যবস্থাধীনে রাখে। এর ফলে সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা কিছুটা সংরক্ষিত, কিছু হস্তান্তরিত, কিছুটা কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়ে এক প্রশাসনিক বিভ্রাটের সৃষ্টি করে।

॥ দ্বৈত শাসনের শিক্ষা-সমস্যা ॥

নির্বাচিত মন্ত্রিগণ শিক্ষা-বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেই প্রথমে যে বাধায় সম্মুখীন হন, তা হচ্ছে অর্থনৈতিক বাধা। অর্থ ছিল সংরক্ষিত বিভাগের অন্তর্গত। শিক্ষা-প্রসারের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য মন্ত্রীদের ধর্না দিতে হত অর্থবিভাগের দরজায়। প্রয়োজনীয় অর্থ কোন সময়ই এখান থেকে সহজলভ্য ছিল না। ফলে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দূরের কথা, অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাই সময় সময় কষ্টকর হয়ে উঠত।

তারপর শিক্ষা-বিভাগ পরিচালনায় মন্ত্রীদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা-বিভাগের প্রধান প্রধান পদে আই. ই. এস. (I. E. S.) অফিসাররা অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁরা কালো চামড়ার মন্ত্রীদের প্রায় আমলই দিতে চাইতেন না। শিক্ষা-সংক্রান্ত সাধারণ নীতি নির্ধারণ করতেন মন্ত্রীরা, আর এই নীতিকে কাজে রূপ দেবার ভার ছিল শিক্ষা-বিভাগের হাতে। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় না হলে শাসন-বিভ্রাট হতে বাধ্য। আর কার্যক্ষেত্রে হয়েছিলও তাই। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্মীদের অসহযোগিতা ও বিরূপ মনোভাবের ফলে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা দূর করবার জন্য লী কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৪ খ্রীঃ থেকে শিক্ষা-বিভাগের জন্য I. E. S. কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শিক্ষা-বিভাগে পূর্বতন I. E. S. অফিসাররা ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রীরা এদের উপর বিশেষ কর্তৃত্ব করতে পারেন নি। ফলে, এই সমস্যা আর এক নতুন দ্বৈত শাসনরূপে শিক্ষা-পরিচালনাকে জটিলতর ক'রে তোলে।

দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয়রূপে স্থির হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষা-সম্পর্কীয় দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শিক্ষার জন্য যে অর্থ পাওয়া যেত, তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা-প্রসারের পথে অর্থের অভাব বড় অন্তরায় হয়ে দেখা দিল। দেশের শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের

এই উদাসীনতাকে হার্টগ কমিটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলে বর্ণনা করেন—("We are of the opinion that the divorce of the Government of India from education has been unfortunate.")

হার্টগ কমিটি সুপারিশ করেন যে, অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে এবং সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত্ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সাহায্য করা।

বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-প্রচেষ্টায় একটা সমন্বয়-সাধনের জন্য ১৯২১ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (Central Advisory Board of Education) স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক শিক্ষার সমন্বয়-সাধন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। সত্যিকারের প্রয়োজনীয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে দু'বছর বাদেই হঠাৎ ব্যয়-সংকোচের অজুহাতে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হতে থাকে। সর্বভারতীয় শিক্ষা-সমস্যাগুলি সমাধানের সম্ভাবনা এর পর আর রইল না। ভারত সরকার এইখানেই ক্ষান্ত হয়নি, শিক্ষা-বিভাগকে রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় এই বিভাগের পূর্ব গুরুত্ব আর রইল না। এরপর ব্যুরো অব এডুকেশন (Bureau of Education) বন্ধ ক'রে দিয়ে চরম উদাসীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। হার্টগ কমিটির পরামর্শে ১৯৩৫ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি (C. A. B. E.)-কে পুনর্গঠন করা হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ ব্যুরো অব এডুকেশনকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসমূহ গঠিত হবার পর নতুন উদ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের কাজ শুরু হয়। আলোচ্য যুগে উদ্যমের অভাব না থাকলেও প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তার কার্যে নানা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয়, যার ফলে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয়নি। দেশব্যাপী মহামারী, অর্থনৈতিক সংকট, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য-আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি সবকিছুই শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

ব্যয়-সংকোচের অজুহাতে সরকার শিক্ষার জন্য পূর্বের তুলনায় আনুপাতিক হারে কম অর্থ ব্যয় করতে শুরু করে। ১৯২২ খ্রীঃ শিক্ষার জন্য মোট যে ব্যয় হয়, সরকার সেই ব্যয়ের ৪০'৩%বহন করে। কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীঃ এই মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে হয় ৩১%। সরকারী ব্যয়-সংকোচ সত্ত্বেও শিক্ষার যেটুকু প্রসার এই যুগে হয়েছে, তার ব্যয়ভার এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ স্বেচ্ছায় বহন করেছে। দেশের লোক শিক্ষা সম্পর্কে পূর্বের থেকে বেশী সচেতন হওয়ায় সরকারী অর্থসাহায্য ব্যতীতই বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আলোচ্য যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিগঠনে শিক্ষার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পেরেই নবজাগ্রত শিক্ষিত সমাজ গণশিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টাকে একটি মহান জাতীয় কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল। এই সময়কার জাতীয় মনোভাব তৎকালীন শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—A burst of enthusiasm swept children into school with unparalalled rapidity and almost child-like faith in the

value of education was implanted in the minds of people. Parents were prepared to make almost any sacrifice for the education of their children, the seed of tolarance towards the less fortunate in life was begotten, ambitious and comprehensive programmes of development were formulated, which were calculated to fulfil the dreams of literate India. (*Review of the Progress of Education in India 1927-32, vi, P. 3*) সরকারী ব্যয়-সংকোচের নীতি বলবৎ থাকলেও ভারতীয় উদ্যমে ও অর্থব্যয়ে শিক্ষার কতটা প্রসার হয়েছিল, নীচের তালিকা দেখলে তা বোঝা যাবে :—

শিক্ষার প্রসার (১৯২১-২২—১৯৩৬-৩৭)

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		ছাত্রসংখ্যা	
	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১০	১৫	×	৯৬৯৭
আর্টস কলেজ	১৬৫	২৭১	৪৫,৪১৮	৮৬,২৭৩
বৃত্তিশিক্ষা কলেজ	৬৪	৭৫	১৩,৬৬২	২০,৬৪৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭৫৩০	১৩,০৫৬	১১,০৬,৮০৩	২২,৮৭,৮৭২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫,০১৭	১,৯২,২৪৪	৬১,০৯,৭৫২	১,০২,২৪,২৮৮
বিশেষ বিদ্যালয়	৩,৩৪৪	৫,৬৪৭	১,২০,৯২৫	২,৫৯,২৬৯
অনমুমোদিত প্রতিষ্ঠান	১৬,৩২২	১৬,৬৪৭	৪,২২,১৬৫	৫,০১,৫৩০
মোট—	১,৮২,৪৫২	২,২৭,৯৫৫	৭৮,১৮,৭২৫	১,৩৩,৮৯,৫৭৪

* এই পরিসংখ্যায় দেশীয় রাজ্য ও বার্মার হিসাব ধরা হয়নি—(A Students' History of Education in India by Nurullah and J. P. Naik).

॥ জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ॥

মন্টেগু-চেমস ফোর্ড সংস্কারের রিপোর্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হলে সরকার জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য কুখ্যাত রাওলাট আইন (Rowlatt Act) পাশ করে এবং জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালিয়ে ইংরেজ সেনানায়ক মাইকেল ও'ডায়ার শত শত নিরপরাধ নরনারীকে হত্যা করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এক বিরাট গণ-আন্দোলন শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেন। এই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সহস্র সহস্র ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ

করে। নতুন ক'রে ইংরেজ-প্রভাবমুক্ত-শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১ খ্রীঃ বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতায় গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাটনা, কাশী, গুজরাটে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানে আজাদ স্কুল স্থাপিত করে। আলিগড়ে "জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া" অর্থাৎ জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ ক'রে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাশীল হবে, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার চেতনা লাভ করবে—এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশপ্রেমিক সমাজ-সংস্কারগণ এই বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথম অবস্থায় সরকার-পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা হঠাৎ খুব কমে যায়। এর ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯২০-২১ খ্রীঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩৭,০০০ জন ও কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৬,০০০ জন কমে যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফিস বাবদ ২,৬৩,০০০ টাকা ক্ষতি হয়। জাতীয় আন্দোলন মন্দীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে উঠে যেতে থাকে। শুধু মাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় সারা ভারতব্যাপী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তবুও বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজও বেঁচে আছে ও জাতীয় সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের একটা বড় দাবী ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দাবী নীতিগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের এই সাফল্যের মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৯২১-২২ খ্রীঃ

প্রদেশ	প্রতিষ্ঠান-সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
মাদ্রাজ	৯২	৫,০৭২
বম্বে	১৮৯	১৭,১০০
বাংলা	১৯০	১৪,১৮৯
ইউ. পি.	১৩৭	৮,৪৭৬
পাঞ্জাব	৬৯	৮,০৪৬
বিহার-উড়িষ্যা	৪৪২	১৭,৩৩০
মধ্য প্রদেশ	৮৬	৬,৩৩৮
আসাম	৩৮	১,৯০৮
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৪	১২০
মোট	১,২২৭	৭৮,৫৭১

Progress of Education in India 1917-22, Vol. I, P. 226.

॥ হার্টগ কমিটির রিপোর্ট ॥

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বিধিবদ্ধ হবার সময় স্থির হয়েছিল এই সংস্কার কতটা সফল হল, তা তদন্তের জন্ম দশ বছর বাদে একটি রয়েল কমিশন বসবে। কিন্তু দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিক্ষোভের ফলে ১৯২৭ খ্রীঃ স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্পর্কে তদন্তের জন্ম এক কমিশন নিয়োগ করা হয়। ভারতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও এ সময়ে দেশে এক বিরাট অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত ক'রে রিপোর্ট পেশ করবার জন্ম সাইমন কমিশন ১৯২৮ খ্রীঃ স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে এক উপ-সমিতি নিয়োগ করেন। এই উপ-সমিতি (Auxiliary Committee of the Indian Statutory Commission) ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে তদন্ত ক'রে ১৯২৯ খ্রীঃ এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 'হার্টগ রিপোর্ট' নামে পরিচিত।

হার্টগ কমিটির রিপোর্টে ১৯১৭ খ্রীঃ হতে ১৯২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত গণশিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার সর্বদিকে দ্রুত প্রসারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ সময়ে সমাজের প্রতি স্তরেই শিক্ষা সম্পর্কে একটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষা-বিভাগের দায়িত্ব দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে দেওয়ায় জনসাধারণের দাবী মেটাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সম্প্রসারণের চেষ্টা এ সময়ে শুরু হয়েছিল। শিক্ষা শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণী বা বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অনুন্নত সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নারীসমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা দেখা দেওয়ার ফলে অতীতের সামাজিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে নারীসমাজ আগ্রহশীল হয়ে ওঠে।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

শিক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী এই ব্যাপক আগ্রহ সত্ত্বেও কমিটি গণশিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যে হারে বেড়েছিল, গণশিক্ষার প্রসার সে হারে হয়নি। উচ্চশিক্ষার বিস্তারে অতীতে যতটা উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকার থেকে সেই পরিমাণ উদাসীনতাই দেখানো হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পথে যেসব অন্তরায় রয়েছে, সে সম্পর্কে কমিটি বলেন, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যা প্রধানতঃ গ্রামীণ ভারতের সমস্যা। এদেশের শতকরা ৮৭ জন লোক গ্রামে বাস করে, তার মধ্যে ৭৪ জন লোকই কৃষিজীবী। গ্রামীণ শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারাই এই বিরাট দেশের নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব। কিন্তু পথঘাটের অভাব, যাতায়াতের অসুবিধা প্রভৃতির জন্ম জনবসতি-বিরল অঞ্চলে এক জায়গায় ছাত্র যোগাড় ক'রে স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামি, জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা, সাম্প্রদায়িক

মনোভাব প্রভৃতি গণশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের ত্রুটিপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাও গণশিক্ষা-প্রসারের পথে অন্যতম বাধা।

কমিটি বলেন, যে প্রাথমিক শিক্ষায় নিরক্ষরতা দূর হয় না, সে শিক্ষা শ্রম ও অর্থের অপচয় মাত্র। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শোচনীয় অর্থ ও শ্রমের অপচয় এরা লক্ষ্য করেছিলেন। একজন শিক্ষার্থী যদি চার বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না ক'রে, তা হলে শিক্ষার্থীকে সাক্ষরপ্রাপ্ত (literate) বলে স্বীকার করা যায় না। গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই চার বছর স্কুলে পড়ত। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ অপচয় আরও শোচনীয়। তাই কমিটি মন্তব্য করেছেন—

"Throughout the whole educational system there is waste and ineffectiveness. In the primary system, which, from our point of view, should be designed to produce literacy and capacity to exercise an intelligent vote, the waste is appalling. So far we can judge the vast increase in the numbers in Primary schools produce no commensurate increase in literacy, for only a small portion of those who are at Primary stage reach Class IV, in which the attainment of literacy may be expected. The wastage in the case of girls is even more serious than in case of boys. (*Hartog Report*)

কমিটির তদন্তে জানা যায়, বৃটিশ ভারতে ১৯২২-২৩ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীর মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯২৫-২৬ খ্রীঃ মোট শতকরা মাত্র ১৯ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা এমনি ক'রে কমে যাওয়ার দু'টি কারণ কমিটি নির্দেশ করেছেন।

(১) অনুন্নয়ন (Stagnation): পরীক্ষায় ফেল করবার জন্য একই শ্রেণীতে একাধিক বছর থেকে যাওয়া।

(২) অপচয় (Wastage): সাক্ষরতা লাভ করবার পূর্বেই শিক্ষার্থীকে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া।

এই দেশে অনুন্নয়নের জন্য প্রতি বছর ৩০% থেকে ৫০% শিশু একই শ্রেণীতে থেকে যায়। যার ফলে সময়, শ্রম ও অর্থের বিপুল অপচয় ঘটে।

চতুর্থ শ্রেণীতে উঠবার আগেই স্কুল ছেড়ে যাওয়ায় সাক্ষরতা লাভ করতে পারে না বা যেটুকু শিক্ষা পেয়েছিল, তাও চর্চার অভাবে ভুলে গিয়ে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। কমিটি একে বলেছেন—Relapse into illiteracy. কমিটির মতে বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবের ফলে সামান্য শিক্ষিতেরা নিরক্ষরতায় প্রত্যাবর্তন করে।

শিক্ষা-প্রসারের অসুবিধার কথা উল্লেখ ক'রে কমিটি বলেছেন, ৫০০ অথবা এর চেয়ে

কম জনসংখ্যা-বিশিষ্ট গ্রামে স্কুল স্থাপন করলে তা অর্থনৈতিক কারণে সফল হ'তে পারে না। ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয় অচল হয়ে যায়।

জনাকীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে অধিকসংখ্যক ছাত্র ভীড় করায় স্থান সংকুলান হয় না। ফলে, ইচ্ছা থাকলেও ছেলেরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

স্কুলের সদ্ব্যবহারের অভাব, অর্থাৎ কোন কোন অঞ্চলে স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলে-মেয়ে রয়েছে, স্কুলও রয়েছে, কিন্তু সেখানকার ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় না। এতেও অর্থের অপচয় হয়।

সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ স্কুলেব দাবী ও ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলের দাবীকেও অপচয়ের কারণ বলে ধরা যায়।

এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের শিক্ষা, ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, পরিদর্শনের অভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ৪১% ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে বাংলার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ২৫% শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। শিক্ষকদের অতি সামান্য বেতন ও বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির জন্য অনেক সময় বিদ্যালয়গুলি টিকে থাকত না। সরকারী পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকলেও এক-একজন পরিদর্শককে এত বেশী স্কুল পরিদর্শন করতে হ'ত যার ফলে দুর্গম অঞ্চলে ২।৩ বছরের মধ্যে একবারও পরিদর্শন হত না।

পাঠক্রমের সঙ্গে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তার কোন সম্পর্ক না থাকায় বহু অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করতেন না।

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে জীবনে যে কোন ক্ষতি হতে পারে, একথা বিশ্বাস করবার কোন কারণ তারা খুঁজে পেত না।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। এছাড়া, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথ-রূপে পালন না করায় শিক্ষাব অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দূর করবার জন্য কমিটি বলেন, স্কুলগুলির পুনর্বণ্টন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় স্কুলগুলি তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। উন্নত সংগঠন-ব্যবস্থা ক'রে স্কুলগুলির মান উন্নত করতে হবে।

শিক্ষকদের শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা (Refresher Course) করতে হবে। বেতন-বৃদ্ধি ও চাকরির অবস্থার উন্নতি ক'রে উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা-গ্রহণে আকৃষ্ট করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার কাল কমপক্ষে চার বছর ধার্য করতে হবে।

স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে স্কুল বসবার সময় নির্ধারণ ও ছুটির দিনগুলি ধার্য করতে হবে। নীচের ক্লাসগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে সেখানে অনুন্নয়ন (Stagnation) ও অপচয়ের (Wastage) ফলে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস না পায়।

স্কুল পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে নিয়মিত স্কুল-পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র ক'রেই পল্লী-উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে। উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হবার আগে বাধ্যতামূলক প্রাথামক শিক্ষা প্রবর্তন করা চলবে না। ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে এক-একটি অঞ্চল ধরে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেও কতকগুলি ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান অসাফল্যকে বিরাট অপচয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নীচু শ্রেণীতে প্রমোশন দেবার ব্যাপারে অতিরিক্ত উদারতাই এই অপচয়ের অন্যতম কারণ বলে নির্দেশ করা হয়। অযোগ্য ছাত্রকে পরীক্ষার ফলাফল বিচার না ক'রে ক্লাসে উঠিয়ে দেবার ফলে বহু অবাঞ্ছিত ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য ভীড় করছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার এই দুর্বলতাকে দূর করবার জন্য কমিটি সুপারিশ করে যে, (১) মধ্য ভার্নাকুলার স্কুলে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে, এবং অধিকসংখ্যক ছাত্রকে এই দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। (২) অধিক সংখ্যক ছাত্রকে মধ্যশিক্ষা স্তর পার হবার পর শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে। (৩) উচ্চ বিদ্যালয়ে বহু বিকল্প শাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৪) নিম্নস্তরের শ্রেণী-উন্নয়ন ব্যবস্থায় আরও কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।

॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিটি বলেন, ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানো শুধুমাত্র ঐকিক (Unitary) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নীচু হওয়া সম্পর্কে বলা হয়, প্রতি বছর বহু অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ছাত্র এসে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় করায় উচ্চশিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। কমিটি বলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় কঠোরতা অবলম্বন ক'রে অযোগ্য ছেলেদের কলেজে প্রবেশের পথ বন্ধ করতে হবে। অনার্স কোর্স শুধুমাত্র কয়েকটি সুনির্বাচিত কলেজে পড়ানো হবে। কলেজের গ্রন্থাগারের উন্নতি করতে হবে, গবেষণার উন্নততর ব্যাবস্থা করতে হ'বে, টিউটোরিয়াল ক্লাস সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

॥ স্ত্রীশিক্ষা ॥

কমিটি প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের সংখ্যানুপাতের বিরাট পার্থক্য তুলে ধরে স্ত্রীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নারী-শিক্ষায় অপচয় সম্পর্কে বলা হয়, নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন ও অপচয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। এছাড়া বহু গ্রামে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। শহরে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং শিক্ষিকার অভাবে মেয়েদের শিক্ষা

ব্যাহত হচ্ছে। মেয়েদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগতে পারে, কমিটি সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম-রচনার পরামর্শ দেন। উপযুক্ত বেতনে যথেষ্ট-সংখ্যক শিক্ষিকা ও পরিদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশও করা হয়। ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার কথা কমিটি বিবেচনা ক'রে দেখতে বলেন। প্রতি প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য একজন ক'রে ডেপুটি ডাইরেক্টর নিয়োগ করবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কমিটি মন্তব্য করে যে, কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা-হস্তান্তর আকস্মিক হয়েছে। দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ রাখবার উপর কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটির মতে প্রাথমিক শিক্ষার সব দায়িত্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। শিক্ষা-বিভাগের কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষা-কমিশনারের হাত থেকে কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তা (D. P. I.) ও শিক্ষা-বিভাগের সম্পাদকদের নিয়মিত সম্মেলনের ব্যবস্থা করবেন।

॥ ফলশ্রুতি ॥

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কমিটির রিপোর্টের কিছু দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী অর্থসংকট ও ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হবার ফলে কমিটির বহু সুপারিশই কার্যকর করা হয়নি। কমিটি মন্তব্য করেছিল, শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে ও অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগসমূহ শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে শিক্ষাকে সংগঠনের নামে শিক্ষা-সংকোচনে ব্রতী হল। সরকারী শিক্ষা-সংহার নীতিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয় ও জনসাধারণ সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। দেশের জনমত প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের স্বপক্ষে থাকায় ১৯৩৭ খ্রীঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে জনমতের বিরোধ চলতে থাকে। শিক্ষা-বিভাগের আই. ই. এস. (I. E. S.) কর্তা-ব্যক্তিরা শিক্ষার মান-উন্নয়নের প্রশ্নে শিক্ষা-সংকোচনে যে পরিমাণ উৎসাহী ছিল, হার্টগ কমিটির কতগুলি অতি-প্রয়োজনীয় সুপারিশ কার্যকর করতে সেরূপ উৎসাহ দেখানো প্রয়োজন বোধ করেনি। শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধি, পরিদর্শন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিদর্শকদের সংখ্যা-বৃদ্ধি, বাস্তবধর্মী পাঠক্রমের প্রবর্তন, বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি অতি মূল্যবান সুপারিশ-সমূহ কার্যকর করবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে শিক্ষাবিভাগ মনে করে নি।

॥ সপ্রু কমিটির রিপোর্ট ॥

দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা একটি জটিল সমস্যা। দেশের অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে এই শিক্ষিত বেকার সমস্যা। দেশের শিক্ষিত

বেকার-সমস্যা কি ক'রে সমাধান করা যায়, যুক্ত প্রদেশের সরকার সেই সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য ১৯৩৪ খ্রীঃ স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে এক কমিটি নিয়োগ করে।

কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য ও ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত করা হয়। জীবনের প্রয়োজনীয় বৃত্তিশিক্ষার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। কমিটি সুপারিশ করেন যে:—

(১) মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

(২) ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা বলে কিছু থাকবে না। এর দু'টি বছরের একটি বছর স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। স্কুলের এগার বছরের শিক্ষাকে দু'ভাগ ক'রে প্রথম পাঁচ বছর হবে প্রাথমিক শিক্ষা, পরের ছ'বছর হবে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল।

(৩) ডিগ্রী (বি. এ.) কোর্স তিন বছর কাল ব্যাপী হবে।

(৪) নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর পার হলে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যন্ত্র প্রভৃতি নানা শিক্ষার আয়োজন করা হবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাব

(Resolutiou of the C. A. B. E.)

শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় প্রদেশিক শিক্ষাবিভাগ-সমূহ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে শুরু করে। সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধনের যে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করেছিল, দ্বৈত শাসনের যুগে তার বিলোপ ঘটবার সম্ভবনা দেখা দেয়। সর্বভারতীয় শিক্ষা-সমস্যা সমাধান, প্রাদেশিক প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়-সাধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য ১৯২১ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্ট সমিতি গঠিত হয়েছিল। ব্যয়-সংকোচের অজুহাতে এই অতি-প্রয়োজনীয় বিভাগটি সৃষ্ট হবার দু'বছরের মধ্যেই তুলে দেওয়া হয়। হার্টগ কমিটি সমগ্র দেশের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টায় সমন্বয়-সাধনের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে এই সমিতির পুনর্গঠনেব জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি পুনরুজ্জীবিত করা হয়। কমিটি নতুন ক'রে গঠিত হবার পর প্রথম বাৎসরিক সভায় নিম্নপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করে।

(১) দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা এরূপভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ ক'রে শুধু মাত্র শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়াও সরাসরিভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করতে পারে।

(২) স্কুলের শিক্ষা কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হবে—

(ক) প্রাথমিক স্তর—এই স্তরে নিম্নতম প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, যাতে ছাত্ররা স্থায়ীভাবে সাক্ষরতা লাভ করতে পারে।

(খ) নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর—এই স্তরে স্বয়ংসম্পূর্ণ সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, যার ফলে ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে। পল্লী-অঞ্চলে এই স্তরের শিক্ষা পল্লী-জীবনের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে করা হবে।

(গ) উচ্চ-মধ্যশিক্ষার স্তর—এই স্তরে বহুমুখী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে—যাতে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারে, গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য ট্রেনিং গ্রহণ করতে পারে এবং কৃষি, কেরানী প্রভৃতি বৃত্তির জন্য শিক্ষালাভ করতে পারে ও বিশেষভাবে নির্বাচিত কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করতে পারে।

(৩) নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে প্রথম সাধারণ পরীক্ষার (Public Examination) ব্যবস্থা থাকবে।

(৪) এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করবার পূর্বে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করা হবে।

উড-এবট্ রিপোর্ট (Wood-Abbot Report)

শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি (C. A. B. E.) শিক্ষা-সংস্কারের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার ইংলণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশনের কারিগরী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শক মিঃ এবট এবং ডিরেক্টর অব ইনটেলিজেনস্ মিঃ এস. এইচ. উডকে ভারতে বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁরা এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে ১৯৩৭ খ্রীঃ তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাধারণ শিক্ষা ও পরিচালন-ব্যবস্থা, এই অংশের রিপোর্ট তৈরি করেন মিঃ উড। দ্বিতীয় ভাগে আছে বৃত্তিশিক্ষা-ব্যবস্থা, এই অংশের রিপোর্ট তৈরি করেন মিঃ এবট।

।। সাধারণ শিক্ষা-সম্পর্কীয় রিপোর্ট ।।

(১) বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীর শিক্ষার ভার, যতদূর সম্ভব বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এজন্য স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষা তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতার উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষার জন্য বইয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শিশুদের উপযোগিতা-ভিত্তিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচলিত সংকীর্ণ পাঠক্রম-ভিত্তিক শিক্ষা শিশুদের মানসিক গঠনের অন্তরায়।

(৩) গ্রাম্য মধ্যশিক্ষার পাঠক্রম গ্রাম্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হবে। ইংরেজী এই স্তরে শেখানো হলেও দেখতে হবে ভাষার ভারে যেন শিক্ষার্থী পিষ্ট না হয়।

(৪) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন, কিন্তু এই স্তরে ইংরেজী বাধ্যতামূলক হবে। সাধারণ ছাত্রদের যতদূর সম্ভব ব্যবহারিকভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হবে। উপযুক্ত ও আগ্রহশীল ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্য অনুশীলনের সুযোগ

দিতে হবে। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী সাহিত্যের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংগ্রহ করতে হবে।

(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণ দুইটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। শিক্ষকতা-গ্রহণের পূর্বে নর্মাল স্কুল বা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, কিছুদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর স্বল্পকালস্থায়ী ট্রেনিং নিতে হবে, এজন্য রিফ্রেশার ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

॥ বৃত্তিশিক্ষা-সম্পর্কীয় সুপারিশ ॥

বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয়, বৃত্তিশিক্ষা দিয়েই দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন দেশে শিল্পের প্রসার। বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত কর্মী সৃষ্ট হবে, তাদের কর্মে নিয়োগের প্রশ্ন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে জড়িত। বৃত্তিশিক্ষাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ এ শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার মতই সুরুচিসম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক সৃষ্ট হবে।

(১) বৃত্তিশিক্ষা সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা নিম্নস্তরের শিক্ষা নয়। সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহ ও মনের শক্তিকে উদ্বোধিত করা, যার ফলে শিক্ষার্থী সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে।

(২) সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির নয়, কারণ বৃত্তিশিক্ষার ভিত্তি সাধারণ শিক্ষায় নিহিত।

(৩) সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা একই বিদ্যালয়ে দেওয়া হবেনা। কারণ এতে ভিন্ন রকমের কাজ করতে হবে।

(৪) বৃত্তিশিক্ষা শুধু মাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু বৃত্তিলাভের জন্যই এই শিক্ষার আয়োজন, তাই শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সহযোগিতায় এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকদের সহযোগিতার জন্য শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি ও দেশের শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৃত্তিশিক্ষার জন্য উপদেষ্টা-সমিতি গঠন করতে হবে।

(৬) বৃত্তিশিক্ষার স্কুলগুলি জুনিয়ার ও সিনিয়ার এই দুই ভাগে বিভক্ত থাকবে।

(৭) নিম্ন-মধ্যশিক্ষা শেষ ক'রে জুনিয়র বৃত্তিশিক্ষা ও উচ্চ মধ্যশিক্ষা শেষ ক'রে শিক্ষার্থী সিনিয়র বৃত্তিশিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করবে।

(৮) জুনিয়র বৃত্তিশিক্ষা তিন বছর কাল স্থায়ী হবে এবং সিনিয়র বৃত্তিশিক্ষাকাল দু' বছর স্থায়ী হবে। এই শিক্ষাকে যথাক্রমে উচ্চমাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের সমান বলে গণ্য করা হবে।

(৯) কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আংশিক সময়ে (Part time) শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) সরকারী ব্যবস্থাপনায় বৃত্তিশিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(১১) শিক্ষার্থী অল্প বয়সে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী বৃত্তি-নির্বাচনে যাতে ভুল না করে, সেইজন্য তাকে পরামর্শ দেবার জন্য অন্যান্য দেশের মত ভারতেও Vocational Guidance-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সুপারিশগুলি ভারতের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা ক'রেই করা হয়েছিল। মিঃ এবট বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে সব মূল্যবান সুপারিশ করেছিলেন, তার অধিকাংশই কাজে পরিণত করা হয় নি। বৃত্তিশিক্ষার সুপারিশসমূহ কার্যকর করবার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে দিল্লী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে "দিল্লী পালটেকনিক" স্কুলে পরিণত করা হয়। এইটিই বৃত্তিশিক্ষামূলক এই জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ের ৪টি বিভাগ ছিল। (১) পালিটেকনিক হাই স্কুল, এখানে ১০।১২ বছর থেকে ১৬।১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (২) ১৭ বছরের অধিক বয়স্কদের জন্য সিনিয়র বৃত্তিশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। (৩) পল্লী-শিল্প বিভাগ—এখানে পল্লীর বিভিন্ন বৃত্তি-জীবনের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (৪) বয়স্কদের বহুমুখী শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্যালয়ের অনুকরণে আরও কয়েকটি কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

শিক্ষার প্রসার (১৯২১-৩৭ খ্রীঃ)

।। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ।।

দ্বৈত শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়েছিল। ১৯২১-২২ খ্রীঃ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের কলেজের সংখ্যা ছিল মোট ২৭টি ও ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৬,২২৮ জন, ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ সেখানে কলেজের সংখ্যা হয় ৪৪৬টি ও ছাত্রসংখ্যা হয় ১,২৬,২২৮ জন। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রসারের জন্য নতুন নতুন বিভাগ ও বিভিন্ন কোর্স খোলা হয়েছিল।

১৯১৩ খ্রীঃ শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়েছিল প্রতি প্রদেশে একটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যতদূর সম্ভব শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) ঐকিক (Unitary) ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন। হার্টগ কমিটি মন্তব্য করেন, ভারতের মত বিশাল দেশের পক্ষে ঐকিক এবং অনুমোদন ও পরীক্ষা-গ্রহণকারী উভয় প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। আলোচ্য যুগে উভয় আদর্শের কয়েকটি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ-মত ঢাকা এবং একই আদর্শে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২০ খ্রীঃ বার্মার জন্য রেঙ্গুনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত দিল্লী ও নিকটবর্তী এলাকার জন্য ১৯২১ খ্রীঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২৩ খ্রীঃ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জন্য নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজের তেলেগু ভাষা-ভাষী অঞ্চলের জন্য অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। মধ্য-ভারত সংযুক্ত প্রদেশে ও গোয়ালিয়রের জন্য আগ্রায় একটি অনুমোদনকারী

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজা স্যার আন্নামালাই চেট্টিয়ারের দানে ১৯২৯ খ্রীঃ মাদ্রাজ প্রদেশের চিদাম্বরামে আবাসিক ও শিক্ষণধর্মী আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ ত্রিবাঙ্কুরের দেশীয় রাজা একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠন ও শিক্ষাদান-সম্পর্কীয় কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। পাটনা, মাদ্রাজ ও বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আইন পাশ হয়। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান। আলোচ্য যুগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ অনুমোদন ও পরীক্ষা-গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হলেও এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষাদান-ব্যবস্থার ব্যাপক আয়োজন হয় এবং এজন্য বহু অধ্যাপক ও লেকচারার নিয়োগ করা হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, স্থাপত্য, প্রাচ্যবিদ্যা ও বাণিজ্য এই আটটি বিভাগ (Faculty) ছিল। সাধারণ শিক্ষার ৫০টি ও বৃত্তিশিক্ষার ১৮টি কলেজে ৩২,৯৯৫ জন ছাত্র ছিল। এছাড়া নিজস্ব বিভাগগুলিতে ২,৩৬২ জন ছাত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্রুত প্রসারের কিছু কুফলও দেখা দিয়েছিল। বহু অবাঞ্ছিত ও অযোগ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভীড় করায় শিক্ষার মানও সর্বত্র সমভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষা বলতে আইনচিকিৎসা, এঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত আর কোন শিক্ষা ছিল না। এর ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রই সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হত। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করে।

বিশ্বভারতী ছাড়াও জাতীয় ভাবধারায় আদর্শপুষ্ট কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে যে আবাসিক ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই বিদ্যালয় ১৯২২ খ্রীঃ ৬ই মে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয়-সাধনের এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই সহশিক্ষামূলক আবাসিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এবং এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে সমবেত হয়। বিশ্বভারতীতে এক-একটি বিভাগে এক-এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, বিদ্যাভবনে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবী, উর্দু, ভারতীয় দর্শন প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা-ভবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। সঙ্গীত-ভবনে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কলা-ভবনে প্রাচীন ভারতীয় অংকন-রীতির শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। এখানকার অংকন-রীতি বিশ্বের কলা-রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। চীনা-ভবনে চীনা ভাষা শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার গ্রন্থাগারটির সংগ্রহ অতি মূল্যবান। শিল্প-ভবনে কুটীর-শিল্পকে উৎসাহিত করবার জন্য এখানে শিল্প-শিক্ষার আয়োজন করা হয়। শ্রীনিকেতন পল্লী-সংস্কার ও পল্লী-পুনর্গঠন কেন্দ্র।

১৯২১ খ্রীঃ খিলাফৎ-আন্দোলনের সময় আলিগড়ে মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে প্রাচীন

আদর্শে মুসলিম যুবকদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য "জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২৫ খ্রীঃ এই প্রতিষ্ঠানটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। সরকারী অনুমোদন ও সাহায্যের প্রত্যাশী না হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি উচ্চ আদর্শ নিয়ে শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও ভূপালের নবাবের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত সাহায্য পেত। এ ছাড়া "হাম দর্দনে জামিয়া" নামে জামিয়া-অনুরাগী এক প্রতিষ্ঠানের সাত হাজার সভ্যের দানে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহ হত। ডাঃ জাকির হোসেন প্রথম থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

॥ ইণ্টার ইউনিভারসিটি বোর্ড ॥

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য স্যাডলার কমিশন একটি আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি (Inter University Board) গঠনের সুপারিশ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ এরূপ একটি সমন্বয়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্কে আলোচনার জন্য গঠিত লিটন কমিটি সুপারিশ করেন, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মানের সামঞ্জস্য বিধান না করতে পারলে বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার অসুবিধা হবে। এই সব সুপারিশের ফলে ১৯২৪ খ্রীঃ সিমলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সর্ব-ভারতীয় বৈঠক বসে এবং "ইণ্টার-ইউনিভারসিটি বোর্ড" স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বোর্ডের সম্মেলন প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন শহরে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বোর্ডের কেন্দ্রীয় দপ্তর বাঙ্গালোরে। বোর্ডের সম্মেলনে প্রতি বছর ভারতের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পর্কীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য গবেষণার ব্যাপক আয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর গবেষণার জন্যও আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্য রিসার্চ স্কলারশিপ ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা, উচ্চতর গবেষণার জন্য ডিগ্রী দেবার ও বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে গবেষণার সুযোগ ছাড়াও স্বাধীনভাবে গবেষণার জন্য পৃথক্ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯১৭ খ্রীঃ প্রাচ্য বিদ্যার গবেষণার জন্য পুণায় ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ঐ বছরই কলিকাতায় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য 'বসু-বিজ্ঞানমন্দির' স্থাপিত হয়। মার্কিন বিদ্যানুরাগী হেনরী ফিলিপসের অর্থানুকূল্যে লর্ড কার্জন পুণায় একটি সর্বভারতীয় কৃষি-গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ ভূমিকম্পের পর এই কেন্দ্রটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত ক'রে ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট নাম দেওয়া হয়। ১৯২১ খ্রীঃ টাটা পরিবারের দানে বাঙ্গালোরে ইনস্টিটিউট অব

সায়েন্স নামক একটি গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এটি বর্তমান ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

এই সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৯২১ খ্রীঃ University Training Corps গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ খ্রীঃ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর বিজ্ঞান (Military Science) শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। সামরিক বিভাগ বিভাগীয় শিক্ষার বাইরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অনুমোদন না করায় এই বিভাগটি উঠে যায়। বর্তমানে সমরবিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছেন।

সামরিক শিক্ষার আয়োজন ছাড়াও ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রশ্নটি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২০ খ্রীঃ থেকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও শরীর-চর্চার ব্যবস্থা হয়। কোথাও কোথাও ইহা ঐচ্ছিকরূপে গৃহীত হয়।

আলোচ্য যুগে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর ক'রে তুলবার জন্য আন্তঃ-কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়ী খেলাধুলা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্ক নিকটতর হয়েছে।

স্যাডলার কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশের ছাড়পত্র লাগবে। মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের হাতে দিতে হবে। কমিশনের মতে আই. এ. ক্লাশে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সত্যিকারের বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাই এজন্য ভিন্নভাবে দু'বছরের শিক্ষার জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোর্ড এই শিক্ষার পরিচালনা করবে। কমিশনের এই সুপারিশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ ক'রে করা হলেও সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের রিপোর্টের পর কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়-আইনের সংস্কার হয়। নতুন যে সব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের আওতা থেকে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে সরিয়ে রাখা হয়। কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে পৃথক্ ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও এই শিক্ষাকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বোর্ডের পরিচালনাধীনে দেওয়া হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বলা হয় পাঁচ বছরের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার পরিচালনের দায়িত্ব বোর্ডের হাতে দেওয়া হবে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়-আইনের পরিবর্তন ক'রে স্থির হয় যোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেই ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হবে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। এ প্রস্তাবকে কার্যকর

করতে গিয়ে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই মাদ্রাজ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রস্তাবকে আর কার্যকর করা হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আশা করেছিলেন, এ ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতি হবে। ভিন্ন বোর্ডের পরিচালনায় মাধ্যমিক শিক্ষার মানও উন্নত হবে। কিন্তু তাঁদের এই আশা পূর্ণ হয়নি। ঢাকা বোর্ডের পরিচালনার ক্রটির জন্য শিক্ষার মানের অবনতি হয় যার ফলে বহু ছাত্র ঢাকা বোর্ডের এলাকা ত্যাগ ক'রে চলে আসতে বাধ্য হয়।

ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে পৃথক্ ক'রে নেওয়ায় ডিগ্রী কলেজগুলিকে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ আই. এ. ক্লাশের ছাত্রদের থেকে যে আয় হত, তা থেকে ডিগ্রী ক্লাশের খরচ আংশিকভাবে নির্বাহ হত। এ ছাড়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলির পক্ষেও সুযোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ করা সম্ভব হয়ে উঠত না। একই কলেজে আই. এ. ও বি. এ. পড়াবার ব্যবস্থা থাকায় উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষার যে সুবিধা উপভোগ করছিল, তা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল।

স্যাডলার কমিশন ডিগ্রীকোর্সকে দীর্ঘতর ক'রে তিন বছরের করতে চেয়েছিলেন বলেই আই. এ. ক্লাশকে পৃথক্ করবার পিছনে যুক্তি ছিল। কিন্তু নানা কারণে সে সময়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত না হওয়ায় আই. এ. ক্লাশকে পৃথক্ ক'রে ভিন্ন কলেজ করবার পিছনে আর যুক্তি রইল না।

ইণ্টারমিডিয়েট ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ভিন্ন বোর্ড গঠন করা হলে বিশ্ববিদ্যালযগুলি একটা বিরাট আয় থেকে বঞ্চিত হবে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। এ সম্ভাবনার কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বুঝতে পেরে প্রাদেশিক রাজকোষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু 'প্রাদেশিক রাজকোষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হবে না জবাব দেওয়ায়' আর্থিক সমস্যার প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। আর্থিক সমস্যার প্রশ্নে ১৯২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বিতর্ক চলতে থাকে। এরপর অন্ধ্র, বম্বে, আন্নামালাই, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাখবার ব্যবস্থা হয়। দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ শিক্ষার ভার বোর্ডের উপর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেও সে প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারে এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়। সংযুক্ত প্রদেশে মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট দুটি বোর্ড গঠিত হয়। কিন্তু এখানেও তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাব ও বিহারে এই প্রস্তাব আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়। এসব প্রদেশের অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় এ পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনা কম। একমাত্র সংযুক্ত প্রদেশে এই পরিকল্পনা কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুপারিশ করা হলেও এখান থেকেই মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড গঠন

সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী আপত্তি করা হয়। স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বাংলায় কোন বোর্ড গঠন করা সম্ভব হয়নি। এই বিতর্ক সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি একটা আপোষমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন, জুনিয়ার ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স স্কুলের সঙ্গে ও সিনিয়র কোর্স ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক। আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে সমিতির এই সুপারিশ কার্যকর করবার কোন প্রচেষ্টা হয়নি। তবে বিতর্কের মীমাংসার জন্য এটিই সকলের গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বলে বিবেচিত হয়েছিল।

।। মাধ্যমিক শিক্ষা ।।

আলোচ্য যুগে মাধ্যমিক শিক্ষায় দ্রুত প্রসার হয়। ১৯২১-২২ খ্রীঃ সারা ভারতে অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭,৫৩০টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১,০৬,৮০৩ জন। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে হয় ১৩,০৫৬টি ও ছাত্রসংখ্যা হয় ২২,৮৭,৮৭২ জন। আলোচ্য যুগে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের অজুহাতে সরকার শিক্ষায় ব্যয়-সংকোচনীতি গ্রহণ করলেও শিক্ষার জন্য সামগ্রিকভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারা ভারতে ১৯২১-২২ খ্রীঃ শিক্ষার জন্য সর্বসাকুল্যে ব্যয় হয় ৪ কোটি ৪৩ টাকা। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ এই জন্য ব্যয় হয় ৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। এই বিরাট বর্ধিত ব্যয়ভার ভারতের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় বহন করেছিল।

এই যুগে উচ্চশিক্ষার জন্য যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যও জনসাধারণের মধ্যেও সেরূপ একটা অভূতপূর্ব আগ্রহের সঞ্চার হয়। ছোট ছোট শহর ও বড় বড় গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ বেড়ে যায়। পূর্বে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য আগ্রহের অভাব দেখা যেত, এই সময়ে সেই মনোভাব দূর হয়ে শিক্ষার জন্য সমাজের সর্বক্ষেত্রে একটা উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এযুগে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং অধিকাংশ স্কুলই বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির ফলে দেশপ্রেমিক সমাজ-সেবীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের উৎসাহ দেখা দেয়, এবং তাঁদের চেষ্টায় সুদূর পল্লী-অঞ্চলে পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লী অঞ্চলে অভিভাবকগণ অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও গ্রামের বাইরে বোর্ডিংয়ে রেখে ছেলে পড়ানোর ব্যয়ভার বহন করতে পারতেন না, পল্লী-অঞ্চলে অধিক সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই অসুবিধা দূর হয়। জনসাধারণ নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের সুযোগ গ্রহণ করায় মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে।

।। মাধ্যমিক শিক্ষায় ভাষা-সমস্যা ।।

শিক্ষার বাহন সম্পর্কিত প্রশ্নটি ভারতের ইতিহাসে বহু-বিতর্কিত প্রশ্ন। মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাই শিক্ষার একমাত্র বাহন হওয়া উচিত, এ অতি প্রাচীন দাবী। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অযৌক্তিক মনোভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ

শতাব্দীর প্রথমে এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকৃতি পায় নি। এরপর ধীরে ধীরে শিক্ষা-বিভাগের কর্তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। দ্বৈত শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এই বিতর্কের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয়নি। কিন্তু আলোচ্য যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই হওয়া উচিত, এ দাবী শুধু নীতিগতভাবেই গৃহীত হয়নি, এ নীতিকে বাস্তবে কার্যকরী করবার সরকারী আদেশও দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার বহু কণ্টকিত ভাষা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এ যুগের একটি বিশিষ্ট অবদান। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার আরও সহজতর হয়। তবে সর্বত্রই সরকারী আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকব করা হয়েছিল, একথা মনে করলে ভুল হবে। উচ্চ-শিক্ষার বাহন ইংরেজীই রয়ে গেল, আর মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে কলেজীয় শিক্ষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, এই অজুহাতে কোন কোন প্রদেশে আরও কিছুদিন ইংরেজীই মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন থেকে যায়। এ ছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় অভিভাবক-দের মধ্যে এক সম্প্রদায় ইংরেজীর প্রতি অতি অনুরক্ত থাকায়, এবং সরকাবী প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাসমূহে ইংরেজী জ্ঞানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীর একাধিপত্য আরও কিছুদিন বজায় ছিল। *

হিন্দী-উর্দুভাষী অঞ্চলে মাতৃভাষা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দেয়। উত্তর প্রদেশের উর্দু হরফ ও দেবনাগরী হরফের মধ্যে কোনটি ব্যবহৃত হবে, এ সমস্যা নিয়ে শিক্ষা-বিভাগ বিব্রত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিভাষাব অভাব প্রথম কিছুদিন অসুবিধার সৃষ্টি করে। তবুও ১৯৩৭ খ্রীঃ পর মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই হওয়া সঙ্গত, এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর দ্বিমত বা বিতর্কের অবকাশ ছিল না। এরপর থেকে উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে কি ক'রে শিক্ষার বাহন করা যায়, সেই সমস্যাই শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

।। **শিক্ষক-সমস্যা** ।।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার স্বীকৃতি, এযুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সঙ্গে এ যুগের ও তৎপরবর্তী যুগের একটি প্রধান ত্রুটির কথা উল্লেখ করা দরকার। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যারূপে দেখা দেয়। উডের ডেসপ্যাচ থেকে শুরু ক'রে যখনই কোন শিক্ষা-কমিশন বা কমিটির রিপোর্ট আমরা আলোচনা করি, তাতে দেখা যায়, সর্বত্রই শিক্ষক-শিক্ষণ দেশের শিক্ষার প্রসার ও মনোন্নয়নের অপরিহার্য অংগ বলে স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য কাগজপত্রে যে পরিমাণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক সরকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশ্নে কার্যক্ষেত্রে সে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেননি। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ সারা ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য মাত্র ১৫টি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪৮৮ জন, এর মধ্যে মহিলা ছিলেন ১৪৭ জন। বাংলা দেশে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের শতকরা হার ছিল ২০.৭ জন।

শিক্ষকদের ট্রেনিং ব্যবস্থার অভাব ছাড়াও তাঁদের চাকরির অবস্থা, বেতনের হার

কোনটাই এমন আকর্ষণযোগ্য ছিল না যাতে যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকতাকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। অতি সামান্য বেতন, চাকরির অনিশ্চয়তা, পেন্সন বা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ব্যবস্থার অভাব—সব কিছু মিলিয়ে শিক্ষকদের অবস্থার একটি শোচনীয় চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির প্রশ্নটি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সে চেতনা শীঘ্রই কর্তৃপক্ষের মনে উদয় হয়। বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু-কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ মধ্যে সর্বত্রই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা হয়, এবং বেতনের একটা হার নির্ধারিত হয়। কিন্তু এতে শিক্ষকদের বিশেষ উপকার হয়নি। বেসরকারী বিদ্যালয়-সমূহের আর্থিক অনটনের জন্য সরকার-নির্ধারিত বেতনের হার অনুযায়ী বেতন শিক্ষকরা পেতেন না।

বাংলাদেশে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধির জন্য ১৯২৫-২৬ খ্রীঃ বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯২৭ খ্রীঃ সমগ্র প্রদেশে শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সমস্ত অনুমোদিত বিদ্যালয়কে বিশ্ব-বিদ্যালয় রচিত স্কুল কোড মেনে চলতে হত। পরিচালক সমিতির স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করবার জন্য 'আরবিট্রেশন বোর্ড' গঠিত হয়। শিক্ষকগণ তাঁদের কোন অভিযোগ থাকলে এখানে আবেদন করতে পারতেন। বহু সময়ই বেসরকারী স্কুলের পরিচালকবর্গ বিদ্যালয়ের সঠিক অবস্থা গোপন রাখতেন, অর্থনৈতিক অনটনই ছিল এর প্রধান কারণ।

মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সমস্যা শুধু শিক্ষা নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও জটিলতার সৃষ্টি করে। বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ও দেশে শিল্পের বিশেষ প্রসার না হওয়ায় সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের সামনে জীবিকা-অর্জনের অতি অল্প সুযোগই খোলা ছিল। সদাগরী অফিসে ও সরকারী চাকরির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অতি অল্প লোকের চাকরির সংস্থান হত। শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে সংযুক্ত প্রদেশের সরকার এক কমিটি নিয়োগ করে। দেশে বৃত্তি-শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন, ভারত সরকার তা উপলব্ধি ক'রে মিঃ উড ও মিঃ এবট্‌কে এসম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে। বৃত্তিশিক্ষার জন্য মিঃ এবট্‌ যে সব সুচিন্তিত সুপারিশ করেছিলেন, তার অধিকাংশই কার্যকর করা হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী ক'রে সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন করবার জন্য আমাদের আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে।

।। প্রাথমিক শিক্ষা ।।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ইংরেজ সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের কথা আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। মহামতি গোপালকৃষ্ণ

গোখলের প্রচেষ্টায় জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি গণশিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বম্বেপ্রদেশে পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায় ১৯১৮ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হয়। দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীরা বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯২০ খ্রীঃ থেকে ১৯৩০ খ্রীঃ মধ্যে ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা-আইন পাস হয়। বাংলার প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা-আইন পাস হয় ১৯১৯ খ্রীঃ।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা-আইনগুলি মোটামুটি প্রায় একই রকমের। আইনের বলে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণশিক্ষার প্রসারের অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিজ নিজ এলাকায় উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হয়।

সব প্রদেশেই আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা কোন এলাকায় বাধ্যতামূলক করা হবে কি না, তা স্থির করবার ভারও এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হয়। বঙ্গে প্রদেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারবেন বলে স্থির হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য সব প্রদেশেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাকর-ধার্যের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার কাজে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছয় থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার ব্যবস্থা হয়। পাঞ্জাব প্রদেশে বয়সেব সীমা সাত থেকে এগার বছর স্থির হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার
১৯২১—১৯৩৭

	১৯২১-২২	১৯২৬-২৭	১৯৩১-৩২	১৯৩৬-৩৭
অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫,০১৭	১৮৪,৮২৯	১৯৬,৭০৮	১৯২,২৪৪
প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যা	৬,১০৯,৭৫২	৮,০১৭,৯২৩	৯,১৬২,৪৫০	১০,২২৪,২৮৮
	টাকা	টাকা		
প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ ব্যয়	৪,৯৬,৬৯,০৮০	৬,৭৫,১৪,৮০২	৭,৮৭,৯৫,২৩৬	৮,১৩,৩৮,০১৫

*History of Education in India By Syed Nurullah J. P. Naik

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বৈতনিক বা অবৈতনিক দুই-ই হতে পারত।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আলোচ্য যুগে কিভাবে হয়েছিল, পূর্ব পৃষ্ঠার তালিকাটি দেখলেই তা বোঝা যাবে।

উক্ত তালিকা থেকে দেখা যায়, ১৯২১-৩১ খ্রীঃ মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে হারে প্রসার হয়েছে, ১৯৩১-৩৭ খ্রীঃ মধ্যে শিক্ষার প্রসার সে ভাবে হয়নি। দ্বৈত শাসনের প্রথম অবস্থায় দেশীয় মন্ত্রীদের চেষ্টায় সরকারী অর্থ ও শক্তি প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারে যতটা ব্যয়িত হয়েছিল, পরবর্তী পাঁচ বছরে দেশের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য সরকারী তহবিল থেকে সে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়নি। ১৯৩৭ খ্রীঃ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হার্টগ কমিটির রিপোর্ট সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই রিপোর্টের ফলে সরকার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংগঠন ও মান-উন্নয়নের দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়। জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মানোন্নয়নের অজুহাতে শিক্ষা-রোধের নীতিকে মেনে নিতে পারেনি। আলোচ্য যুগে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে বেসরকারী অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাধ্যমিক শিক্ষার মত প্রাথমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ বহনের দায়িত্ব জনসাধারণ গ্রহণ করেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য আইন পাস হলেও এক পাঞ্জাব ব্যতীত কোন প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রশ্নে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। নীচের তালিকা দেখলেই ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা কোন্ প্রদেশে কতটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তা বোঝা যাবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩৬-৩৭)

প্রদেশ	শহর অঞ্চল	পল্লী-অঞ্চল	পল্লী-অঞ্চলে গ্রামের সংখ্যা
মাদ্রাজ	২৭	৭	১০৪
বম্বে	৯	১	১৪৩
বাংলা	১	×	×
ইউ. পি.	৩৬	২৫	১২২৪
পাঞ্জাব	৬৩	২৯৮১	১০,৪৫০
বিহার	১	১	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৭	৮	৫০৮
সিন্ধু	১	১	১১৩
উড়িষ্যা	১	১	১৪
দিল্লী	১	৯	১৫
মোট	১৬৭	৩০৩৪	১২,৫৭২

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩১-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ)

ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩,০৭২টি গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়। এর মধ্যে এক পাঞ্জাব প্রদেশেই ১০,৪৫০টি গ্রামে এব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। অন্যান্য প্রদেশে যে হারে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছিল, সেভাবে কাজ হলে পাঁচশ বছরেও এদেশ থেকে অশিক্ষার অভিশাপ দূর করা যেতনা। বম্বে প্রদেশে ১৯২৩ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা-আইনে দশ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। কিন্তু আইন পাস হবার ১৪ বছর পরে ১৯৩৭ খ্রীঃ মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩% ভাগকে বাধ্যতামূলক আইনের আওতায় আনা হয়।

আপাতঃদৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করছে মনে হলেও এ বিশাল দেশের বিরাট জনসংখ্যার কথা বিচার করলে এই সংখ্যা অতি নগণ্য বলেই স্বীকার করতে হবে। তারপর স্কুলগুলির সংগঠনের দিক্ মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষকদের অতি সামান্য বেতন, এক-শিক্ষক বিদ্যালয় ব্যবস্থা, পরিদর্শকের সংখ্যাল্পতা, উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাব—সব মিলিয়ে ১৯৩৭ খ্রীঃ সারা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক যে চিত্রটি আমরা পাই, তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

ব্রিটিশ ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—১৯২১-৩৭

	শহরাঞ্চল	পল্লী-অঞ্চল
১৯২১-২২	৮	×
১৯২৬-২৭	১১৪	১,৫৭১
১৯৩১-৩২	১৫৩	৩,৩৯২
১৯৩৬-৩৭	১৬৭	৩,০৩৪

*K. G. Saiyidain, Compulsory Education in India, Paris, UNESCO, 1952.

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন

বাংলা দেশে ১৯১৯ খ্রীঃ প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা-আইন পাস হয়। এই আইনে শহরের প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯২১ খ্রীঃ স্বায়ত্ত শাসন আইন সংস্কারের পর এই প্রাথমিক শিক্ষা-আইন সংশোধন ক'রে গ্রামাঞ্চলেও প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা-আইন চালু হবার এক বছরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা-সম্পর্কীয় নিম্ন তথ্য-সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ৬-১০ বছরের শিশুর সংখ্যা; বর্তমান স্কুল-গৃহে কত ছাত্রের স্থান সংকুলান হয়; ছাত্রদের উপস্থিতি কিরূপ ও শিক্ষকদের মোট সংখ্যা।

যদি ৬-১০ বছরের সমস্ত শিশুর শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে কতটা স্থান, কতজন শিক্ষক ও অন্যান্য কি কি উপকরণের প্রয়োজন হবে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কি ব্যয় হয় এবং নতুন পরিকল্পনায় ব্যয় কি পরিমাণ বেড়ে যাবে বলে অনুমান হয়।

স্কুলের বর্তমান আয় ও শিক্ষাকর ধার্য হলে সেখান থেকে কি আয় হতে পারে।

সরকার থেকে কি পরিমাণ অর্থসাহায্য পেলে নিজস্ব সমগ্র এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

কোন মিউনিসিপ্যাল এলাকার কমিশনারগণ যদি মনে করেন, তাঁদের এলাকায় ৬-১০ বছর বয়সের বালকদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন, তাহলে তাঁরা সেজন্য সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করতে পারেন। সরকার থেকে অনুমতি পেলেই যে-কোন এলাকায় ৬-১০ বছরের বালকদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে।

কমিশনারগণ একটি স্কুল কমিটি গঠন করবেন এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করবেন।

বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে না। তবে শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক করা হবে, সেখানে অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা বিচার ক'রে বেতন মকুব করা হবে।

যদি মিউনিসিপ্যালটির আয় ও সরকারী সাহায্যেও শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ না হয়, তাহলে সরকার থেকে অনুমতি নিয়ে শিক্ষাকর ধার্য করা চলবে। স্থির হয়, শিক্ষাকর কি ভাবে ধার্য হবে, সে সম্পর্কে সরকার আইন প্রণয়ন করবে।

১৯২০ খ্রীঃ আগস্ট মাসে বাংলা সরকার মিঃ ইভান, ই, বিস নামক একজন কর্মচারীকে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা-রচনার কাজে নিয়োগ করেন। ১৯২০ খ্রীঃ ও ১৯২২ খ্রীঃ তিনি দু'টি রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন, বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি নগণ্য। মাদ্রাজে এরূপ সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট সংখ্যার ২৬·৯%, বম্বে প্রদেশে ৮০·৭%, আর বাংলায় মাত্র ৬·৯%। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য কতগুলি সুপারিশ করেন। তিনি বলেন—

বর্তমানে কোন কোন অঞ্চলে পাশাপাশি স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে, আবার কোথাও কোন স্কুল নেই। এই অবস্থা দূর করতে হলে বসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রতি ½ মাইল ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের কেন্দ্রে একটি ক'রে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যে সব জায়গায় স্কুলের আয় থেকে শিক্ষকের বেতন বা অন্যান্য খরচ চলতে পারে, সেই অঞ্চলেই একাধিক স্কুল রয়েছে। জনবসতিবিরল অঞ্চলে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। যদি প্রতি অর্ধমাইল ব্যাসার্ধের কেন্দ্রে একটি ক'রে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে একই জায়গায় দু'টি স্কুলের মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকবে না। জনসংখ্যার অনুপাতে ৫০ থেকে ৩০০ জন ছাত্রের উপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের বিদ্যালয়ে শিক্ষা-গ্রহণের অধিকার থাকবে। বিদ্যালয়গুলিকে জনপ্রিয়

করবার জন্য স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। মুসলমান ছেলেদের জন্য পবিত্র কোরান থেকে প্রার্থনা-শিক্ষার ব্যবস্থা ও হিন্দুদের জন্য রামায়ণ-মহাভারত থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। যদি জনসাধারণ দাবী করে, তাহলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির জন্য বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনায় মিঃ বিস মন্তব্য করেন, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অতি অল্প, তার মধ্যে অন্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষার ব্যয় সবচেয়ে কম। বাংলাদেশে একটি ছেলের শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় প্রতি বছর ৩·৫ টাকা আর বম্বে প্রদেশে সেখানে ব্যয় হয় ১৫ টাকা। অথচ বাংলা দেশেই ছাত্রদের গড় বেতনের হার সর্বাধিক। এখানে বছরে ছাত্র-প্রতি গড় বেতনের হার ১·৬৯ পয়সা, বিহার ও উড়িষ্যায় বেতনের হার এর অর্ধেকের কম। ছাত্র-পিছু সরকারী ব্যয়ের হারও বাংলাদেশে ছিল সব চেয়ে কম। ছাত্র-পিছু বাংলা দেশে গড়ে ০·২৯ টাকা খরচ হত, বম্বে প্রদেশে খরচ হত ·২৬৫ টাকা। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের বেশীর ভাগই বহন করত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ।

মিঃ বিস হিসেব ক'রে বলেছিলেন, কলিকাতা বাদে সারা বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক ব্যয় হবে ১,৭৩,০৬,২০৫ টাকা। এরপর প্রতি বছর ব্যয় হবে ১,৭৬,৭৯-০৫১ টাকা। অর্থাৎ কলিকাতা বাদে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাৎসরিক দুই কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল।

বাংলা সরকার মিঃ বিসের পরিকল্পনা আংশিকভাবে গ্রহণ করে। বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই সরকারী উদ্যোগে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতি বছর প্রায় ষাট হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কুড়িলক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৫৪ জনই ছিল মুসলমান, আর সব সম্প্রদায় মিলিয়ে ছিল শতকরা ৪৬ জন। প্রতি দুই বর্গমাইলের মধ্যে একটি ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কয়েক বছর ধরে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৮৪,০০,০০০ টাকা ব্যয় হতে থাকে। এর মধ্যে সরকারী তহবিল থেকে ২৬,০০,০০০ টাকা, স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮,০০,০০০ টাকা ব্যয় হত। বাদবাকী টাকা ছাত্রদের বেতন ও সাধারণের দান থেকে সংগ্রহ করা হত।

শিক্ষা-প্রসারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যখন মোট ছাত্রসংখ্যার দিকে তাকাই, তখন মনে হয়, দেশে সত্যি বুঝি শিক্ষার দ্রুত প্রসার হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত দেশের লোকসংখ্যার শতকরা আনুপাতিক হার বিচার করলে সাক্ষরতার যে চিত্রটি পাই, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এখানে বদ্ধতা (Stagnation) ও অপচয়ের (Wastage) জন্য শক্তি ও অর্থের বিরাট অপব্যয় হচ্ছে। নীচু শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা প্রচুর হলেও শেষ পর্যন্ত সামান্যই শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে। ফলে, সাক্ষরদের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। অনুসন্ধান ক'রে দেখা গিয়েছে, শিশুশ্রেণীর প্রতি ১০০টি ছেলের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে মাত্র ৩০ জন টিকে থাকে।

এভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৫ জন, এবং চতুর্থ শ্রেণীতে মাত্র ৩ জন গিয়ে পৌছায়। প্রাথমিক শিক্ষা বলতে সাধারণ লোক বুঝত দু'এক বছর ছেলেকে পাঠশালায় পড়ালেই ছেলে যথেষ্ট বিদ্বান হয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের কারণ ও অপচয়-রোধের উপায় সম্পর্কে হার্টগ কমিটির রিপোর্ট বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। গণ-শিক্ষার প্রশ্নে সরকার সচেতন থাকলে বিভিন্ন সময় এ সম্পর্কে যে-সব সুপারিশ করা হয়েছে, তা কার্যকর ক'রে দেশকে বহু পূর্বেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারা যেত।

বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা-আইন (১৯৩০ খ্রীঃ)

১৯১৯ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা-আইনের ত্রুটি দূর করবার জন্য এবং শিক্ষকের অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৩০ খ্রীঃ বাংলার পল্লী-অঞ্চলের জন্য গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা-আইন বিধি-বদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যে বেতন পেতেন, তা দিয়ে দু'বেলা অন্নের সংস্থান করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকগণ বেতন পেতেন মাসিক ৬ টাকা, সাহায্যবিহীন স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের কোন স্থিরতা ছিল না। জানা গিয়েছে, চট্টগ্রাম জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকরা পেতেন মাসিক ৩'৩ টাকা। নতুন আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্রতি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া ও ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা যাতে সম্ভব হয়, সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা'।

১৯৩০ খ্রীঃ গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা-আইন কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাংলার মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে সর্বত্র প্রযোজ্য হবে বলে স্থির হয়। পল্লী বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই আইন কার্যকর হলে বাংলা দেশের পল্লী-অঞ্চলের ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের সব ছেলে-মেয়ে এই আইনের আওতায় আসবে বলে স্থির হয়।

এতদিন জেলা বোর্ডের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। নতুন আইনে "জেলা স্কুল বোর্ড" গঠন ক'রে সেই স্কুল বোর্ডের উপর শিক্ষা-বিস্তারের ভার দেওয়া হল। জেলা বোর্ডের এলাকাধীন সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন, আর্থিক সাহায্য, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, বেতন নির্ধারণ, শিক্ষকদের শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অ্যানুইটি ফাণ্ড গঠন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের পরিচালনার দায়িত্ব জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে থাকবে।

জেলা স্কুল বোর্ড গঠনের পর প্রথম আট বছর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বোর্ডের সভাপতি হবেন। এর পর থেকে সদস্যগণ তাঁদের সভাপতি নির্বাচিত করবেন। বোর্ডে মহকুমা অধিপতি, স্কুলসমূহের জেলা পরিদর্শক, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস

চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সভ্য হবেন। এ ছাড়া, জেলা বোর্ডের সভ্যগণ প্রতি মহকুমা থেকে একজন ক'রে সভ্য নির্বাচন করবেন, এদের সংখ্যা দু'জনের কম হবে না। প্রতি মহকুমা থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের নির্বাচিত সদস্য থাকবেন একজন। প্রথম চার বছর সরকার থেকে একজন শিক্ষককে মনোনীত করা হবে। প্রতি মহকুমা থেকে একজন ক'রে বেসরকারী সদস্য মনোনীত করা হবে—এদের সংখ্যাও মোট দু'জনের কম হবে না।

জেলা স্কুল বোর্ড নিজ এলাকার জন্য শিক্ষা-প্রসারের পরিকল্পনা রচনা করবে। ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য, স্কলারশিপের (Stipends and Scholarships) ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা এ্যান্যুয়িটির ব্যবস্থা করবে।

সরকারী নির্দেশ বলে প্রয়োজন হ'লে জেলা স্কুল বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা, পরিদর্শন, গৃহনির্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে হস্তান্তর করতে পারবে।

শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহের জন্য জেলা বোর্ড শিক্ষা-কর ধার্য করতে পারবে। রাজস্বের প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা ক'রে কর ধার্য হ'বে। এর মধ্যে কৃষক দেবে সাড়ে তিন পয়সা, জমিদারকে দিতে হ'বে দেড় পয়সা। এ ছাড়া, অন্য স্তরের বৃত্তিজীবীদের শিক্ষা-করের হার নির্ণয়ের ভার জেলা-শাসকের উপর দেওয়া হয়।

সরকার থেকে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২৩,৫০,০০০ টাকা দেওয়া হ'বে। শিক্ষক-শিক্ষণের সমগ্র ব্যয়ভার প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে বহন করা হ'বে। পরিদর্শন-ব্যবস্থার ব্যয়ভারও সরকারী তহবিল থেকেই বহন করা হবে।

জেলা স্কুল বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্রাদেশিক সরকার যে-কোন অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করতে পারবেন। কোন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা-বাধ্যতামূলক হ'লে তা অবৈতনিক করা হ'বে। কোন ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-গ্রহণের দায় থেকে শুধুমাত্র জেলাবোর্ডই অব্যহতি দিতে পারবে।

যদি সম্ভব হয়, স্কুল-পাঠ্যের সঙ্গে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলবে।

প্রাদেশিক সরকারকে জেলা স্কুল বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ, ইউনিয়ন বোর্ডকে ক্ষমতা হস্তান্তর, প্রয়োজন হ'লে স্কুল বোর্ডকে বাতিল করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, পাঠক্রম নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি (Central Primary Education Committee) গঠিত হ'বে। শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা (D. P. I.), প্রতি ডিভিসন থেকে দু'জন ক'রে জেলা-স্কুল বোর্ড নির্বাচিত সদস্য (একজন হিন্দু, অপর জন মুসলমান), সরকার-মনোনীত পাঁচজন সদস্য (এর মধ্যে দু'জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি) নিয়ে কমিটি গঠিত হবে।

এই আইন পাস হবার পর ধীরে-ধীরে বাংলা দেশে বহু জেলায় "স্কুল বোর্ড" গঠিত হ'ল। কয়েকটি জেলায় শিক্ষাকর ধার্য হ'ল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ট্রেনিং-এর কিছু ব্যবস্থা হ'ল। এত আয়োজন সত্ত্বেও কার্যত: প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হয়নি।

কিছুদিনের মধ্যেই আইনের ত্রুটিগুলি দেখা দিয়েছিল। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ছিল মোট পাঁচ বছরের, নতুন আইনে তা কমিয়ে চার বছর করা হ'ল। অথচ এই পাঠক্রম চার বছরে শেষ করা যায় না, এজন্য অন্ততঃ পাঁচ বছর সময় দরকার। স্কুল বোর্ডগুলিতে স্থানীয় রাজনীতি আর সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ ক'রে সেখানকার কাজে জটিলতার সৃষ্টি করল। শিক্ষক-নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা সর্বাধিক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল। মুসলিম সম্প্রদায় থেকে সর্বত্র উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না, তবু অযোগ্য লোকই নেওয়া হতে লাগল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কিছুটা ব্যাহত হ'ল। রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক কলহ, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি বহু বিঘ্নের মধ্য দিয়ে ও জনসাধারণের উৎসাহে ও আগ্রহে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার কতটা প্রসার হয়েছিল, তার পরিচয় নীচের পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যাবে।

	১৯২১-২২ খ্রীঃ	১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ
প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংখ্যা	১,৬০,০২৭	১,৯৭,২২৬
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা	৬৩,১০,৫৪১	১,০৫,৪১,,৭৯০

১৯৩০ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা-আইনের একটা বড় কথা ছিল ১০ বছরের মধ্যে সারা বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। কার্যতঃ দেখা গেল, কলিকাতা কর্পোরেশনের সামান্য অংশে এবং চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকা ভিন্ন অন্য কোন শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নি। পল্লী-অঞ্চলের মধ্যে শুধু মাত্র মৈমনসিং জেলার কুলিয়াচর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার ব্যাপারে বাংলা সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বাংলাদেশ বহু প্রদেশ থেকেই পশ্চাৎপদ ছিল।

১৯৩৫ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্কার

১৯৩৫ খ্রীঃ বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী স্যার আজিজুল হক আইন-সভায় শিক্ষা পুনর্গঠনের এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য নিম্ন সুপারিশগুলি করা হয়েছিল :—

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রে চার বছরে এই স্তরের পাঠ শেষ করবে। কেউ এক শ্রেণীতে দু'বছরের বেশী পড়তে পারবে না।

২। পাঠক্রম গ্রাম্য পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠশালা ও মক্তব দু'য়ের উপযোগী ক'রে রচিত হবে। হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে বেশী-সংখ্যক ছাত্র মুসলমান, সেই বিদ্যালয় মক্তব বলে গণ্য হবে। লেখাপড়া, অংক, স্বাস্থ্যনীতি, স্থানীয় ভূগোল ও গ্রাম্য সংগঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ানো হবে।

৩। দরিদ্র ছাত্রদের কোন বেতন লাগবে না।

৪। লোকসংখ্যার অনুপাতে সারা বাংলা দেশকে ১৬,০০০ বিদ্যালয়-বিভাগে ভাগ ক'রে প্রতি বিভাগের কেন্দ্রস্থলে একটি ক'রে চার-শ্রেণীযুক্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা হবে ২০ জন। অন্যান্য শ্রেণীতে ৩০ জন ক'রে ছাত্র থাকবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার সুবিধার জন্য প্রতি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দু'টি করে 'পোষক' বিদ্যালয় থাকবে। দুই-শ্রেণী সমন্বিত এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ৩০ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্র থাকবে।

৫। এক-একটি অঞ্চলে সব স্কুল মিলিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ৯০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬০ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩০ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩০ জন ছাত্র থাকবে। এইভাবে সারা বাংলায় এক সঙ্গে ৩৩,৬০,০০০ জন ছাত্র পড়বার সুযোগ পাবে।

৬। ১৬,০০০ স্কুলের জন্য ৬৪ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। শিক্ষকরা দিনে দু'বার কাজ ক'রে গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে পারবেন। প্রতিটি শিক্ষক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে দিনে চার ঘণ্টা এবং 'পোষক' বিদ্যালয়ে দিনে দু'ঘণ্টা কাজ করবেন। প্রধান শিক্ষক মাসিক বেতন পাবেন ২০ টাকা, সহকারী শিক্ষকরা মাসিক ১৫ টাকা। শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের শিবির-শিক্ষণ ব্যবস্থা করা হবে।

৭। ছাত্রীসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে সহ-শিক্ষার পরিবর্তে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বালিকাদের কখনই সহ-শিক্ষায় বাধ্য করা হবে না।

৮। এই পদ্ধতিতে স্থাপিত প্রতি ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভাগের জন্য একটি করে মধ্য-ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন করতে হবে। প্রথমে ৬৪০টি এরূপ স্কুল স্থাপন করা হবে। পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৩২০০ স্কুল স্থাপিত করা হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ-প্রার্থী ছাত্রদের জন্য মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি, গ্রাম বিজ্ঞান এবং ইংরেজী বৈকল্পিক পাঠ্যরূপে পড়ানো হবে।

৯। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলের উপর বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

১০। প্রতি একশ বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন সাব ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হবে, এবং এঁদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মধ্য হতে নিযুক্ত করা হবে। গ্রামবাসীদের পল্লী-উন্নয়ন কার্যেও এঁরা সাহায্য করবেন।

১১। পড়ায় উৎসাহ দেবার জন্য গ্রামীণ লাইব্রেরী হল স্থাপন করবার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রতি শিক্ষকের একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার সুপারিশ থাকায় এবং জনসাধারণের বিরোধিতার ফলে সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

।। মিশনারী প্রচেষ্টা ।।

মিশনারীগণ অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছিল, একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ফ্রেশার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মিশনারীদের উদ্যোগে কয়েকটি সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র ও শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু অর্থাভাবে এদিকের কাজ খুব ভালভাবে অগ্রসর হয়নি। এছাড়া, মিশনারীদের মধ্যে একদল অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিম্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা হলে খ্রীস্টান সমাজের নীতিগত ও ধর্মগত মানের অবনতি ঘটবে। এই বিতর্কের অবসানের জন্য ১৯২৮ খ্রীঃ আমেরিকান এপিস কোপাল চার্চের (Episcopal Church) কার্যাধ্যক্ষ ডাঃ জে. এম. পিকেট-এর নেতৃত্বে এক কমিশন গঠিত হয়। কমিশন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও খ্রীস্টধর্ম প্রসার-প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করেন। ফলে, মিশনারীরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের দিকে মিশনারীরা বিশেষ মনোযোগী হন। পাঞ্জাবে মোগা, দক্ষিণ ভারতে দেবনাকল, ত্রিবাঙ্কুরে মার্তনডাম, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে মোদক, বম্বের অংক্লেশ্বর, এলাহাবাদে কৃষি-কলেজ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র।

উচ্চশিক্ষার দিকেও মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ১৯২৯ খ্রীঃ আগ্রায় মিশনারী ও ভারতীয় খ্রীস্টানদের এক সম্মেলনে মিশনারী কলেজসমূহের মধ্যে শিক্ষার সমন্বয় সাধনের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজের "মাস্টার" ডাঃ এ. ডি. লিণ্ডসের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন মিশনারী কলেজগুলি দেখে খুশী হতে পারেন নি। রিপোর্টে বলা হয়, মিশনারী-পরিচালিত কলেজগুলিতে খ্রীস্টধর্মের পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। কলেজে খ্রীস্টান অধ্যাপক ও ছাত্রসংখ্যা অতি অল্প। এছাড়া, কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত বিদ্যানুরাগের অভাব রয়েছে। কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষায় কোথাও জীবনের প্রকৃত শিক্ষা-গ্রহণের উৎসাহ দেখা যায় না। কমিশন খ্রীস্টান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেননি। কমিশন গবেষণার কাজ, ধর্মশিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ ও স্বাস্থ্যকর নীতিসম্মত জীবন যাতে শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা-গ্রহণের পরামর্শ দেন।

আলোচ্য যুগে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা-প্রচেষ্টা মিশনারীদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া, গ্রাম্য শিক্ষার গবেষণার জন্যও তাঁরা প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করেছেন।

ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক মিশনারীরা। আধুনিক যুগের শুরু থেকে মিশনারীরা যে শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, আজও তা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে, আমরা শিক্ষার দিক্ থেকে মিশনারীদের কাছে বহুভাবে

ঋণী। ধর্মপ্রচারের অতি উৎসাহের ফলে স্থানে স্থানে বিভ্রাট সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু সেই সাময়িক ও স্থানীয় জটিলতার ঊর্ধ্বে তাঁদের নিরলস শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টার ফলে আজও ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মিশনারী প্রচেষ্টারই শুভ ফল। মিশনারীরা তাঁদের কার্যক্ষেত্র পরিবর্তিত করেছেন। তবুও দেখা যায়, ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ মিশনারী পরিচালনায় সারা ভারতে ১৪,৩৪১টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১,১৮,২০০ জন; এর জন্য ব্যয় হত মোট ৩,৮২,০১, ২৪১ টাকা।

।। বয়স্কদের শিক্ষা ।।

বয়স্কদের জন্য শিক্ষা-প্রচেষ্টা অতি আধুনিক কালের ঘটনা। ১৯২০ খ্রীঃ পূর্বে এ দিকে সরকার থেকে কিছু করা হয় নি। দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা চালু হবার পর সর্বপ্রথম বয়স্কদের শিক্ষাদান সম্পর্কে সরকারীভাবে ব্যবস্থা-গ্রহণের তৎপরতা দেখা যায়। দেশীয় মন্ত্রিগণ বিভিন্ন প্রদেশে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ পাঞ্জাবে বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে গ্রাম-সংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বয়স্কদের শিক্ষাব পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বিহারে ১৯২৮ খ্রীঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন শুরু হয়। সংযুক্ত প্রদেশে ১৯৩০ খ্রীঃ বয়স্কদেব শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়, আট বছরের মধ্যে এখানে পুরুষদের জন্য ৪০০টি ও মেয়েদের জন্য ৬২টি স্কুল খোলা হয়। সবকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও বেসরকারী জনসেবা প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষা-প্রসারের সচেষ্ট হয়েছিল। মিশনারীরাও এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

১৯২৭ খ্রীঃ সারা ভারতে ১১,২০৫টি প্রাপ্ত বয়স্কদের বিদ্যালয়ে ২,৯০,৩৫২ জন শিক্ষার্থী ছিল। পরবর্তী দশ বছরে অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বহু নাইট স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষার স্বতন্ত্র ক্লাস বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য মাত্র ২,০২৭টি বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৩,৬৩৭ জন। সংখ্যার বিচারে বয়স্ক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার না হলেও নীতিগতভাবে বয়স্ক শিক্ষার প্রশ্ন সরকারী স্বীকৃতি লাভ করায় প্রাথমিক কাজ যতটুকু এগিয়ে ছিল, পরবর্তী কালে তার ফলেই কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বয়স্ক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা-গ্রহণে সুবিধা হয়েছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের যুগ

(১৯৩৭—৪৭ খ্রীঃ)

ভাবতশাসন আইনে শিক্ষাব দাযিত্ব
বুনিয়াদী শিক্ষা
(ওয়ার্ধা পবিকল্পনা)
খেব কমিটির বিপোর্ট
সার্জেন্ট রিপোর্ট
সমালোচনা

শিক্ষা-প্রসার ও শিক্ষা-সমস্যা (১৯৩৭—৪৭)
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা
মাধ্যমিক শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষা
নাবী-শিক্ষা
বযস্কদের শিক্ষা

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত-শাসন আইনের বলে ১৯৩৭ খ্রীঃ ভারতের এগারটি প্রদেশে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। দ্বৈত শাসনের অবসানে প্রতি প্রদেশে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা হয়। নতুন শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রীরা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হন। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের অবসান হওয়ায় শিক্ষায় ব্যয়-সংকোচের নীতির কিছু পরিবর্তন হয়। ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়ার ফলে একটি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলবার পথ সুগম হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের স্বল্পকালীন শাসনকালের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে আলোচ্য যুগে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ভারতের জনমতকে উপেক্ষা ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করায় বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির আশানুরূপ প্রসার না হলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের যুগেই এই শিক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, বাংলার মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সব মিলিয়ে এই যুগকে বিক্ষোভ-বিক্ষুব্ধ যুগ বলা যায়। এই যুগের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়েই জাতীয় জীবনে আসে বন্ধন-মুক্তি। পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত নতুন ভারতের জয়যাত্রা শুরু হবার পূর্বে স্বায়ত্ত শাসনের যুগে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ইংরেজ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিভেদ-বিতর্কে রাজনৈতিক জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল, এই যুগে সেই পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়নি। শিক্ষায় সরকারী উৎসাহে ভাটা

পড়লেও রাজনৈতিক আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি থাকা সত্বেও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার জন্য আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছিল। জনসাধারণের উৎসাহ ও আগ্রহের ফলে এই যুগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। কংগ্রেস সরকার প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনার জন্য নিযুক্ত সার্জেন্ট কমিশনের রিপোর্ট এই যুগের শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় অবদান।

।। ভারত শাসন-আইনে শিক্ষার দায়িত্ব ।।

দ্বৈত শাসনকালে শিক্ষার দায়িত্ব কিছুটা কেন্দ্রীয়, কিছুটা রক্ষিত, কিছুটা হস্তান্তরিত —এইভাবে ত্রিধা বিভক্ত ক'রে প্রশাসনিক দিক্ থেকে এক জটিলতার সৃষ্টি করা হয়। বাংলা প্রবাদ-বাক্যের 'ভাগের মা'-এর অবস্থা হওয়ায় শিক্ষার নীতি-নির্ধারণ ও পরিচালনায় নানা অসুবিধা দেখা দেয়। দ্বৈত শাসনের পূর্ব যুগে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করত। দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চলের শিক্ষার জন্যই শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় করতে থাকে। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অর্থসাহায্যের অভাবের ফল যে ভাল হয়নি, হার্টগ কমিটির রিপোর্টে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে :—

"We are of the opinion that the divorce of the Government of India from education has been unfortunate, and holding as we do, that education is essentially a national service, we are of the opinion that steps should be taken to consider a new the relation of the central with this subject."

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারতশাসন-আইনে প্রাদেশিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আর হস্তান্তরিত বলে কোন ভেদ রইল না। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা নিজ নিজ প্রাদেশের শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করল।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এছাড়া ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম ও এই জাতীয় অন্যান্য কেন্দ্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। সামরিক বিভাগের শিক্ষা, আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধসমূহের সংরক্ষণ, প্রাচীন নথিপত্র, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের শিক্ষা।

কেন্দ্রীয় সরকারে অধীনস্থ বিষয়গুলি ছাড়া শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্য সব বিষয়ের ভার প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করল। য়ুরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংরক্ষিত বিভাগের অধীন রইল না। ভারতশাসন-আইন প্রবর্তিত হবার পর

প্রাদেশিক মন্ত্রীরা শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল শাসিত প্রদেশসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্কদের শিক্ষা ও হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির (C. A. B. E.) সুপারিশে **কেন্দ্রে ১৯৪৫ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর "শিক্ষা" একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়।** দেশের স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বুনয়াদী শিক্ষা

॥ ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ॥

ভারতশাসন-আইন (১৯৩৫) প্রবর্তিত হবার ফলে ১৯৩৭ খ্রীঃ ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার পূর্বে কংগ্রেস ক্রমাগত দাবী ক'রে এসেছে দেশে সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে এই দাবীকে বাস্তবে রূপ দেবার দায়িত্ব তাঁদের গ্রহণ করতে হ'ল। কিন্তু সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে সে পরিমাণ অর্থ ছিল না। কংগ্রেসের আর একটি সদিচ্ছা ছিল মদ্যপান নিবারণ করা। মদ্যপান-নিরোধ আইন করা হ'লে আবগারী বিভাগ থেকে প্রাদেশিক সরকার যে রাজস্ব পেত, তা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। মদ্যপান-নিরোধ, না হয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, এ দু'য়ের একটি বেছে নিয়ে অপরটি ত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সামনে দেখা দিল বিরাট সমস্যা। আদর্শের দিক্ থেকে কোনটিকেই বাদ দেওয়া যায় না, অথচ বাস্তব অবস্থা বাধ্য করছে একটিকে বাদ দিতে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন এই জটিল অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না, তখন মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব জাতীয় শিক্ষা-পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে। ১৯৩৭ খ্রীঃ হরিজন পত্রিকায় তিনি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষাকে অর্থের অভাবে পিছিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক ও স্বনির্ভর।

॥ গান্ধীজির নতুন শিক্ষাদর্শ ॥

গান্ধীজি তাঁর নতুন শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে বলেন—বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি কোন দিক্ থেকেই দেশের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী নয়। ইংরেজীকে উচ্চ শিক্ষার সর্বস্তরের বাহন করবার ফলে স্বল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিতের সঙ্গে বিরাট-সংখ্যক অশিক্ষিতের চিরদিনের জন্য একটা বিভেদ সৃষ্ট হয়ে রয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ার অন্তরায় সৃষ্ট হয়েছে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় মানসিক দিক্ থেকে নিজের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। বৃত্তিশিক্ষার অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন কিছুই উৎপাদনে অক্ষম, আর এতে শারীরিক দিক্ থেকে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হচ্ছে, তাকে অপব্যয় বলা চলে। কারণ শিশুরা যা শিখল, তা কিছুদিন বাদেই ভুলে যায়। আর এ শিক্ষা জীবনে তাদের কোন কাজেই আসে না। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায়

দেশের করভারের প্রধান অংশ যারা বহন করছে, তাদের কোন উপকারই হচ্ছে না, তাদের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে কম শিক্ষা পাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সাতবছর কালব্যাপী স্থায়ী করতে হবে। এই স্তরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ও জীবনের উপযোগী বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থান থাকবে না।

ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য যে সব শিক্ষা দেওয়া হবে, তা যতটা সম্ভব কোন একটি লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। বৃত্তিশিক্ষায় দু'টি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শিক্ষাকালীন বৃত্তির মধ্য দিয়ে ছাত্ররা নিজের বেতন দিতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে।

গান্ধীজির পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে নতুনতরভাবে তিনি শিক্ষা পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক। এ ব্যবস্থায় একটি শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, শিক্ষা হবে স্বনির্ভর (Self-supporting)। শিল্প থেকে যে আয় হবে, তাই দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। শিক্ষাকে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে গ্রাম্য জীবনের উপযোগী ক'রে তুলতে হবে।

।। বুনিয়াদী-শিক্ষা পরিকল্পনা (ওয়ার্ধা পরিকল্পনা) ।।

১৯৩৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলন আহ্বান করা হয়। নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে একটি কার্যকরী রূপ দেবার জন্য সম্মেলনে নিম্ন প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় :

১। এই সম্মেলন মনে করে যে, সমগ্র জাতির জন্য সাত বছর ব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

২। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

৩। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা হাতের কাজ শেখানো হবে। শিশুর পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই কোন একটা শিল্পকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হবে। অন্যসব বিষয় যথাসম্ভব এই কেন্দ্রীয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ক'রে পড়ানো হবে। এই পদ্ধতিতে পড়ানোকে অনুষঙ্গ-পদ্ধতি বলা হয়।

৪। সম্মেলন আশা করে যে, ধীরে ধীরে এ শিক্ষা থেকে শিক্ষার ব্যয় উঠে আসবে।

এই প্রস্তাবগুলিকে সামনে রেখে একটি পাঠক্রম রচনা ক'রে মহাত্মা গান্ধীর নিকট পেশ করবার জন্য জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন দিক্ বিচার ক'রে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে জাকির হোসেন কমিটির পরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ আলোচিত ও গৃহীত

হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের জন্য ওয়ার্ধায় শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য বিদ্যামন্দির ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ধার সঙ্গে যুক্ত ছিল ব'লে এই পরিকল্পনা 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য ১৯৩৯ খ্রীঃ হিন্দুস্থান তালিম সঙ্ঘ গঠিত হয়। সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেবাগ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তালিমি সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীআর্যনায়কম্ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী আশা দেবী। এই শিক্ষা সম্পর্কে ওয়ার্ধায় তিন সপ্তাহব্যাপী শিক্ষাবিদ্‌দের এক আলোচনা-বৈঠক হয়। এই বৈঠক শেষ হবার পর বিভিন্ন প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ শুরু হয়।

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তার শুরুতে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিটি বলেন, এই শিক্ষাকে 'বুনিয়াদী (Basic) বলা হয়েছে, কারণ এই শিক্ষাই হবে ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপর গ'ড়ে উঠবে পূর্ণ-বিকশিত সার্থক জীবনের সফলতর ইমারত। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা, "কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ"। দেশের মাটি আর দেশের জীবনধারার সঙ্গে যে প্রাণের যোগসূত্র গ'ড়ে উঠবে, তাই হবে তার ভাবী জীবনের মূলধন আর জাতির অমূল্য সম্পদ।

বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শনের গোড়ার কথা, জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। গান্ধীজির পরিকল্পিত এই শিক্ষা-সংগঠন একদিন শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হবে, সেই আশা ও আশ্বাসের কথাই রয়েছে এই শিক্ষাব্যবস্থার মর্মমূলে। গান্ধীজি তাই বলেছেন, My plan......is thus conceived as the spearhead of a social revolution. It will provide a healthy and normal basis of relationship between the city and the village, and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the haves and have-nots."

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটি বলেছেন, "The scheme envisages the idea of co-operative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children."

গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে, এই শিক্ষা হবে স্বাবলম্বী। গান্ধীজি বলেছেন, "I have therefore made bold, even at the risk of losing a reputation for constructive ability, to suggest that education shuld be self-supporting."

গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের লুপ্ত গ্রাম্য গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে

হলে নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে গান্ধীজি বলেছেন, "The scheme is a revolution in the education of the village children".

॥ জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য ॥

১। শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক। একটি শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য বিষয় পড়ানো হবে।

২। শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে শিক্ষা-ব্যবস্থা হবে স্ব-নির্ভর। ছাত্রদের অর্থনীতিক স্বাধীনতার ভিত্তি এই শিক্ষার মধ্যে দিয়েই গ'ড়ে তোলা হবে।

৩। দৈহিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে যাতে শিক্ষাশেষে ছাত্ররা নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করতে পারে।

৪। শিশুর শিক্ষার সঙ্গে তার গ্রাম্য পরিবেশ, গ্রামের শিল্প ও তার ভবিষ্যৎ বৃত্তির একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৫। সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

৬। শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে।

৭। শিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে :—

(ক) মূল শিল্প—সুতাকাটা, বয়ন, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি বা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে-কোন একটি শিল্প।

(খ) মাতৃভাষা।

(গ) গণিত।

(ঘ) সমাজ-বিজ্ঞান—ইতিহাস, ভূগোল, পৌর বিজ্ঞান, গ্রাম্য অর্থনীতি ইত্যাদি।

(ঙ) সাধারণ বিজ্ঞান—প্রকৃতি-পাঠ, জীববিদ্যা, শারীর বিদ্যা, স্বাস্থ্য, রসায়ন, মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান, শরীর-চর্চা।

(চ) সঙ্গীত।

(ছ) চারু-শিল্প।

(জ) হিন্দুস্থানী ভাষা।

বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দুস্থানীকে সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়।

রিপোর্টে বহিঃপরীক্ষা-বর্জনের সুপারিশ করা হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সহশিক্ষার ব্যবস্থাকে কমিটি সমর্থন করেন।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রস্তাবের সমালোচনা ॥

এই রিপোর্ট বের হবার সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টের কয়েকটি সুপারিশের তীব্র সমালোচনা হয়। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয় শিক্ষাকে স্বনির্ভর (Self-supporting) করবার

প্রস্তাব সম্পর্কে। একে অনেকেই অবাস্তব বলে বর্ণনা করেছেন। শিল্পের উৎপাদন থেকে স্কুলের ব্যয় বা শিক্ষকের বেতন সংগ্রহ করতে হ'লে স্কুলকে কারখানায় পরিণত করতে হ'বে। সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিই হ'য়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির একমাত্র লক্ষ্য। একটি শিল্পের ভিত্তিতে সব বিষয় শেখানো সম্ভবপর নয়। Project Method-এ দেখা গিয়েছে, একটি পরিকল্পনা শেষ ক'রে অন্য আর-একটি পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে একটা ফাঁক (gap) থেকে যায়। তারপর সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে শেখানো যায় না।

শিল্পের জন্য অত্যন্ত বেশী সময় নির্ধারিত হয়। দিনের সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট শিল্পশিক্ষার জন্য ব্যয় করতে বলা হয়। এর ফলে মাত্র দু'ঘণ্টার অন্যান্য বিষয়গুলি ভালোভাবে পড়ানোর কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনাকালে শুধুমাত্র পল্লী-অঞ্চলের কথাই চিন্তা করা হয়েছে। শহরের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্পনির্ধারণের কথা বলা হয় নি।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হ'লে যে ধরনের শিক্ষকের প্রয়োজন, সেই ধবনের শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ফলে, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা-পরিকল্পনা ব্যথ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে ব'লে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ কবেন।

সাত বছর ব্যাপী শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজীকে সম্পূর্ণ বর্জন কববার প্রস্তাব বুদ্ধির পরিচায়ক নয় ব'লে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কোন শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হ'লে, তা সকলেব পক্ষে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলাও সম্ভব ছিল না। শিক্ষার্থীর ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজীকে বাদ দিয়ে পরে ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা সহজসাধ্য নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে প্রজেক্ট-পদ্ধতির তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, উভয় পদ্ধতিই কর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু তত্ত্বের দিক্ থেকে দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রজেক্ট-পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে কর্মকেন্দ্রিক, আর বুনিয়াদী পদ্ধতি হ'ল শিল্পকেন্দ্রিক (not activity-centred, but craft-centred)। প্রজেক্ট-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী প্রবণতা ও ইচ্ছা অনুসারে কাজটি ঠিক ক'রে নেয়, বুনিয়াদী শিক্ষায় জ্ঞানের সঙ্গে সমাজগঠনের শিক্ষাও দেওয়া হয়—সামাজিক বোধ সৃষ্টি করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য—এখানেই বুনিয়াদী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

॥ খের কমিটি গঠন ॥

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার ত্রুটি সম্পর্কে পরিকল্পনা-রচয়িতারা সচেতন ছিলেন, তাই এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (C. A. B. E.) পরিকল্পনার মূলনীতি প্রায় পুরোপুরি সমর্থন করেন। জাকীর হোসেন কমিটি ও উড-এবট্ কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি বম্বে-প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি. জি. খেরের সভাপতিত্বে দু'টি কমিটি গঠন করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা

ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ-সহ কমিটি যথাক্রমে ১৯৩৮ খ্রীঃ ও ১৯৪০ খ্রীঃ দু'টি রিপোর্ট পেশ করেন। (খের কমিটির রিপোর্ট পরে আলোচিত হয়েছে।)

।। বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ।।

'জাকির হোসেন পরিকল্পনা' চালু করবার জন্য কংগ্রেস থেকে নির্দেশ দেওয়া হ'লে বিহার, উড়িষ্যা, বম্বে ও যুক্ত-প্রদেশে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর কোন কোন প্রদেশে প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সরকারীভাবেই পরিত্যোগ করা হ'লে কংগ্রেস-কর্মিগণ এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ ক'রে যেতে থাকেন। সৌভাগ্যবশতঃ বিহাব সরকাব বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সব রকম কিছু সুযোগ ক'বে দিয়েছিলেন। সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্য সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেমন, মাতৃভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি সাধারণ বিদ্যালয়ের সমান তো শেখেই, বরং বেশী শেখে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্বাহেব প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। মধ্য প্রদেশে এ সমস্যা সমাধানের জন্য 'বিদ্যামন্দির' বা 'বযেত-ই-ইলম' পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যে গ্রামে চল্লিশ জন স্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়ে বযেছে, সেখানেই একটি 'বিদ্যামন্দিব' প্রতিষ্ঠা করা হবে। বার্ষিক ২০০ টাকা আয় হ'তে পারে, এমন জমি 'বিদ্যামন্দিরে'র সঙ্গে যুক্ত থাকবে। জমির আয় থেকে শিক্ষকের বেতন ও অন্য খরচ চালানো হবে। একশ বছর আগে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুনরুজ্জীবনের জন্য এডাম যে প্রস্তাব করেছিলেন, 'বিদ্যামন্দির' পরিকল্পনায় সেই প্রস্তাবের বাস্তব রূপটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাপরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৩৯ খ্রীঃ পুণায় ও ১৯৪১ খ্রীঃ দিল্লীর জামিয়ানগরে বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্পকে শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছিল, পুণা সম্মেলনে শিক্ষার সঙ্গে সমগ্র সমাজ-জীবনের যোগাযোগের কথা আলোচিত হয়। শিক্ষার ভিত্তিরূপে শিল্পের সঙ্গে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেও গ্রহণ করা হয়।

।। বুনিয়াদী শিক্ষার স্তর-বিভাগ ।।

১৯৪৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাকর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য। তার কম-বয়সী বা বেশী-বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় নি। গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই ত্রুটি দূর করবার জন্য 'নয়া তালিম' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি

বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা হবে "মানুষের জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা"। নয়া তালিম বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাত্র। এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

১। প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ বছরের কম-বয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা।

২। বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

৩। উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা—১৫ বছরের উর্ধ্ব বয়স্কদের শিক্ষা।

৪। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা।

প্রতি স্তরেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্-বুনিয়াদী স্তরে খেলাকে কাজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, শিশুর কাছে খেলা আর কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দুস্থানী তালিম সঙ্ঘ বিভিন্ন স্তরের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেন। সেবাগ্রাম সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমশরুওযালা মন্তব্য করেন, এই নয়া তালিমের মধ্য দিয়েই সমাজবিপ্লব সাধিত হবে।

১৯৪৬ খ্রীঃ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর নতুন উদ্দীপনার সঙ্গে বুনিয়াদী পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে শিক্ষা-প্রসারের কাজ শুরু হয়। দেশীয় রাজ্যে বিশেষ ক'রে কাশ্মীরে বুনিয়াদী শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যেও পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধোত্তর শিক্ষার জন্য সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে সামান্য পরিবর্তন ক'রে গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাদের শিক্ষা-প্রসার পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকালে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

।। খের কমিটির রিপোর্ট ।।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি (C. A. B. E.) উড-এবট্ রিপোর্ট ও জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করবার জন্য দু'টি কমিটি গঠন করেন। বম্বে প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি. জি. খের কমিটি দু'টির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ খ্রীঃ কমিটি প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় :—

বুনিয়াদী পরিকল্পনা প্রথমে পল্লী অঞ্চলে কার্যকরী করা হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বাধ্যতামূলক বয়স ছয় থেকে চৌদ্দ হ'লেও পাঁচ বছরের শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে অন্য কোনরূপ শিক্ষার জন্য পঞ্চম শ্রেণীর পর অর্থাৎ এগার বছর ও তার পরবর্তী বয়স থেকে যাওয়া যাবে।

কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে, নিম্নশ্রেণীর কাজ হবে বৈচিত্র্যবহুল। শিক্ষার্থী যতই উপরের দিকে উঠবে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাও তত উন্নততর হবে। উৎপন্ন

শিল্পদ্রব্য বিক্রি ক'রে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা স্কুলের ব্যয়নির্বাহের জন্য খরচ করা হবে। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় কোনরূপ বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। শিক্ষা-শেষে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি ক'রে স্কুল-ত্যাগের সার্টিফিকেট (School Leaving Certificate) দেওয়া হবে।

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ ক'রে কোন ছাত্র যদি অন্য রূপ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তা হ'লে স্কুল থেকে তাকে বদলীর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মূল শিল্পের সঙ্গে অনুষঙ্গ প্রণালীতে যে সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলি শেখানো সম্ভব নয়, তা ভিন্নভাবে শেখানো হবে।

উপযুক্ত ব্যক্তিদেব ও মেয়েদের শিক্ষকতা-গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হবে। উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গেলেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হ'বে।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা শিককদের শিক্ষার মানের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হ'বে। কোন শিক্ষকেরই বেতন কুড়ি টাকার কম হবে না।

১৯৪০ খ্রীঃ খের কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্টে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় :—

বুনিয়াদী শিক্ষা আট বছর কাল স্থায়ী হবে। ছয় বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাকালকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হ'বে। প্রথম ভাগ হ'বে পাঁচ বছর কাল স্থায়ী নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা (Junior Basic), পরেব তিন বছর হ'বে উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষা (Senior Basic)।

নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ ক'রে ছাত্ররা যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ ক'রে আবও পাঁচ বছর ছাত্রদের শিক্ষা-গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন রাখতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী এর পর কোন উচ্চতর বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পরে। মেয়েদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পাঠক্রমে স্থান দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকে মেয়েদেব উপযোগী ক'রে তুলতে হবে।

শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি কমিটির অধিকাংশ সুপরিশই গ্রহণ করেন। সমিতির যুদ্ধোত্তরকালীন শিক্ষা-পরিকল্পনা যা সার্জেণ্ট রিপোর্ট নামে খ্যাত, সেই রিপোর্টে খের কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গৃহীত হয়।

॥ সার্জেণ্ট পরিকল্পনা ॥

ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় বড় সংস্কারগুলি যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হয়েছে। যুদ্ধের সময় জাতীয় চরিত্রের ও জাতীয় সংগঠনের ক্রটিগুলি যেভাবে ধরা পড়ে, অন্য সময়ে তা হয় না বলেই সেখানে যুদ্ধকালে বা যুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষা-সংস্কার হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সময় ইংরেজ যখন জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে, সেই সময়ে দেশের শিক্ষা-সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনা হ'তে থাকে। ১৯৪৪ খ্রীঃ বাটলার আইন ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। যুদ্ধকালেই ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর কালের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। কেন্দ্রীয় সরকার বড়লাট পরিষদের বিবেচনার জন্য শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতিকে একটি পরিকল্পনা রচনার কথা বলেন। এই সময়ে স্যার জন সার্জেণ্ট ছিলেন ভারতের সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক উপদেষ্টা। বড়লাটের অনুরোধে স্যার জন সার্জেণ্ট যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি ১৯৪৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে এই খসড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সার্জেণ্ট রিপোর্ট নামে খ্যাত।

সার্জেণ্ট রিপোর্ট সার্জেণ্ট রচিত নতুন কোন শিক্ষা-পরিকল্পনা নয়। কারণ, তিনি নিজে কোন নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নি। ১৯৩৫ খ্রীঃ থেকে শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি তাঁদের বৈঠকে শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে আলোচনা ক'রে দেশের শিক্ষা-সংস্কারের জন্য বহু প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া, জাকির হোসেন কমিটির বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা, খের কমিটির শিক্ষা-বিষয়ক সুপারিশ, উড-এবট্ কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়ে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে স্যার জন সার্জেণ্ট জাতীয় শিক্ষার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা করেন। সার্জেণ্ট কোন নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় সুপারিশ করেন নি, কিন্তু এই পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যই তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। তিনি এই শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব না নিলে এ রকম একটা পরিকল্পনা রচিত হ'ত কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সার্জেণ্টের সবচেয়ে কৃতিত্ব তিনি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রচনা করেছেন। এর আগে এত তথ্যপূর্ণ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হয় নি। দেশের সর্বশ্রেণী সর্বস্তরের উপযোগী শিক্ষার কথা এতে বলা হয়েছে। নার্সারী শিক্ষা থেকে বয়স্কদের শিক্ষা-পরিকল্পনা—কারো কথাই বাদ যায় নি। শিশু-শিক্ষা, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা, বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা, তিন বছরের কলেজের শিক্ষা, যন্ত্রশিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি নানা-বিষয়ক শিক্ষার পরিকল্পনা এতে আছে। এ ছাড়া, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, অবসর-বিনোদন, অল্পবয়স্ক শ্রমজীবীদের জন্য কাজের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ ও তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি বহু-বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ এই পরিকল্পনায় রয়েছে। সার্জেণ্ট রিপোর্ট জাতীয় শিক্ষার একটি মূল্যবান দলিল।

পরিকল্পনায় তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। শহর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্য থাকায় শহরে স্বতন্ত্র শিশু-বিদ্যালয় (Nursury school) স্থাপিত হ'বে। গ্রামাঞ্চলে শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এই ব্যবস্থা পূর্ণ হ'লে

বছরে দশ লক্ষ শিশুর নার্শারী স্কুলে শিক্ষার জন্য তিন কোটি আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হ'বে ব'লে ধরা হয়েছে।

পরবর্তী স্তরে ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই শিক্ষা হবে অনেকটা বুনিয়াদী শিক্ষার অনুরূপ। এর প্রথম ভাগে থাকবে ছয় থেকে এগার বছর নিম্ন-বুনিয়াদী, এগার থেকে চৌদ্দ বছর উচ্চ-বুনিয়াদী। খের কমিটির নির্ধারিত পাঠক্রমকেই এই স্তরের পাঠক্রমরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতিকে স্বীকার করা হ'লেও শিক্ষার ব্যয় শিশুর শিল্পকর্ম থেকে নির্বাহ হতে পারে, এ নীতি গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয় নি। স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন বিচার ক'রে শিক্ষার জন্য শিল্প নির্বাচন করতে হবে।

নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঁচ কোটি পনেরো লক্ষ ছাত্রের জন্য আঠার লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। এদের বেতন ধার্য হবে ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে।

এগার থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাকে কোন ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি-পর্ব ব'লে মনে করা চলবে না। এই শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে যোগ্যতর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষা-গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে সোজাসুজিভাবে জীবনধারণের উপযুক্ত কোন বৃত্তি-গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে। এর মধ্যে অবশ্য একটা অংশ অধিকতর দক্ষতা-অর্জনের জন্য দু'-তিন বছর বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেবে।

নিম্ন-বুনিয়াদী স্কুল থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত শিক্ষার্থী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবে। নিম্ন-বুনিয়াদীর শতকরা ২০ জন ছাত্র এই শিক্ষায় স্থান পাবে। যারা নির্বাচিত হ'তে পারবে, তাদের নিজ ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দেওয়া হবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য বেতন লাগবে, কিন্তু উপযুক্ত দরিদ্র শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য শতকরা ৫০ জন ছাত্রের জন্য বিনা বেতনে পড়বার সুবিধা থাকবে।

অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির দু'টি শ্রেণী থাকবে, বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একাডেমিক হাই স্কুল এবং ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল হাই স্কুল।

মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Domestic Science) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।

পাঠক্রমে যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশই যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে থাকবে মাতৃভাষা, ইংরেজী, অন্য একটি আধুনিক ভাষা, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি, চারুশিল্প, সঙ্গীত, দেহচর্চা। এ ছাড়া প্রাচীন ভাষা ও পৌর বিজ্ঞান একাডেমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সব ছাত্রকেই অবশ্য সব বিষয় পড়তে হবে না—বিকল্পের ব্যবস্থা থাকবে।

টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান বিষয়সমূহের উপর বেশী জোর দিয়ে পড়াতে হবে। টেকনিক্যাল স্কুলে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, প্রাথমিক এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শেখানো হবে। বাণিজ্য বিষয়সমূহের মধ্যে বুককিপিং, শর্টহ্যাণ্ড, টাইপিং প্রভৃতি শেখানো হবে। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিকল্প বিষয়রূপে রাখা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠে নি। বৃহত্তর জীবনের কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন ক'রে এ শিক্ষার সংস্কারও হয় নি। যে পরিমাণ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা পাচ্ছে, চাকরির ক্ষেত্রে সে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন আছে কিনা, সে কথাও বিবেচনা করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষা হয়েছে পরীক্ষাকেন্দ্রিক। পরীক্ষা-পাশের জন্য সঙ্কীর্ণ পুঁথিগত বিদ্যা-অর্জনে সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হওয়ায় চিন্তাশক্তির বিকাশ বা প্রকৃত জ্ঞান আহরণ কোনটাই হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের একমাত্র মাপকাঠি হওয়ায় বহু অবাঞ্ছিত ও অনুপযুক্ত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রাঙ্গণে ভীড় জমাবার সুযোগ পায়। অথচ আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য যে-সব দরিদ্র মেধাবী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নেই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে বিরাট-সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তার তুলনা দুনিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনেক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা বলা চলে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য এই ভর্তি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। শুধুমাত্র বাঞ্ছিত যোগ্য প্রার্থীই যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে শতকরা ১০।১৫ জন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের ফলে একাজ সহজতর হবে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকিবে। ইণ্টারমিডিয়েট ব'লে কিছু থাকবে না। এর এক বছর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে, আর এক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিম্নতম কাল হবে তিন বছর, প্রয়োজনে আরও দীর্ঘতর করা হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠবার জন্য টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করতে হবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে গবেষণার ক্ষেত্রে, মান-উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হ'বে।

অধ্যাপকদের চাকরির অবস্থা উন্নততর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের

বেতন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হলে যোগ্য ব্যক্তিরা অধ্যাপনা-বৃত্তি গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যেও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়-সাধনের জন্য ইংলণ্ডের ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস্ কমিটির অনুকরণে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার সম্পর্কে উড-এবট্ রিপোর্টের পর্যালোচনা ক'রে বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান প্রযোজন বিচার ক'বে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

প্রধান কর্মকর্তা ও গবেষণার কাজ (Chief Executive & Research Works) ভবিষ্যতে যাঁরা এ কাজ করবেন, তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে টেকনিক্যাল হাইস্কুল থেকে। প্রাথমিক শিক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোন জাতীয় শিল্প-শিক্ষালয়ে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করবে। বাছাই-করা সবচেয়ে ভাল ছেলেদেরই একাজের জন্য নেওয়া হবে।

ফোরম্যান, চার্জহ্যাণ্ড প্রভৃতি কাজ টেকনিক্যাল হাইস্কুলে শেখানো হবে। কর্মে নিয়োগের পূর্বে শিক্ষা শেষ ক'রে বিশেষ যোগ্যতার ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট নিতে হবে।

টেকনিক্যাল হাইস্কুলের ছাত্রদের মধ্য থেকে বা উচ্চ বুনিয়াদীর পরবর্তী শিল্প বিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্রদের মধ্য থেকে নিপুণ শিল্পীদের (Skilled Workers) নিয়োগ করা হবে।

উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে যারা কিছু কারিগরি শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্য থেকে অর্ধনিপুণ (Semi-skilled) কর্মী নিয়োগ করা হবে। এরা যাতে অবসর সময়ে সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারে সে সুযোগ দিতে হবে; যার ফলে এরা সুনিপুণ (Skilled) কর্মীর স্তরে উন্নীত হবে।

বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য আংশিক সময় শিক্ষার (Part-time System) ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে কর্মীরা তাদের দক্ষতা বাড়াবার সুযোগ পাবে।

চার-শ্রেণীর শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকাল নিম্নরূপ হবে—(১) নিম্নকারিগরী বা শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ ক'রে দু'বছর শিক্ষা নিতে হবে। (২) টেকনিক্যাল হাইস্কুলে নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষা শেষ ক'রে দু'বছর শিক্ষা নিতে হবে। (৩) উচ্চ শিল্পশিক্ষালয়ের শিক্ষাকাল স্থির করবে কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। (৪) বিশ্ববিদ্যালয়েব উচ্চতম কারিগরী শিক্ষাবিভাগে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা থাকবে। শিল্প ও কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আট কোটি টাকা খরচ হবে। এই ব্যবস্থাকে চালু রাখতে বছরে দশ কোটি টাকা খরচ হবে।

দেশের প্রতিটি নর-নারীকে সুনাগরিক হবার সুযোগ দেবার জন্য ১০-৪০ বছর বয়স্ক প্রতিটি মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১০-১৬ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের জন্য যথাসম্ভব দিবাভাগে পৃথক্ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বয়সের মেয়েদের জন্যও সম্ভব হ'লে পৃথক্ শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হবে। কোন শ্রেণীতেই ১৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকবে না। বয়স্কদের শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ক'রে তোলার জন্য

ছবি, চার্ট, ম্যাজিক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমা, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সাহায্য নিতে হবে।

সারাদেশব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করলে অল্প খরচে এই বিরাট দেশের চাহিদা কিছুটা পূরণ করা সম্ভব হবে। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বয়স্কদের শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে আসে, সে চেষ্টা করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে প্রধানতঃ রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা ভুললে চলবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দৃষ্টি রাখবার জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-কমিটি গঠন করা হবে। কোন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রে কোন ত্রুটি বের হ'লে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। সামান্য অসুখের চিকিৎসার জন্য স্কুল-ক্লিনিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানসিক ও শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক্ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য মূক-বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। এদের নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে।

সামান্য মানসিক দুর্বলতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের থেকে পৃথক্ করা হবে না। এদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যতিক্রম খুব বেশী হ'লে শিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্র গঠন করতে হবে।

অবসর-বিনোদনমূলক আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক কাজের ব্যাপক আয়োজন করা হবে। দেশে সমস্ত তরুণ-তরুণীদের নিয়ে যুব-আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে হবে। তরুণ-তরুণীদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব-গ্রহণে শিক্ষা দিতে হবে। খেলাধুলা, আন্তঃ-বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, বিতর্কসভা, দলবদ্ধ ভ্রমণ, নাটক-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষা-বহির্ভূত বিষয়গুলি (Extra Curricular Activities) যুব-আন্দোলনের অঙ্গীভূত হবে।

সর্বভারতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী শিক্ষা-বিভাগ থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়সমূহে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-সমূহের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা ও উচ্চতম কারিগরী শিক্ষা ব্যতীত অন্য শিক্ষা প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনাধীনে থাকবে। যে সব অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারছেন না, তাদের হাত থেকে শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা-বিভাগ গ্রহণ করবে।

সমগ্র পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। বর্তমানে যে বেতন দেওয়া হয়, এই বেতনে উপযুক্ত লোক শিক্ষকতাকে জীবনের উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হবে না। শিক্ষকতাকে আকর্ষণযোগ্য করতে হ'লে শিক্ষকদের আরও বেশী বেতন দিতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শোচনীয় অবস্থার অবিলম্বে পরিবর্তন আবশ্যক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা হওয়া প্রয়োজন, এর কমে কোন উপযুক্ত লোক একাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না।

সমগ্র ভারতে ৮ বছরের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হ'লে কত টাকা খরচ হবে, তার একটা হিসেব সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই দু'শ কোটি টাকার দরকার হবে। শুধু মাত্র বৃটিশ ভারতেই এজন্য প্রয়োজন হবে আঠার লক্ষ শিক্ষক। একদিনে একাজ সম্ভব নয় ব'লে ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। সেজন্য সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ৪০ বছর সময় ধরা হয়েছে। এর প্রথম পাঁচ বছর যাবে আয়োজন করতে। তত দিনে একদল শিক্ষক তৈরি ক'রে নেওয়া হবে। তারপর প্রতি বছর যখন যেমন শিক্ষক তৈরি হবে, কাজ সেভাবে এগিয়ে যাবে। চল্লিশ বছরে শিক্ষা-পরিকল্পনা যখন পূর্ণ রূপায়িত হবে, তখন সমগ্র ব্যবস্থার জন্য বছরে তিন শ' কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সার্জেণ্টের হিসেবে বাংলা দেশে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে বছরে প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা লাগবে। নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরের জন্য ২২ কোটি, উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরের জন্য ১৭ কোটি ও হাইস্কুলের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ ৪০ কোটি শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। এই ৪০ কোটি টাকার মধ্যে ২৮ কোটি টাকা শুধু ব্যয় হবে শিক্ষকদের বেতন দিতে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হ'লে আংশিকভাবে কাজ শুরু করতে হবে। টাকার যোগাড় হ'লে বাকী অংশের কাজ শুরু হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে যখন পুরোপুরি কাজ শুরু হবে, তখন শুধু বৃটিশ ভারতেই নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ। এই সোয়া পাঁচ কোটি ছেলে-মেয়ের জন্য ১৮ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। হাইস্কুল স্তরে প্রায় ৭২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করবে, তাদের শিক্ষার জন্য ৩ লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। এর সঙ্গে যদি দেশীয় রাজ্য যোগ করা যায়, তা হ'লে শুধু মাত্র উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ; আর হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রী হবে ৯৩ লক্ষ। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষক লাগবে ২৩ লক্ষ আর মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রয়োজন হবে সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষকের।

বাংলা দেশে নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৭০ লক্ষ। তাদের জন্য ২ লক্ষ ৩৩ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৩০ লক্ষ; শিক্ষক দরকার হবে ১ লক্ষ ২১ হাজার। বাংলা দেশের হাই স্কুলের ছাত্র হবে মোট ১৪ লক্ষ ১৮ হাজার। এজন্য শিক্ষক দরকার হবে ৭১ হাজার।

॥ সমালোচনা ॥

১৯৪৪ খ্রীঃ সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে এর বহু সমালোচনা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয়েছে খরচের বিরাট অঙ্কটি সম্পর্কে। এত

টাকা আমরা কোথায় পাব? উত্তরে সার্জেণ্ট বলেছেন, যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে প্রয়োজন হ'লে অর্থ যোগাড় করা যায়। যদি দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করি, তা হ'লে অর্থের অভাবে শিক্ষার অগ্রগতি রোধ হবে না। আর একটি বড় আপত্তি এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে ৪০ বছর সময় লাগবে। সময়টা অত্যন্ত দীর্ঘ। এতদিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব? সময়ের ব্যাপ্তি এত দীর্ঘ যে, এতে অধৈর্য হওয়া স্বাভাবিক। সার্জেণ্ট বলেছেন, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ শিক্ষকতা গ্রহণ করতে পারবে না, এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যতদিন পর্যন্ত আমরা যোগ্য শিক্ষক সৃষ্টি করতে না পারি, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সার্জেণ্ট সাহেবের কথাটা খুব যুক্তিপূর্ণ ব'লে মনে করবার কোন কারণ নেই। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষা দিয়ে তারপর শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে এটা কোন দেশেই হয় নি। এমনকি ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক গণশিক্ষা শুরু হবার যুগেও হয়নি। উচ্চ-বুনিয়াদি শিক্ষা-প্রাপ্ত ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা বিচার ক'রে, তাদের মধ্যে থেকে বাছাই ক'রে যারা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের নিয়েই কাজ শুরু ক'রে পরে যোগ্য ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগানো সম্ভব ছিল। শিক্ষকের ট্রেনিং ব্যবস্থার অজুহাতে কোন রূপেই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে শিকেয় তুলে রাখা যায় না। সার্জেণ্ট সাহেবের পক্ষে বলার কথা হচ্ছে, এত বড় একটা কাজ রাতারাতি হবার নয়। এজন্য দু'দশ বছর সময় অবশ্যই লাগবে। স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশী সরকারের সততায় আমরা সন্দেহ ক'রে এর তীব্র সমালোচনা করেছি, আশা করা গিয়েছিল স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু শিক্ষা-প্রসারের কাজ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ত্রিশ বছর বাদে মনে হয় সার্জেণ্ট চল্লিশ বছরের পরিকল্পনা ক'রে খুব বেশী সময়ের কথা বলেন নি। যাঁরা সেদিন ছিলেন সবচেয়ে সমালচনামুখর, তাঁদের পরিচালনাতেও প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হয় নি।

পূর্বেই বলেছি, উডের ডেসপ্যাচের পর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যপূর্ণ শিক্ষা-পরিকল্পনা আর রচিত হয়নি। এর আগের পরিকল্পনাগুলিতে সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাবই ছিল প্রধান ত্রুটি। শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষা-সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী একটি জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার পক্ষে অন্তরায় ছিল। স্যার জন সার্জেণ্টের পরিকল্পনা সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট নয়। একটা বিরাট ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ভারতের জাতীয় শিক্ষা-কাঠামো তৈরি করতে পেরেছেন—এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ইংরেজ আমলে রচিত একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনায় তিনি যে সাহসিকতা ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন, সে যুগে তা দুর্লভ। তাঁর খসড়া-পরিকল্পনাকেই অদল-বদল ক'রে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনাসমূহে গৃহীত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় অনাথনাথ বসু বলেছেন, "এই পরিকল্পনায় আমরা প্রথম শিক্ষা-সংস্কারের একটা সর্বাঙ্গীণ ছক পাইয়াছি। স্বাধীন ও উন্নত ভারতবর্ষে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামোটা যে অনেকাংশে এই ছকের অনুরূপ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই"।

ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা Shri Saiydain বলেছেন, "It is the first

comprehensive scheme of national education, it does not start with the assumption, implicit in all previous Government schemes that India is destined to occupy a position of educational inferiority in the comity of nations."

শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা-সমস্যা

(১৯৩৭ খ্রীঃ—১৯৪৭ খ্রীঃ)

।। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ।।

আলোচ্য সময়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬—৩৭ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,২৬,২২৮ জন (পাকিস্তান সহ), ১৯৪৬—৪৭ খ্রীঃ ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ২,৪১,৭৯৪ জন (পাকিস্তান বাদ দিয়ে)। এই সময়ে ভারতে কলেজের সংখ্যা ছিল ৯৩৩টি। এর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৯৯,২৫৩ জন। এই কলেজগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ কলাবিজ্ঞানের কলেজ ছিল ৪১৮টি এবং ছাত্র ছিল ১,৫৮,১০০ জন।

সারা দেশ ব্যাপী জাতীয় চেতনা-বৃদ্ধির ফলে উচ্চ-শিক্ষা লাভের জন্য একটা বিশেষ আগ্রহই এই সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ। যুদ্ধের সময় শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজনে সরকার থেকে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উন্নতির জন্য প্রচুর খরচ করা হয়েছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করায় বিত্তবান শ্রেণী অতিরিক্ত লাভের একটা অংশ শিক্ষা-প্রসারে ব্যয় করেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নিত্য-নতুন সমৃদ্ধ নগরী গ'ড়ে উঠেছে। এর ফলেও উচ্চ-শিক্ষার প্রসার হয়েছে।

আলোচ্য যুগে আমাদের দেশে উচ্চ-শিক্ষার প্রসার ও সে জন্য বিরাট ব্যয়ের পরিমাণ দেখে অনেক দেশের শিক্ষাকে 'মাথা-ভারী' (Top heavy) শিক্ষা-ব্যবস্থা বলেছেন। উচ্চ-শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে সেই টাকায় গণশিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যয় করবার দাবী বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের সংখ্যা আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেখ'তে বিরাট হ'লেও এই বিশাল দেশের বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যাটি মোটেই বিরাট নয়। শিক্ষায় অগ্রসর অন্য যে-কোন দেশের সঙ্গে তুলনা করলে একে নগণ্য ব'লেই মনে হবে। সার্জেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানীতে প্রতি ৬৯০ জনে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাচ্ছে। বৃটেনে ৮৩৭ জনে ১ জন, ইউ. এস. এ.-তে প্রতি ২২৫ জনে, রাশিয়ায় ৩০০ জনে ১ জন, সেখানে ভারতে ২,২০৬ জনে ১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। বৃটেনে চার কোটি লোকের জন্য ১২টি বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর ভারতে সে সময়ে ৪০ কোটি লোকের জন্য ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রসার ঘটলেও এই শিক্ষায় দেশ খুব উপকৃত হয়নি। এই স্তরের শিক্ষায় অত্যধিক অপচয়ের (wastage) ফলে জাতীয় অর্থ ও শ্রমের বিরাট অপব্যয় হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের-ক্ষেত্রে কোন বাছাই করবার ব্যবস্থা না থাকায় অনুপযুক্ত ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রতি বছর যে

পরিমাণ ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করত, তার তুলনা মেলা ভার। এদিকে বহু যোগ্য ছাত্র অর্থের অভাবে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল।

যুদ্ধের সময় বৃত্তি-শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হ'লেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। তাই বাধ্য হয়ে অধিকাংশ ছাত্রই যোগ্যতা বা প্রবণতা থাক-কি-না-থাক, সাধারণ শিক্ষার জন্য ভীড় করত। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বৃত্তি-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের জন্য বহু রিপোর্ট ও বহু পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করা হয় নি।

আলোচ্য যুগের পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় —ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭), উড়িষ্যার উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৩), মধ্যভারতে হিন্দী ভাষাভাষীদের জন্য সাগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬), জয়পুরে রাজপুতনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭), আসামে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭) ও সিন্ধুর করাচী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭)।

।। মাধ্যমিক শিক্ষা ।।

আলোচ্য যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার যে হারে হয়েছিল, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার সে হারে হয়নি। স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল, কিন্তু ১৯২১-২২ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ ছাত্রসংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ বৃদ্ধির হার সে তুলনায় কম হয়েছিল।

নীচের মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসারের তালিকা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার হার সম্পর্কে ধারণা হবে।

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার

	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭	১৯৪৬-৪৭
অনুমোদিত মাধ্যমিক স্কুল	৭,৫৩০	১৩,০৫৬	১১,৯০৭
অনুমোদিত স্কুলের ছাত্রসংখ্যা	১১,০,৮০৩	২২,৮৭,৮৭২	২৬,৮১,৯৮১

১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ পরিসংখ্যানে পাকিস্তানের স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ পরিসংখ্যান থেকে পাকিস্তানের অংশকে বাদ দিলে শুধুমাত্র ভারতে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০,৪০০টি ও ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮,৩০,০০০ জন। পরবর্তী দশ বছরে তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেরূপ দ্বিগুণ হয়েছে, এক্ষেত্রে তা হয় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের অন্তরায়ের কারণ সম্পর্কে বহু মতের সৃষ্টি হয়েছিল। কেহ বলেছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিপৃক্ত সীমায় (Saturation point) পৌঁছে গিয়েছে, যতটা প্রসার তা হয়ে যাওয়ায় আর দ্রুত প্রসারের প্রশ্ন ওঠে না। জনসংখ্যার অনুপাতে অন্য দেশের তুলনায় ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তার ছাত্রসংখ্যা অনেক কম, তাই এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। কেহ বলেছেন, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাছাই

ক'রে যোগ্য ছাত্র গ্রহণ করা হ'ত। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্র-বাছাইয়ের কোন রীতিই ছিল না, তাই এ যুক্তিও অচল।

প্রাথমিক শিক্ষার যদি দ্রুত প্রসার হয়, তা হ'লে মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রসার ঘটে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-বিপর্যয় বা প্রগতির প্রতিক্রিয়া মাধ্যমিক শিক্ষায় অবধারিত। এই যুগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নি, তাই মাধ্যমিক স্তরেও তার প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। যুদ্ধের সময় মূল্যমান-বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তদের আর্থনীতিক জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দেয়। স্কুলের মাহিনা ও পাঠ্য বইয়ের দাম বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষাও পূর্ব্বে চেয়ে ব্যয়বহুল হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের পক্ষে (Fixed income group) ব্যয়বহুল শিক্ষার ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসারের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, তাদের পক্ষেই মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের জন্য বহু ছেলেমেয়ে এ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি, যোগ্য ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা। কিন্তু এসব ব্যবস্থা আশানুরূপ না হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন-সম্পর্কিত ভাষার প্রশ্ন দ্বৈত শাসনকালেই নীতিগত-ভাবে মীমাংসিত হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিক ইংরেজী-প্রীতির জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করতে দেরি হচ্ছিল। আলোচ্য যুগে সর্বভারতীয়-ভাবে মাতৃভাষাই মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়।

মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। এই অভিযোগ বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই আমরা শুনে আসছি। বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশ সত্ত্বেও এই ত্রুটি দূর করবার কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়নি। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনসাধারণের দাবীতে সরকার এ সম্পর্কে মনোযোগী হন। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কারিগরী শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশে শিল্পের প্রসার ঘটার জন্যও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্বমনোভাব পরিবর্তনের ফলে অধিক সংখ্যক ছাত্র কারিগরী শিক্ষা-গ্রহণে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এই সময়ে প্রয়োজনের অনুরূপ বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষক-শিক্ষণ-শিক্ষার মানোন্নয়নের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শিক্ষা-সংস্কারের জন্য গঠিত সমস্ত কমিশনেই এ সম্পর্কে নানা সুপারিশ করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর অতি সামান্য ব্যবস্থাই করা হয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ ২,১১০ জন শিক্ষক ও ১,৩০৭ জন শিক্ষিকা ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এই বিশাল

দেশের বিরাট প্রয়োজনের তুলনায় যে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শিক্ষকদের জীবনের আর্থনীতিক মানও এসময়ে অত্যন্ত নীচু ছিল। শিক্ষকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতায় তাঁদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তার প্রতিক্রিয়া শিক্ষাকেও প্রভাবিত করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির ও জীবনের মান-উন্নয়নের জন্য কার্যকর ভাবে কিছু করা হয়নি।

।। প্রাথমিক শিক্ষা ।।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন। কংগ্রেসী মন্ত্রী-শাসিত প্রদেশসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি দ্বৈতশাসনকালে ভারতের সর্বপ্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা-আইন পাশ হয়েছে এবং এই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে, আইনে এরূপ ধারাও বিধিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার আন্তরিক কোন প্রচেষ্টাই কোন প্রদেশে হয়নি। আলোচ্য সময়েও এক বম্বে বাদে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার আন্তরিক কোন চেষ্টা হয় নি। বম্বে প্রদেশের ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ রিপোর্টে দেখা যায়, ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ১১০টি শহর ও ৫,১০০টি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া, ৯টি শহর ও ১৩৪টি গ্রামে শুধুমাত্র ছেলেদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ পশ্চিম বাংলা শুধুমাত্র কলিকাতা কর্পোরেশনের সামান্য অংশ ব্যতীত অন্য কোথাও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না।

বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রীঃ)

প্রদেশ	বয়স	শুধুমাত্র বালকদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা		বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা	
		শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম
বিহার	৬—১০	১৭	০	০	০
বম্বে	৭—৮	৯	১৩৪	১১০	৫,১০০
	৬—১১				
মধ্যপ্রদেশ	৬—১১	৩৪	১,০৩১	০	০
ও বেরার	৭—১২				
পূঃ পাঞ্জাব	৬—১১	৩৭	১,৪২০	০	০
মাদ্রাজ	৬—১৪	১৬	৩১	১২	১,৬০৭
	৬—১২				
উড়িষ্যা	৬—১২	১	১	০	
	৬—১১				
	৫—১০				
ইউ পি					
১৯৪৬-৪৭	৬—১১	৩৬	১,৩৭১	৩	৩
পঃ বাংলা	৬—১০	১			
দিল্লী	৬—১২	১	৭	০	

কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য স্কুলবিহীন গ্রামে স্কুল-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। যেখানে মেয়েদের স্কুল প্রয়োজন, সেখানে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য অতিরিক্ত অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন না হওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার খুবই কম হয়েছিল।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

খ্রীস্টাব্দ	প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
১৮৮১-৮২	৮২,৯১৬	২০,৬১,৫৪১
১৯০১-০২	৯৩,৬০৪	৩০,৭৬,৬৭১
১৯২১-২২	১,৫৫,০১৭	৬১,০৯,৬৭১
১৯৩৬-৩৭	১,৯২,২৪৪	১,০২,২৪,২৮৮
১৯৪৫-৪৬	১,৬৭,৭০০	১,৩০,২৭,৩১৩
১৯৪৬-৪৭	১,৩৪,৮৬৬	১,০৫,২৫,৯৪৩

দেশ-বিভাগ হয়ে যাবার ফলে ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ পরিসংখ্যানের সঙ্গে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছিল, তা বোঝা কষ্টসাধ্য। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ অবিভক্ত ভারতের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাই, এই সময়ে স্কুলের সংখ্যা কমে গিয়েছে, ছাত্রসংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। স্বেচ্ছামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় এর চেয়ে বেশী বাড়াবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। বম্বে-প্রদেশে একটা বিরাট অংশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬,৬২,০৪২ জন, ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ তা বেড়ে হয় ২৪,৬২,৯০৪ জন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার না হওয়ার ফলে নিরক্ষতার সংখ্যাও বিশেষ কমে নি। ১৯৪১ খ্রীঃ বৃটিশ ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল ১২.২%। ১৯৩১ খ্রীঃ দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা যে পরিমাণ ছিল, ১৯৪১ খ্রীঃ অশিক্ষিতের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী ছিল। কারণ দেশের লোকসংখ্যার হার যেভাবে বেড়ে যাচ্ছিল, শিক্ষার হার সেভাবে বাড়নি।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও চাকরির অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, কোন ব্যক্তিই সেই বেতনে স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা গ্রহণ করত না। হার্টগ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯২৭ খ্রীঃ বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষকগণ বেতন পেতেন মাসিক আট টাকা ছয় আনা। বম্বে প্রদেশের অবস্থা সেই তুলনায় অনেক ভাল ছিল। বম্বে শহরের শিক্ষকরা বেতন পেতেন মাসিক সাতচল্লিশ টাকা। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট শুরু হওয়ায় এই বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁরা বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ বম্বে প্রদেশে ৪৫,০০০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একাদিক্রমে ৫৪ দিন কর্ম-বিরতির পর কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হয়। সব প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও মহার্ঘ-ভাতা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। টাকার অঙ্কের বিচারে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষকগণ বেশী বেতন পেলেও দ্রব্যমূল্য যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তার ফলে তাদের অবস্থার সত্যিকারের কোন পরিবর্তন হয় নি।

॥ নারীশিক্ষা (১৯২১-৪৭) ॥

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থাকলেও বৈদেশিক সরকার নারী-শিক্ষা সম্পর্কে কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে প্রথম থেকেই দ্বিধা ক'রে আসছে। নারী-প্রগতি সনাতনপন্থীরা সুনজরে দেখবে না, দেশে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে, এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার প্রাচীন রীতিনীতি-রক্ষার অজুহাতে নারীশিক্ষা-প্রসারের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। দ্বৈত শাসন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকালে ভারতীয় মন্ত্রীরা শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার ফলে দেশে নারীশিক্ষার দ্রুত প্রসার শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলনের ফলে যে গণচেতনা দেখা দেয়, তার প্রতিক্রিয়ায় নারী-সমাজেও এক অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও দেশের লোক নারীশিক্ষার

প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই অর্থসংকট, রাজনৈতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এসব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও দেশে নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ হয়।

নীচের তালিকার সঙ্গে পূর্বেকার পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিচার করলেই আমরা নারীশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারব :—

ভারতে নারীশিক্ষা (১৯৪৬—৪৭ খ্রীঃ) *

প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তি	সহশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর সংখ্যা	নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীসংখ্যা	মোট
বিশ্ববিদ্যালয় ও			
আর্টস কলেজ	১ ,২৬২	৯,০৪২	২০,৩০৪
বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান :			
আইন	৫৯	×	৫৯
চিকিৎসা	১,১১০	৫৩৯	১,৭২৯
শিক্ষা	২৮৯	৭৩৫	১,০২৪
কৃষি	৮	×	৮
বাণিজ্য	৭৭	×	৭৭
এঞ্জিনীয়ারিং	৬	×	৬
মাধ্যমিক শিক্ষা :			
উচ্চ-মাধ্যমিক	৫৮,১৯৮	২,২২,৫৭৪	২,৮০,৭৭২
মধ্যশিক্ষা	৪৩,০১৬	১,১১,৪০০	১,৫৪,৪১৬
মিড্‌ল্ ভার্নাকুলার	১৭,০১৪	১,৫০,০৭৮	১,৬৭,০৯২
প্রাথমিক স্কুল	১৯,৮০,৩৯৩	১৪,৯৪,৭৭২	৩৪,৭৫,১৬৫
বিশেষ বিদ্যালয় :			
চারুকলা	১৫১	×	১৫১
চিকিৎসা	৪১৯	১৫	৪৩৪
শিক্ষা	৩০৫	১০,৮২০	১১,১২৫
কারিগরী ও শিল্প	৬৫৭	১০,৩৪৭	১১,০০৪
বয়স্ক শিক্ষা	২,০৯০	৭,৬২৪	৯,৭১৪
বাণিজ্য	৭৯১	১৪২	৯৩৩
অন্যান্য	১১,৩১৩	১১,৪১৬	২২,৭২৯
মোট	২১,২৭,২৩৪	২০,২৯,৫০৪	৪১,৫৬,৭৪২

* Report of the National Committee of Women's Education.

এই পরিসংখ্যানে অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ১,৭১,০৪৩ জন ছাত্রীকে ধরা হয় নি।

এই তালিকা থেকে দেখা যায় ১৯২১-২২ খ্রীঃ যেখানে শিক্ষারত ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১২,২৪,১১৮ জন, সেখানে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ অনমুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সহ মোট শিক্ষারত ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৪২,৯৭,৭৮৫ জন। মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার আগ্রহের ফলে ১৯২১-২২ খ্রীঃ যেখানে কলেজ-শিক্ষারত ছাত্রী ছিল ৯০৫ জন, ১৯৩৬ ৪৭ খ্রীঃ দেখা যায় সেখানে কলেজের ছাত্রীসংখ্যা হয়েছে ২৩,২০৭ জন। এর পূর্ব পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষা বিত্তবান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ ও পার্শীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আলোচ্য যুগে (১৯২১- ৭) দেখা যায়, উচ্চশিক্ষার জন্য নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজেও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এই যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারও উল্লেখযোগ্য। ১৯২১-২২ খ্রীঃ ২৬,১৬৩ জন ছাত্রী যেখানে ছিল, ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ দেখা যায়, সেখানে ৬,০২,২৮০ জন ছাত্রী রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ১৯২১-২২ খ্রীঃ ১১,৮৬,২২৩ জন ছাত্রী থেকে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ ছাত্রীসংখ্যা ৩৪,৭৫,১৬৫ জন হয়।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ সমগ্র দেশে শুধুমাত্র মেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৮,১৯৬টি—এর মধ্যে ৫৯টি আর্টস ও বিজ্ঞান কলেজ, ২,৩৭০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১,৪৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ৪,২৮৮টি। শুধুমাত্র মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ সময়ে সহশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। কলেজীয় শিক্ষা-স্তরে শতকরা ৫০ জন ছাত্রী ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে কলেজে শিক্ষালাভ করত। প্রাথমিক স্তরেও অধিকাংশ মেয়েই ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে শিক্ষা পেত। এর পূর্ব যুগে মোট শিক্ষারত মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জন সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পেত। এই যুগে মোট ছাত্রীর শতকরা ৫০ জনের বেশি সহশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছিল। এই সময়ে বেসরকারী নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৬,৯৭৯টি।

১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। বিগত দেড় শ' বছরের নারী-শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় বর্তমান যুগে সংখ্যাগত ও গুণগত দু'দিক্ থেকেই নারীশিক্ষার উন্নতি হয়েছে। এই যুগের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। উনবিংশ শতকের পূর্বে নারীর সামাজিক মর্যাদা যা ছিল, আজকের দিনে তার অনেক পবিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী নিয়ে এযুগে এগিয়ে এসেছে। যুদ্ধের ফলে বৃত্তিশিক্ষার বহু সুযোগ নারীসমাজের নিকট প্রসারিত হয়। তবুও অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের দেশের নারীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথা অস্বীকার করা যায় না। তুলনামূলক বিচারে নারীশিক্ষার প্রসার হয়েছে, কিন্তু সমগ্র নারীসমাজের কথা চিন্তা করলে উল্লসিত হবার কোন কারণ খুঁজে পাই না। নারীশিক্ষার যেটুকু প্রসার হয়েছিল, তা প্রধানতঃ শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ ভারতের অগণিত নারী তখনও

শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। বেসরকারী প্রচেষ্টায় শহর অঞ্চলে যেভাবে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল, গ্রামের দিকে বেসরকারী দিক্ থেকে সে ভাবে চেষ্টা করা হয়নি। সরকারও এ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। পল্লী-অঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় এদিক্ থেকে শিক্ষার কিছু প্রসার ঘটলেও পল্লী-অঞ্চলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই এ যুগে হয় নি।

ইংরেজ যুগে অর্থের অভাবে সাধারণভাবেই শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়েছে, তারপর নারীশিক্ষার জন্য কোনদিনই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। তাই যখন নারী-শিক্ষার পথে সামাজিক বাধা অপসারিত হ'ল, তখনও কর্তৃপক্ষের উৎসাহের অভাবে নারীশিক্ষা অতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রইল।

॥ বয়স্কদের শিক্ষা ॥

দ্বৈত শাসনকালে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্বের দিকে ভারতীয় মন্ত্রীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন সরকারী প্রয়াস এই সময়ে দেখা যায়নি। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই প্রধানতঃ বয়স্কদের শিক্ষা-অভিযান চলেছে। ১৯৩৭ খ্রীঃ থেকে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে বয়স্ক শিক্ষার কিছু আয়োজন শুরু হয়। ১৯৩৯ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদকে সভাপতি ক'রে কেন্দ্রীয় বয়স্ক শিক্ষা-সমিতি গঠন করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ বিহার সরকার এজন্য ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯৪৬ খ্রীঃ বিহারে প্রতি বছর ২ লক্ষ বয়স্ককে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বম্বে প্রদেশে ১৯৩৭ খ্রীঃ বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন। বম্বে শহরে কিছু কাজ হলেও অন্য কোথাও কিছু হয়নি। সামগ্রিক-ভাবে বিচার করলে বলা যায়, দেশ স্বাধীন হবার আগে বয়স্ক শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয়নি।